জঙ্গিবাদ

বাংলাদেশ কেন টার্গেট

মেহেদী হাসান পলাশ

জঙ্গীবাদ

বাংলাদেশ কেন টার্গেট

মেহেদী হাসান পলাশ

বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

জঙ্গীবাদ : বাংলাদেশ কেন টার্গেট

মেহেদী হাসান পলাশ

প্রকাশক
সায়রা হাসান
বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার
ঢাকা।
ফোন # ০১৫২ ৩৫০৬৭৫
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৬

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক : মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

ISBN 984-32-3809-5

JANGIBAD : BANGLADESH KENO TARGET; Written by : Mehadi Hassan Palash; Published by : Bangladesh Research Center; Tikatuly, Dhaka, Price : Tk.200: US$ 6.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ
শমসের উদ্দিন বিশ্বাস
আমার বাবাকে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

সংখ্যালঘু রাজনীতি
দুঃশাসনের দিনগুলি
The Minority Card
নির্বাচিত কিশোর গল্প

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশে রাজনীতিতে সহিংসতার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সহিংস হামলা নতুন নয়। এসব হামলায় সাধারণতঃ লাঠি, লগি, বৈঠা, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র যেমন- পিস্তল, রিভলভার প্রভৃতি ও ককটেল জাতীয় হাতবোমা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধ্বংস ক্ষমতার দিক দিয়ে এগুলো মারাত্মক হলেও ব্যাপক বিধ্বংসী নয়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ হঠাৎ করেই সে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এদিন যশোরের টাউন হল মাঠে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক ভয়ঙ্কর বোমা হামলায় ১০ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে জনসমাবেশে ব্যাপক বিধ্বংসী বোমার যে বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখের পর থেকে এ বোমা হামলা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে সিরিজ বোমা হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

সত্যসন্ধ সাংবাদিক হিসাবে শুরু থেকেই এ বিষয়টির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলাম। উদীচী বোমা হামলার পর তৎকালীন সরকারকে সুষ্ঠু তদন্ত করে এ বোমা হামলার সাথে দায়ী ব্যক্তিদের সনাক্ত ও দোষীদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক মনে হয়নি। তা যদি হতো তাহলে অন্ততঃ এ বোমা হামলার সাথে যশোরের বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামকে জড়িয়ে মামলা দায়ের করা হতো না। শুধু তাই নয়, সেসময় একের পর এক বোমা হামলা হয়েছে, দেশের সর্বস্তরের মানুষের জনদাবী ছিল একটি বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করে সকল বোমা হামলার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিচার। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সেই জনদাবী উপেক্ষা করে এ সকল বোমা হামলাকে ব্যবহার করে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছিল। তাতে তারা কতটুকু সফল হয়েছিল সেটা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। কিন্তু আখেরে তাদের লাভ তো হয়ইনি বরং ক্ষতি হয়েছে প্রভূত। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পেছনে প্রধানতম কারণ ছিল সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা। তাছাড়া এই ইস্যু কাজে লাগিয়েই বিএনপি সারা দেশের আলেম সমাজকে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল– যা আওয়ামী লীগের ভূমিধস পরাজয়ে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর বোমা হামলাগুলোর তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। বিস্ময়করভাবে জোট সরকারও এই বিচার বিভাগীয় কমিটির তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে প্রকাশ করেনি বা রিপোর্ট কার্যকর করেনি। ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রশ্রয় পেয়ে নতুন উদ্যোগে বোমা হামলায় নেমে পড়ে। পূর্বের ন্যায় বর্তমান সরকারও বোমা হামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পাঁয়তারা করে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই দলের পরস্পর বিরোধী রেষারেষিতে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে নীলনকশা বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা এবার থলের বিড়ালটি বের করে তাদের সমর্থকদের হাতে

www.pathagar.com

তুলে দেয় বাস্তবায়নের জন্য। শুরু হয় বাংলাদেশ একটি 'অকার্যকর রাষ্ট্র', 'ব্যর্থ রাষ্ট্র'–এই তত্ত্বের পক্ষে সিন্ডিকেট প্রপাগাণ্ডা। আর এ প্রপাগাণ্ডার প্রেক্ষাপট তৈরীর জন্য পরিচালিত হয় দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলা। এখানে লক্ষণীয়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় সরকারই বোমা হামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলেও চূড়ান্তভাবে তারা কেউই লাভবান হতে পারেনি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহুগুণে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল সন্ত্রাস লালন, প্রশ্রয়দান এবং নির্মূলে ব্যর্থতা। তেমনি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দেয়া অভিযোগের প্রশ্নবানে জর্জরিত।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ হয়তো তাদের রাজনৈতিক ক্ষতি সহজেই পুষিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এসব বোমা হামলার আসল টার্গেট যা, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা, সেই বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি পূরণ করা খুবই কষ্টকর। বাংলাদেশের 'বাতাসে লাশের গন্ধ, মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ'। লাখো শহীদের রক্তে ভেজা মাটির স্মৃতি এখনো মুছে যায়নি এদেশের কোটি মানুষের স্মৃতি থেকে। সেই মুক্তিযোদ্ধা, শহীদের সন্তানেরা, আত্মীয় পরিজনেরা কিংবা কোনো দেশপ্রেমিকের পক্ষে বোমা মেরে আবারও সেই মাটিকে রক্তাক্ত করা সম্ভব বলে ভাবা কঠিন। তাই সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই যে, এ বোমা হামলা বাংলাদেশ বিরোধী কোনো অপশক্তির কাজ।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানীসহ জেএমবি'র বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ ইসলামী ফতোয়া দেয়ার মতো দ্বীনী জ্ঞানসম্পন্ন নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের যদি শীর্ষস্থানীয় একহাজার ওলামা-মাশায়েখের নামের একটি তালিকা করা যায় তাহলে দেখবো তাঁদের সকলে একবাক্যে জেএমবি পরিচালিত বোমা হামলাকে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই একটি পথেই শনাক্ত করা যায়, জেএমবি আসলে কি এবং কার?

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের বোমা হামলাসমূহ এবং পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এবং তথ্য প্রমাণে অল্পদিনেই এ কথা পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, সাম্প্রতিক বোমা হামলাগুলোর নেপথ্য শক্তি বা মূল ষড়যন্ত্রকারীর অবস্থান দেশের অভ্যন্তরে নয়, তাদের অবস্থান সীমানার ওপারে। যারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিশ্বাসী নয়, যারা বাংলাদেশের সম্পদ শুষে নিতে চায়, বাংলাদেশকে পদানত করতে চায়, নিজেদের বাণিজ্যিক কলোনী দেখতে চায়– এমন বিদেশী শক্তি বা শক্তিসমূহ এই বোমা হামলার পেছনের আসল ষড়যন্ত্রকারী, মূল পরিকল্পনাকারী, নেপথ্য গডফাদার। এই নেপথ্য গডফাদারগণ নিজেদেরকে নেপথ্যে রেখে তৃতীয় কোনো পক্ষের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের কিছু বিভ্রান্ত কিংবা অর্থলোভী, পরজীবী ও রাষ্ট্রদ্রোহী নিয়োগীদের দিয়ে একের পর এক বোমা হামলা চালিয়েছে। বোমা হামলায় ব্যবহৃত হাতটির নাম হয়তো মুফতি হান্নান বা শায়খ আবদুর রহমান বা অন্য অনেকে হতে পারে। কিন্তু দেহটি বা আসল ষড়যন্ত্রকারী এদেশীয় নয়। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য, প্রমাণ, যুক্তি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে বইটির তিনটি অধ্যায়ে।

আমি সাংবাদিক মাত্র। সাংবাদিকের কাজের ধরণ এবং বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ধরনে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিজ্ঞানী সর্বশেষ প্রাপ্ত বা প্রমাণিত সত্যকে তথ্য হিসাবে গ্রহন করেন। আজকের প্রমাণিত তথ্য বা সূত্রটি ভবিষ্যতের গবেষণায় নির্ভুল প্রমাণিত নাও হতে পারে। একজন সাংবাদিকও তেমনি সর্বশেষ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কাজ করে থাকেন। এই বইটির রচনাকাল শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে। সে সময়ের পর থেকে বাংলাদেশে আরো অনেক বোমা হামলা হয়েছে এবং বোমা হামলা নিয়ে বিস্তর তদন্ত ও গবেষণা হয়েছে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে। ফলে বইটির রচনা শুরুর সময় থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত দুই বছর সময়ের ব্যবধানে তথ্যে অনেক বাস্তবমুখিতা এসেছে, সমানভাবে এসেছে বিভ্রান্তিও। কিন্তু বর্তমান সময়ে লেখা বইটির প্রথম প্রবন্ধ 'জঙ্গীবাদ: বাংলাদেশ কেন টার্গেট?'– তথ্যের নির্ভযোগ্যতা, সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রবন্ধটি পূর্বে বাংলাদেশের কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি বরং সরাসরি এ বইয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যেহেতু এই অধ্যায়ে সংযোজিত অনেক তথ্যে সরাসরি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম চলে এসেছে। সুতরাং কোনো একটি স্থান থেকে প্রাপ্ত তথ্য তা যত অভিনবই হোক না কেন শুধু চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য এ অধ্যায়ে সংযোজনের লোভ সামলে একাধিক সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া তথ্যগুলোই এ অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে। বাদ পড়া তথ্যগুলো নিশ্চিত প্রমাণ সাপেক্ষে বইটির পরবর্তী সংস্করণে সংযোজনের করা হতে পারে। তাই বইটির শেষের দিকের রচনার সাথে প্রথমদিকের রচনার দু'একটি তথ্যে সামান্য বৈসাদৃশ্য পাঠকদের চোখে পড়তে পারে। সে বিষয়ে একটি কৈফিয়ত আগেই দিয়ে রাখি। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বা নিবন্ধসমূহ নিয়ে বই প্রকাশকালে আমাদের দেশের লেখকগণ পূর্বের প্রবন্ধ বইয়ে সংকলনের সময় অনেক সংযোজন-বিয়োজন করেন। সাংবাদিকের দৃষ্টিতে আমি তাকে সাধু কাজ মনে করি না। কেননা, এটিই সাংবাদিকতার স্বাভাবিক গতি ও সৌন্দর্য। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো অনেক পাঠকের স্মৃতি ও সংগ্রহে সংরক্ষিত থাকে বলে এতে খুব একটা লাভ হয় না বরং লেখকের অসাধুতা প্রমাণিত হয়।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এসে বাংলাদেশের আলোচিত বোমা হামলাগুলোর তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয় মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিতে মুফতি হান্নান ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ উদীচীর অনুষ্ঠানে সংঘটিত বোমা হামলা থেকে শুরু করে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা পর্যন্ত সংঘটিত বেশিরভাগ আলোচিত বোমা হামলাগুলোর দায়ভার হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ ও তার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ঘটনার অভিনবত্ব আমাকে চমকিত করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নভাবে হরকাতুল জেহাদ বাংলাদেশের কিছু সাবেক নেতৃবৃন্দের অভিমত জানার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছি। মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তি নিয়ে তাদের মাঝেও দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে। একাংশের মতে, মুফতি হান্নানের জঙ্গীবাদী মনোভাবের কারণে অনেক আগেই তাকে হুজি (হরকাতুল জেহাদ) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ বিরোধী কোনো অপশক্তি আফগানিস্তান, কাশ্মীর বা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের নিয়োজিত কোনো 'জঙ্গী' সংগঠন বা ব্যক্তির মাধ্যমে মুফতি হান্নানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাকে এ বোমা হামলায় প্ররোচিত করে থাকতে পারে। তবে দীর্ঘসময় ধরে এতোগুলো বোমা হামলা হান্নানের একার পক্ষে চালানো সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তাদের রয়েছে গভীর সন্দেহ। হুজি'র এই অংশের মতে, ২০০ দিন ধরে ধারাবাহিক রিমাণ্ডের ফলে মুফতি হান্নান হয়তো পুলিশী নির্যাতনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। পুলিশের সাজানো নাটকে অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছে। অথবা, সরকার এক মুরগী জবাই করে সব পক্ষের আত্মীয়দের বিদায় দিতে চাচ্ছে। কিন্তু মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তিতে যেসব স্থান-কাল-পাত্র, ঘটনার পরম্পরা ও বিস্তারিত বর্ণনা উঠে এসেছে তা পড়ে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বস্ত তা জন্মে। এ বিষয়ে হুজি নেতৃবৃন্দের মত হচ্ছে, আলোচিত সকল বোমা হামলার আগের তদন্ত রিপোর্ট বা চার্জশীটগুলো দেখেন, সেগুলো এর থেকেও আরো বেশী নাটকীয় ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। এমনকি ২১ আগস্ট বোমা হামলায় অভিযুক্ত জর্জ মিয়ার স্বীকারোক্তি পড়লে তাতেও কারো মনে সন্দেহ জাগবে না। বাংলাদেশ পুলিশ অন্তত এই একটি বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ বলে সুপরিচিত। তাছাড়া মুফতি হান্নানের গ্রেফতারের সময়কালটিও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। ১৭ আগস্ট ২০০৫ জেএমবি পরিচালিত দেশব্যাপী বোমা হামলার পর মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ এই বোমা হামলার সাথে মুফতি হান্নানের ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

হরকাতুল জিহাদের অপর অংশের মতে, হরকাতুল জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে একথা বলা যায়, তাদের বাংলাদেশ কেন্দ্রিক কোনো কর্মকাণ্ড নেই। আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে তাদের চিন্তা-ভাবনা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল। সেকারণে বাংলাদেশে হুজির সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে 'র' হয়তো সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল যাদের অনুরোধ হুজির পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। যাদের বা যার মাধ্যমে একদিকে যেমন 'র' বাংলাদেশে হুজির সকল তৎপরতার অনুপুঙ্খ রিপোর্ট পেয়ে তা দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের মাধ্যমে হুজির সকল নেটওয়ার্কে হামলা করেছে এবং হুজিকে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারকে ইসলাম ও হুজি বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে হুজিকে দিয়ে বোমা হামলা করিয়েছে। তাদের মতে, হুজি যদি এইসব বোমা হামলার সাথে জড়িত থেকেও থাকে তাহলেও হুজিকে বিভ্রান্ত করে এই বোমা হামলা চালিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। তবে তারা এখনো মনে করেন, এই বোমা হামলার সাথে হরকাতুল জিহাদ জড়িত এটা নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি। বিশেষ করে

www.pathagar.com

উদীচী থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলা পর্যন্ত প্রায় সকল বোমা হামলার তদন্তে সিআইডির বিতর্কিত এএসপি মুন্সী আতিকুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এবং চাকুরী হারানোর পরও মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তির সময় এই মুন্সী আতিকুর রহমানের আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিতি একটি বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

হুজি নেতৃবৃন্দ মনে করেন, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলা যেমন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য কোনো আশির্বাদ বয়ে আনেনি। তেমনি তথাকথিত ইসলামী জঙ্গীবাদ বাংলাদেশের মুসলমান ও ইসলামের কোনো উপকার করেনি বরং ক্ষতি করেছে প্রভূত। এরচেয়ে বড় কথা, বোমা হামলার দিন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে কর্মরত চার হাজার ইহুদী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর রহস্যজনকভাবে কাজে যোগদান না করা, লন্ডনে পাতাল রেলে সিরিজ বোমা হামলার দিন ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর লন্ডন শহরে উপস্থিত থেকেও একই সময়ে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় যোগদানের কর্মসূচী বাতিল করে হোটেলে অবস্থান বিশ্ববাসীর সামনে বিরাট প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। একইভাবে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে (হামলাকারী যেই হোক) উদীচী, রমনা, পল্টন, নারায়ণগঞ্জ, সিলেটে বিভিন্ন বোমা হামলার পূর্বে হাসান ইমাম, শামীম ওসমান, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বদরুদ্দিন কামরান চৌধুরী প্রমূখকে চিরকূট দিয়ে বা ডেকে অকুস্থল থেকে সরিয়ে দেয়ার বিষয়টি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, হামলাকারী বা হামলার সাথে অন্যভাবে জড়িত কিংবা হামলার বিষয়ে জ্ঞাত মহল কি চায়নি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন? তারা কারা হতে পারে– জাতিকে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার আহ্বান জানান হুজি নেতৃবৃন্দ।

হরকাতুল জিহাদ নেতাদের এই বিভক্ত ও দ্বিধান্বিত মতামত এটা প্রমাণ করে বোমা হামলা ও মুফতি হান্নানের ব্যাপারে তারা এখনো নিশ্চিত নন। আবার সকল বোমা হামলায় পুলিশের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একাধিক চার্জশীট প্রদানের ফলে দেশবাসীর মনেও প্রশ্ন উঠেছে আসলে কোনটি সঠিক? এখন যা বলা হচ্ছে, আগে যা বলা হয়েছিল, না ভবিষ্যতে যা বলা হবে?

আমি কোনো ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নই। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তথাকাথিত ইসলামী জঙ্গীবাদীদের, জেএমবি'র পথ ইসলামের পথ কিনা, তাদের কার্যক্রম ইসলাম সমর্থন করে কিনা–'তা জানতে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় পীর-ওলামা-মাশায়েখগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দৈনিক ইনকিলাবের আদিগন্ত বিভাগে প্রকাশ করি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জঙ্গীবাদের স্বরূপ চিনতে এই সাক্ষাৎকারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তাই সাক্ষাৎকারগুলোকে একসাথে করে বর্তমান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে সংকলন করা হলো। সাক্ষাৎকারগুলো নিয়েছেন ইনকিলাবে আমার সহকর্মী জামান সৈয়দী, আবু ইসা খান, ফ্রিল্যান্স রাইটার বেলায়েত হোসাইন আল-ফিরোজী প্রমুখ– তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মিছবাহ ফাউণ্ডেশনের কাছে। তাদের প্রকাশিত 'সন্ত্রাস বোমাবাজি ও চরমপন্থা সম্পর্কে ইসলাম এবং আলিম-উলামাগণের অভিমত' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়েছে এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে।

বইয়ে প্রকাশিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের লেখাগুলো ২০০৪ সালের বিভিন্ন সময়ে যখন দৈনিক ইনকিলাবে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল তখন দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক জনাব এ এম এম বাহাউদ্দিন ভাই আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছি দারুণভাবে। উল্লিখিত লেখাগুলো ও সাক্ষাৎকারসমূহ যখন দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই বিভিন্ন মহল থেকে এগুলোকে পুস্তকাকারে সংকলন করে প্রকাশের দাবী আসতে থাকে। মূলত: এই দাবী থেকেই বর্তমান বইটি লেখার পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। বইটি প্রকাশে আমার সিনিয়র সহকর্মী দৈনিক ইনকিলাবের সহযোগী সম্পাদক মোবায়েদুর রহমান ও সহকারী সম্পাদক আবদুল আউয়াল ঠাকুর সার্বিকভাবে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির অঙ্গ সজ্জায় সহায়তা করার জন্য সহকর্মী ছোট ভাই আবু জাফর মুহাম্মদ সোহলকে ধন্যবাদ।

চলমান গতিতে সবকিছু চললে বইটি যখন প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে তখন হয়তো জেএমবি'র শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ফাঁসি কার্যকর হয়ে যাবে অথবা কার্যকর করার চূড়ান্ত মুহূর্তে উপনীত হতে পারে। কিন্তু জেএমবি'র এই শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ফাঁসি দিয়ে, মুফতি হান্নানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের শিকড় সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। এজন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দেশবাসীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্যণীয় বিশ্বখ্যাত টাইমস পত্রিকার জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী যে দেশের মানুষ, অশান্ত বিশ্বে শান্তি ফেরাতে যে দেশের বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সেই বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিক অশান্তির গৃহদাহে বিপর্যস্ত। একশ্রেণীর রাজনীতিবিদগণ তাদের ব্যক্তিগত লিপ্সা, রেষারেষিতে সোনার এই দেশকে,অযুত সম্ভাবনার এই বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা করছেন। এরা প্রয়োজনে 'ইবলিশের' গালে চুমু খাবেন কিন্তু প্রতিপক্ষের দিকে তাকাতেও রাজী নন। ষড়যন্ত্রকারী বিদেশী ক্লাইভকে গৃহের খাস কামরায় সমাদরে সম্ভাষণ করবেন, কিন্তু স্বদেশী প্রতিপক্ষকে গৃহের বারান্দা তো দুরের কথা দৃষ্টি সীমানায়ও ঠাঁই দিতে রাজি নন। এরা তাদের নিজেদের 'জিদের ভাত কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন' কিন্তু প্রতিপক্ষের জন্য 'ফ্যানটাও' ছাড়তে রাজি নন। আর সেই ভাতের লোভেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধির চন্দ্রালোকে জন গ্যাস্টরাইট, নিকোলাস বার্ণস, ক্রেইগ জেনেস, নামক রাহুগুলো আশঙ্কার কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে। ড. ইউনূসের শান্তি প্রস্তাব ও ড. কামালের জাতীয় সরকার প্রস্তাবের কুহেলিকার মাঝে উঁকি দিয়েছে হামিদ কারজাই, আহমেদ চালাবিদের মুখোশ।

কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা অকার্যকর রাষ্ট্র, ব্যর্থ রাষ্ট্রের যে নীল নকশা জঙ্গীবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছিল রাজনীতিবিদরা ভিন্নরূপে এখন তা মাথায়

www.pathagar.com

তুলে নিয়েছে। তাদের কামড়াকামড়িতে সংসদ, সংবিধান, নির্বাচন কমিশন, বিচারালয় একের পর এক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মৌলিক অঙ্গগুলো ধংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। এদেশের রাজনীতিবিদদের একাংশ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষকে পরিচর্যা ও লালন পালন করে চলেছে। এ বিষয়েও দেশবাসীর সর্তক থাকা প্রয়োজন।

বইটি প্রকাশে আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জঙ্গীবাদের নামে বাংলাদেশ ধ্বংসের যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করা এবং ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করা। যাতে তারা ভুল করে বা বিভ্রান্ত হয়ে সেই বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে না ফেলে। এই বই পড়ে পাঠকগণের যদি এসব বিষয়ে ন্যূনতম সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ মহান হেফাজতকারী।

মেহেদী হাসান পলাশ
০৬.১২.২০০৪

www.pathagar.com

জঙ্গীবাদ : বাংলাদেশ কেন টার্গেট?

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট ইসলামের ছদ্মবেশে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি নামক সংগঠনের অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ ছিল বাংলাদেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। একসাথে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় (১টি জেলা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে) ৪৩৪টি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশ করে। হঠাৎ শত শত বজ্রাঘাতের মতো জেএমবির আবির্ভাবেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও পরিচিতি সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। পাল্টে দিতে চায় বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশের পরিচয়। ষড়যন্ত্রীদের ক্রীড়নক শায়খ আবদুর রহমান ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষদের বিভ্রান্ত করে এক মরণ খেলায় মেতে ওঠে এবং সেই সাথে নাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের শিকড়। বাংলাদেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জীবন-যাপনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিল সে। বাংলাদেশের রফতানী বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য, জনশক্তি রফতানী হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশীদের বসবাস ও যাতায়াতকে সন্দেহের পথে ঠেলে দেয়। ফলে ১৭ আগস্ট ২০০৫ থেকে বাংলাদেশের সরকার, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে শায়খ রহমান ছিলেন মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি। কিন্তু তারপরও নিজেকে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে রেখে তিনি একের পর এক আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালনা করে গেছেন। সেই শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাইসহ জেএমবি'র ৭ মজলিসে শূরা সদস্যকে নিঃশর্ত ও জীবিত গ্রেফতার নিঃসন্দেহে কোনো সাধারণ ঘটনা নয় বরং অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আবদুর রহমান, বাংলাভাইসহ জঙ্গী সংগঠন জেএমবি'র ৭ মজলিসে শূরা সদস্যসহ ৭২০ জন এহসার, গায়রে এহসার ও সাধারণ সদস্য গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন করতে পারার কারণে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ করে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সদস্যদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। ধন্যবাদ দিতে হয় র‍্যাবকে এবং সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ পাবার যোগ্য এদেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় তৌহিদী জনতা এবং এদেশের আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে তাদের সহায়তা ছাড়া সরকার বা র‍্যাবের একার পক্ষে এই বিশাল সাফল্য অর্জন ছিল অসম্ভব। তবে জেএমবি'র মজলিসে শূরার সাত সদস্য সহ ৭২০ জন সদস্য ধরা পড়ার পরও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উৎস নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। খোদ সরকারও এমন দাবী করছে না। বরং আশঙ্কার কথাই বলছেন সরকার ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের টপ টু বটম। ফলে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান, জঙ্গীবাদের টার্গেট, রূপ-প্রকৃতি এবং এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে দেশবাসীর জানা ও সতর্ক থাকা জরুরী। অন্যদিকে, জেএমবি সম্পর্কে আমাদের দেশে যে প্রপাগাণ্ডা চলেছে তারও অনেকটাই অলীক, ফানুস। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে ও বাস্তবতার নিরিখে জেএমবি ও বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ সম্পর্কে দেশবাসীর মাঝে সঠিক তথ্য থাকা জরুরী।

www.pathagar.com

জেএমবি'র আত্মপ্রকাশ

২০০৪ সালের মে মাসে রাজশাহীর বাগমারায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই (পিতা-নাজির হোসেন মাস্টার, গ্রাম-মহিষালবাড়ী, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া) জাগ্রত জনতা বাংলাদেশ (অনেকের মতে, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ) নামে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে তাদের সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদীন বা জেএমবি'র জনসম্মুখে প্রকাশ ঘটায়। তারা তাদের কার্যক্রমকে সর্বহারা দমন বলে উল্লেখ করে। ২৪ মে ২০০৫ বিশাল মোটরসাইকেল মিছিল সহকারে সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই ডিসি, এসপি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে। পরবর্তীতে তারা প্রচুর সংখ্যক চরমপন্থী নিধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাও প্রচার করে। ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ জেএমবি'র কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে জেএমবি বাগমারায় তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে জেএমবি'র সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা, এনজিও ও ব্র্যাক অফিসে ডাকাতিসহ পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে।

এরপর ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখে সকাল আনুমানিক ১১.০০ ঘটিকা হতে ১২.০০ ঘটিকা সময়ের মধ্যে দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) এর মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায় জেএমবি। একমাত্র মুন্সিগঞ্জ জেলা ব্যতীত সকল জেলায় এই বিস্ফোরণ ঘটে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর লক্ষ্যস্থল ছিল আদালত প্রাঙ্গণ, জনবহুল ও প্রকাশ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ। দেশব্যাপী বিস্ফোরণের স্থানসমূহে প্রাপ্ত লিফলেটের মাধ্যমে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) নামক একটি সংগঠন এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে স্বীকার করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে সরকার কর্তৃক উক্ত সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এ যাবৎ তারা গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা তাদের লক্ষ্য ছিল বলে লিফলেটে জেএমবি দাবী করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখের পূর্বে তারা দেশের বিভিন্ন জেলায় গোপনে বৈঠক করে ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখে সারা দেশে একযোগে IED বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করে। ১৭ আগস্টের পরেও তারা বিভিন্ন জায়গায় গোপন বৈঠকের মাধ্যমে বিচারকদের ওপর ফেদায়ী তথা আত্মঘাতী বোমা হামলার পরিকল্পনা করে। ৩ অক্টোবর ২০০৫ চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রামে বোমা হামলা এরই ধারাবাহিকতার ফলাফল। পরবর্তীতে গত ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে এবং ২৯ নভেম্বর গাজীপুর ও চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে বিচারকদের ওপর আবার আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালিত হয়। সবশেষে ১ ডিসেম্বর গাজীপুরে আরো একবার এবং ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোনায় আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালিত হয়। এতে আদালতের বিচারক ও আইনজীবীসহ বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। এভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি।

জেএমবি'র উত্থান

জেএমবি'র উত্থান সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই শায়খ আবদুর রহমান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

www.pathagar.com

শায়খ আবদুর রহমানের জীবনী

১৯৫৯ সালের ৭ জানুয়ারী জামালপুর সদর উপজেলার চরসী ইউনিয়নের অন্তর্গত খলিফাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শায়খ আবদুর রহমান। তার পিতা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ফজল একজন সুপরিচিত আলেম ছিলেন। পারিবারিকভাবে তারা আহলে হাদীসের অনুসারী। শায়খ বড়, মেজোভাই ওবাইদুর রহমান (গ্রেফতারকৃত), সেজোভাই ওলিউর রহমান (সৌদী প্রবাসী), ছোটভাই আতাউর রহমান ওরফে সানী বোন নাজমা ও শিফা–এই চার ভাই দুই বোন ও পিতা-মাতা নিয়ে শায়খ আবদুর রহমানের সংসার। আবদুর রহমান তার ছোটভাই আতাউর রহমানকে জেএমবিতে এনে সংগঠনের শূরা সদস্য ও সামরিক শাখার প্রধানের দায়িত্ব দেন। আতাউর রহমানের সাংগঠনিক নাম দেয়া হয় সানী। তবে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর নিরাপত্তার কারণে সে সাজিদ নামটি ব্যবহার করতো। ১৯৯৯ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পড়াশুনাকালে সানী ইসলামী ছাত্র শিবিরে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগ দেয়।

মূলত জেএমবিতে যোগ দেয়ার পর প্রত্যেকের কাছে সাংগঠনিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি নাম চাওয়া হতো। সে নাম দিতে ব্যর্থ হলে সংগঠন থেকে তার নামকরণ করা হতো। যেমন শায়খ আবদুর রহমানের সাংগঠনিক নাম এহসান। শায়খের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ফজল গ্রামে ১০-১২ বিঘা স্থাবর সম্পত্তির ফসল এবং জামালপুর শহরের নয়াপাড়ায় অবস্থিত নিজের দুই রুম বিশিষ্ট চার ইউনিটের আট রুমের বাড়ি ভাড়া দিয়ে প্রাপ্ত হাজার তিনেক টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। শায়খ মদীনায় পড়তে যাওয়ার পর ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে তার পিতা সপরিবারে জামালপুর শহরের নিজের বাসায় এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি (শায়খের পিতা) রাজশাহীর রাণীবাজার মসজিদে তাবলীগরত অবস্থায় হার্ট এটাকে মারা যান।

আবদুর রহমান ১৯৬৩ সালে কামালখান হাট সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৮ সালে ফাজিল পাস করেন। এই মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি শিবিরের রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন এবং ৪-৫ বছর অনিয়মিতভাবে এই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহের কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হন। একই বছর তিনি রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভের আশায়। কেননা, সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরিভুক্ত থাকায় প্রতিবছর এ মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা বৃত্তি নিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেত। এ মাদ্রাসায় ভর্তির ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছিলেন আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ এর নায়েবে আমীর আবদুস সামাদ সালাফির শ্বশুর ও ঐ মাদ্রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা রেজাউল্লাহ। ১৯৮০-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আবদুর রহমান মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিতে লেসন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি জামায়াতে ইসলামী সৌদী আরব শাখার বৈদেশিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এ সময় তিনি মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বহু আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছুটিতে এসে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে একই জেলার মাদারগঞ্জ থানার বালীজুরী বাজার গ্রামের মির্জা আবুল কাশেমের কন্যা রূপাকে বিবাহ করেন। এই রূপা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মির্জা আযম

www.pathagar.com

এমপি'র আপন বোন। ১৯৮৫ সালে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে দেশে ফেরেন এবং পরের বছর আলম নগর আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন। পড়াশোনা শেষে শায়খ রহমান মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি জামালপুর শহরের পাশে চন্দ্রায় নাবিল সোপ ফ্যাক্টরী নামে একটি সাবান কারখানা দেন। এ সময় তিনি ও তার পরিবার নয়াপাড়ার নিজের বাসা ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রায় দুই রুমবিশিষ্ট ভাড়া বাসায় ওঠেন। সাবান ফ্যাক্টরীতে ৬/৭ জন শ্রমিক কাজ করতো। সাবান ফ্যাক্টরী, জমিজমা ও বাসা ভাড়ার টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলতো। ১৯৮৭ সালে শায়খের পরিবার এই সাবান ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দিয়ে নয়াপাড়ায় নিজের বাড়িতে আবার চলে যায়। ১৯৮৬ সালে তিনি ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসের ভিসা সেকশনে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি স্ত্রীসহ উত্তরায় বসবাস করতে থাকেন।

১৯৮৭ সালে সৌদী দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধানমণ্ডির ২৭ নম্বর রোডে কাতার দূতাবাসের সহায়তায় মক্কা মেডিকেল সেন্টার বা আল হেরা ডায়গনস্টিক সেন্টার দিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ধানমণ্ডির সোবাহানবাগ মসজিদের বিপরীতে অবস্থিত একটি বাসা ভাড়া নিয়ে স্ত্রী, ছেলে নাবিল ও মেয়ে আফিফাসহ বসবাস করতে থাকেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত একই সাথে তিনি আল হেরা অনুবাদ সেন্টার এবং খিলগাঁওয়ে আল হেরা নামে একটি ফার্মেসী দিয়ে ব্যবসা করতে থাকেন। ঢাকায় ব্যবসা চলাকালে শায়খ রহমান ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল মেয়াদে নাবিল এন্টারপ্রাইজের নামে তুরস্ক ও অস্ট্রেলিয়া থেকে দুইবার ছোলা ও একবার ডাল আমদানী করেন। এতে তার ১৫-২০ লক্ষ টাকা লাভ হয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ সময় তিনি ইসলামী ব্যাংক জামালপুর শাখা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে শায়খ রহমান নিজে, তার পরিবার ও আত্মীয়দের নামে ৫টি সারের ডিলারশীপের জন্য জামানত বাবদ ১০ লক্ষ টাকা জমা দেন। 'নাবিল এন্টারপ্রাইজ, জামালপুর; রূপা ট্রেডার্স, যাদবপুর, জামালপুর; আল জাবির এন্টারপ্রাইজ, স্টেশন রোড, জামালপুর; নাজমা এন্টারপ্রাইজ, শালবন, রংপুর এবং সুমন ট্রেডার্স, আকুয়া, ময়মনসিংহ' নামে যমুনা সার কারখানা থেকে সার সংগ্রহ করতেন তিনি। জেএমবি'র কার্যক্রম চলাকালে শায়খ রহমানের চোখে পড়ে সংগঠনের মধ্যে অবস্থিত তরুণ মুহম্মদ আবদুল আউয়ালের প্রতি। আউয়ালের সাংগঠনিক দক্ষতায় প্রীত হয়ে শায়খ রহমান তার মেয়ে আফিফার সাথে আউয়ালের বিয়ের বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং সে মোতাবেক খোঁজ-খবর নিতে ছোটভাই সানীকে আউয়ালের স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করেন। তিন দিন সে বাড়িতে অবস্থান করে সানী বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে ফেরত এসে শায়খ রহমানের সাথে আলোচনা করে এবং পরে প্রস্তাব নিয়ে আবার আউয়ালের বাড়িতে যায়। আউয়ালের পরিবার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলে আবদুর রহমান নিজেই বিয়ের চূড়ান্ত আলাপ করতে আউয়ালের বাসায় যান এবং দু'পক্ষের আলোচনার পর ২০০১ সালের ২২ জুন শায়খের কন্যা আফিফার সাথে আবদুল আউয়ালের বিয়ে হয়। এই আবদুল আউয়াল পরবর্তীতে জেএমবি'র শূরা সদস্য ও উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার নিযুক্ত হন।

জেএমবি'র প্রস্তুতিকাল

মূলত সৌদী আরবে অবস্থানকালে ইবনে তাইমিয়্যা এবং মুহাম্মদ ইবন আবদ আল-ওয়াহাবের কিছু বই পড়ে শায়খ আবদুর রহমানের মনে জেহাদী চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখানে ইবনে তাইমিয়্যা ও মুহাম্মদ ইবন আবদ আল-ওয়াহাব সম্পর্কে কিছু কথা

www.pathagar.com

বলা প্রাসঙ্গিক।

আবদ আল্লাহ ইবনে তাইমিয়্যা ১২৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের হাররান-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাইমিয়্যা তার বংশীয় উপাধি। উচ্চ শিক্ষিত বংশের সদস্য ইবনে তাইমিয়্যা মাত্র ১৭ বছর বয়সে শুধু শিক্ষা জীবনই সমাপ্ত করেননি বরং বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। মুসলমানদের প্রথম যুগের আচরিত পন্থার জোর সমর্থক তাইমিয়্যা বিদআতের কঠোর সমালোচনা করেন। পীর দরবেশদের প্রতি অন্ধ ভক্তি, কবর পূজা, মাজার জিয়ারতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক অর্থের প্রতি অটল ইবনে তাইমিয়্যার অনেক ব্যাখ্যা তৎকালীন আলেমদের মাঝে বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যেমন, একদা তিনি দামেস্কের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'আমি এখন যেভাবে অবতরণ করিতেছি আল্লাহও ঠিক একইভাবে আসমান হইতে জমীনে অবতরণ করেন'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিম্বর থেকে এক ধাপ নীচে নেমে অবতরণের ধরন ব্যাখ্যা করেন (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ)। খুলাফায়ে রাশেদীনদের বিভিন্ন কাজের তিনি সমালোচনা করেন। এসব কারণে তার সাথে তৎকালীন আলেম সমাজ ও শাসকগোষ্ঠীর সাথে তার ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং এজন্য জীবনে বহুবার তাকে কারাবাস করতে হয়েছে। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, তিনি পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে ১৫৯টি গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম ইসলামী খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় শিক্ষক অর্থাৎ মাওলানাদের মাধ্যমে মজলিশে শূরা প্রতিষ্ঠা করে খলীফার অধীনে খেলাফত পরিচালনার ধারণা প্রচার করেন।

ইবনে তাইমিয়্যার একান্ত অনুসারী মুহাম্মদ ইবন আবদ আল ওয়াহাব ১৭০৩ সালে উয়ায়না নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য গবেষকগণ আবদ আল ওয়াহাবের সমর্থকদের ওয়াহাবী বলে আখ্যা দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ যুগে তার সমর্থকদের আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে ইতিহাস খ্যাত। তবে তার সমর্থকরা অবশ্য নিজেদেরকে সালাফিয়্যা বা সালাফি (আদিপন্থী) বলে পরিচয় দেন। ইবন তাইমিয়্যার মতো তিনিও পীর ভক্তি, মাজার পূজা, মীলাদ, কবর জেয়ারত, শিরক ও বিদআতের ব্যাপারে কঠোর নীতি ঘোষণা করেন। ফলে শাসকদের সাথে তার বিরোধ বাধে। তিনি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং দারঈয়ার নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে দারঈয়ার সর্দার মুহাম্মদ ইবনে সাউদ তাকে ও তার মতবাদকে সমাদরে গ্রহণ করেন। তিনি এ মতবাদের সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব নেন এবং দারঈয়ার গোত্রের ধর্মীয় নেতৃত্বের ভার ইবন ওয়াহাবের ওপর ছেড়ে দেন। এই সাউদ বংশ ও ইবন ওয়াহাবের মৈত্রী এক সময় তাদের আদর্শ ধীরে ধীরে সমগ্র আরব জাহানে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, যা এক সময় পুরো আরব জাহানের ইতিহাস ও মানচিত্র পাল্টে দেয়। সে এক বিশাল ইতিহাস– প্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সে ইতিহাসের অবতারণা থেকে বিরত থাকা হলো। আগ্রহী পাঠকগণ আরব জাতির ইতিহাস থেকে তা জেনে নিতে পারেন। অভিযোগ আছে যে, এই ওয়াহাবীপন্থী সউদ বংশ আরব বিজয়ের পর সেখানে অবস্থিত বহু ভাস্কর্য, মাজার, কবরস্থান বিশেষ করে নবী (সা.)-এর বংশধর ও সাহাবীদের মাজার এবং তাদের মতের সমর্থক নয় এমন বহু মূল্যবান পুস্তক ধ্বংস করে দেয়। ১৭৯২ সালে আবদ আল ওয়াহাব ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মূলত র‍্যাডিকাল ইসলামী ধারার এই দুই তাত্ত্বিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, জন্মগতভাবে শায়খ রহমান আহলে হাদীসের অনুসারী। বাংলাদেশের আহলে হাদীস মতাবলম্বীরা বিশ্বাসের দিক দিয়ে মূলত ওয়াহাবীপন্থী বলেই পরিচিত।

www.pathagar.com

সঙ্গত কারণে শায়খ রহমান তাদের বই পড়ে আরো বেশী জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পড়েছিলেন।

দেশে ফিরে শায়খ রহমান জিহাদ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। কুয়েত ভিত্তিক ইসলামিক এনজিও রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির দাওয়া বিভাগের পরিচালক জনাব আকরামুজ্জামানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকেও আবদুর রহমান বেশ কিছু জিহাদী বই সংগ্রহ করে পড়েন যা তাকে আরো জিহাদে উদ্বুদ্ধ হতে

এ ধরনের বই পড়িয়ে জিএমবি সদস্যদের জিহাদে উজ্জীবিত করা হতো

সাহায্য করে। বিশেষ করে ১৯৯৫ সালের পরে তিনি জোরালোভাবে জিহাদের চিন্তা করতে থাকেন। এ লক্ষ্যে তিনি দেশের বেশ কিছু ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর মধ্যে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর নেতা মুফতি আবদুল হাই, মুফতি শফিক, মুফতি হান্নান, শেখ ফরিদ, ফারুখ হোসেন খান, আবদুল্লাহ প্রমুখ। ১৯৯৬ সালে আবদুর রহমান কক্সবাজারের উখিয়ায় আটককৃত হরকাতুল জিহাদের ৪০ জন সদস্যের মুক্তির ব্যাপারে নিজস্ব অর্থায়নে ব্যারিস্টার কোরবান আলীর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করেন মূলত হরকাতুল জেহাদকে তাদের পাশে পেতে। এ ব্যাপারে হরকাতুল জিহাদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য তিনি ১৯৯৬-৯৭ সালে ৭/৮ বার কক্সবাজার ও বান্দরবান গিয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের রায় হরকাতুল জিহাদের বিপক্ষে যাওয়ায় তারা আবদুর রহমানকে দোষারোপ করে। এতে করে হরকাতুল জিহাদের সাথে তার সম্পর্ক ভেঙে যায়। আহলে হাদীস অনুসারীরা 'লা মাজহাবী' এবং হরকাতুল জিহাদের অনুসারীরা মাজহাবপন্থী হওয়ায় আকীদাগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো জিহাদী কর্মসূচী তাদের নেই বলে তারা জানান। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান কি করে টুঙ্গীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভায় বোমা পুঁতে রাখল? এ পর্যন্ত যেসব তথ্য

www.pathagar.com

পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে, হরকতে থাকাকালে মুফতি হান্নানসহ কয়েকজন নেতা বাংলাদেশে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে সে সবের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য হরকতের অনুমোদন চায়। কিন্তু হরকত এতে অনুমোদন না দিলেও তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। এতে বিরক্ত হয়ে হরকত নেতারা বিভিন্ন সময় তাদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে বহিষ্কার করে। পরে এদের অনেকেই জেএমবিতে যোগ দেয়। কিন্তু মুফতি হান্নান কখনো জেএমবিতে যোগ দেননি। কোটালীপাড়ায় বোমা পেতে রাখার সাথে জেএমবির কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর আবদুর রহমান বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ক্বারী মুহাম্মদ উবায়দুল হক, চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা ফজলুল করীম, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতী ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহম্মদ কামারুজ্জামান, মাওলানা শরীফ আহমেদ, ডা. মুজিবুর রহমান প্রমুখ। এসব নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকে শায়খ আবদুর রহমানকে শুধু নিরুৎসাহিতই করেননি বরং এতে করে বাংলাদেশে ইসলাম, মুসলমান এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠার যে সুবাতাস বইছে তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তাকে সতর্ক করেন। এরপর তিনি কথা বলেন নিজ সংগঠন আহলে হাদীসের ড. বারী ও ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের সাথে।

ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র থাকাকালে ১৯৭৮ সালে যাত্রাবাড়ী আহলে হাদীস মাদ্রাসা মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়াতে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সে সময়ে তিনি তৎকালীন 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' এর সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আব্দুল বারীকে অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় জমঈয়তে আহলে হাদীসেরও একটি যুব সংগঠন তৈরীর প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে ড. বারী পুরোপুরি রাজী না থাকার পরও ড. গালিব ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ তারিখে জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুবসংগঠন 'আহলে হাদীস যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা করে এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক হন। ড. গালিব পরবর্তী বছরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ড. গালিবের জিহাদী ধ্যান-ধারণার কারণে ড. বারী ২১ জুলাই ১৯৮৯ সালে তাকে মূল সংগঠন (জমঈয়তে আহলে হাদীস) থেকে বহিষ্কার করেন। ড. বারী আহলে হাদীস যুবসংঘের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে উদারপন্থী দল হিসেবে নিজের জমঈয়তে আহলে হাদীসকে পরিচালনা করতে থাকেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে ড. গালিব আহলে হাদীস যুবসংঘ এর মুরব্বী সংগঠন হিসেবে 'আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠন করেন এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফীকে নায়েবে আমীর এবং অধ্যাপক রেজাউল করিমকে (প্রভাষক, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া) মহাসচিব নিযুক্ত করেন। ১৯৯৮-৯৯ সালে ঢাকার উত্তরা ৬ নং সেক্টরের ১১ নং সড়কে ৩ নম্বর বাসায় অবস্থিত তাওহীদ ট্রাস্টের কার্যালয়ে কোনো এক জুমার দিন ড. গালিবের সেখানে অবস্থানকালে আবদুর রহমান তার সাথে দেখা করতে আসেন। সেখানে তিনি ড. গালিবের কাছে জিহাদ করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। কিন্তু জুমার নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় ঐ সময় তারা বেশী আলাপ করতে পারেননি। সেখান থেকে একটি মাইক্রোবাসযোগে তারা উভয়ে মিরপুর আহলে হাদীস দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা মসজিদে এসে জুমার নামাজ আদায় করে পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু ড. গালিব আবদুর রহমানের মৌলিক জিহাদী মতাদর্শের সাথে ভিন্নতা প্রদর্শন না করলেও জিহাদ শুরুর সময়ের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।

www.pathagar.com

আবদুর রহমানের পরিকল্পনা ছিল আন্দোলনের প্রথম ধাপেই জিহাদ শুরু করা এবং ড. গালিব মনে করতেন সর্বশেষ ধাপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া সাপেক্ষে জিহাদ শুরু করা। এই মতভিন্নতার কারণে আবদুর রহমান একসময় দল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়েন। পরবর্তী সময়ে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং এই সংগঠনটির আমীর হিসেবে শায়খ আবদুর রহমান (পিতা-মৃত আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল, গ্রাম-চরষী, খলিফাপাড়া, থানা-সদর, জেলা-জামালপুর) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জেএমবি গঠনের পর থেকে শায়খ আবদুর রহমান জিহাদ শুরুর ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাথে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি বায়তুল মোকাররমে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। এ সভায় অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে সৌদী দূতাবাসের কর্মকর্তা মি. রুহুল আমিন, যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ইসহাক উপস্থিত ছিলেন। এর কিছু দিন পর একই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা বেলালের সাথে শায়খ আবদুর রহমানের সাক্ষাৎ হয়। মাওলানা বেলাল তাকে ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড আসামী আবদুল করিম টুণ্ডা ওরফে বাবাজির সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। উল্লেখ্য, ভারতের উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা আবদুল করিম টুণ্ডা ওরফে আবদুল কুদ্দুস ওরফে বাবাজি আহলে হাদিসের অনুসারী। ভারতের পক্ষ থেকে তাকে আইএসআই-এর চর বলে দাবী করা হয়। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৯২-৯৩ সালে ভারত সরকার টুণ্ডাকে মোস্ট ওয়ান্টেড আসামী ঘোষণা করার পর তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। পরবর্তীকালে যাত্রাবাড়ীতে ছদ্মনাম দিয়ে একটি অফিসও খোলেন এবং বাংলাদেশ ও ভারতে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকেন। টুণ্ডা মিরপুর বিহারী কলোনীর পাশে বসবাস করতো এবং মিরপুরে তার একটি মিষ্টির দোকানও ছিল বলে জানা গেছে। ভারতের তরফ থেকে টুণ্ডা বাংলাদেশে আছে এমন অভিযোগ করা হলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ব্যাপক অনুসন্ধান করা হলেও তার খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি। আ.লীগ সরকারের আমলে ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা দি পাইওনিয়ার বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর শক্তিশালী সোর্স মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরের সূত্রে বেশ জোর দিয়ে নিশ্চিত করে যে টুণ্ডা ঢাকার খিলগাঁও রেল ক্রসিং এলাকায় ট্রেনে কেটে মারা গেছে। এরপর রহস্যজনক কারণে ভারতীয় পক্ষ টুণ্ডার ব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। সম্ভবত নতুন এসাইনমেন্টে নামেন টুণ্ডা। ১৯৯৬ সালে ঢাকার পল্টনস্থ এশিয়া ড্রাগন ট্রাভেল এজেন্সি অফিসে মাওলানা ইসহাকের মাধ্যমে টুণ্ডা প্রথম আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ বৈঠকে ইসহাক সাহেব আবদুর রহমানকে ওলিয়ারের ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দেন। এক সপ্তাহ পরে যাত্রাবাড়ী বটতলা মাদ্রাসা ছাত্রদের মেসে আবদুর রহমানের সাথে টুণ্ডা দ্বিতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ করেন এবং জিহাদের বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐ বৈঠকে টুণ্ডা আবদুর রহমানকে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহায়তার আশ্বাস দেন। তারা উভয়েই যোগাযোগের জন্য ঐ মাদ্রাসার ছাত্র সানাউল্লাহকে ব্যবহার করতো। ১৯৯৭ সালে আবদুর রহমান টুণ্ডার সাথে চট্টগ্রামের ঝাউতলা আহলে মসজিদে গমন করেন এবং এখানে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। টুণ্ডা কৌশলে আবদুর রহমানকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পরিবর্তে পাকিস্তানে যেতে রাজি করান। তিনি এ ব্যাপারে সব ব্যবস্থা করে দেবেন জানিয়ে আবদুর রহমানকে ভিসা পাসপোর্ট তৈরী করার নির্দেশ দেন। ঐ বছরই আবদুর রহমান টুণ্ডার ব্যবস্থাপনায় দিল্লী হয়ে পাকিস্তান যাবার লক্ষ্যে বেনাপোল-হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং দুই বছর

www.pathagar.com

আগে থেকে কোলতায় বসবাসকারী তারই ভাই ওলিয়ারের বাসায় ওঠেন। কিন্তু সে যাত্রায় আবদুর রহমানের পক্ষে আর পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভারত থেকে ফিরে আসার পর ১৯৯৭ সালের শেষদিকে টুণ্ডার ব্যবস্থাপনায় তিনি বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পাকিস্তান গমন করেন। পাকিস্তানে প্রথমে তাকে করাচি এবং পরবর্তীতে লাহোরের মুরিদকিতে অবস্থিত আহলে হাদীস সমর্থিত লস্কর-ই তৈয়বার মাতৃ সংগঠন মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ-এর সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ প্রধান ও লস্কর-ই তৈয়বার আমীর হাফেজ সাঈদ ও টুণ্ডার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। এরপর লাহোর থেকে তিনি মুজাফ্ফরাবাদে যান এবং লস্কর-ই তৈয়বার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে একমাস অবস্থান করে বিস্ফোরক তৈরী, অস্ত্র চালনা, রণকৌশল, গোপনীয়তা, গোয়েন্দাবৃত্তি পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০২ সালে আবদুর রহমানের সাথে টুণ্ডার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় এবং রহস্যজনক মিশন শেষ করে টুণ্ডা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন বলে জানা যায়। (১৯৯৮ সালে জেএমবি সদস্য নাসারুল্লাহ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বাংলাদেশে আসার পথে পাকিস্তান যান এবং সেখানে লস্কর-ই তৈয়বার কাছে বোমা তৈরী ও অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন)।

২০০২ সালে সৌদী আরবে প্রবাসী তার ভাই ওলিয়ার রহমানের সহযোগিতায় পুনরায় দ্বিতীয় বারের মতো পাকিস্তানে গমন করেন। এই সফরকালে আবদুর রহমান পাকিস্তান আহলে হাদীসের অনুসারী সংগঠন তাহরিক উল মুজাহিদীন-এর সভাপতি শেখ জামিলুর রহমান, মার্কাজে জমিয়তে আহলে হাদীস নেতৃবৃন্দ, লস্কর-ই তৈয়বার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুস সালাম বাটভী ও জামায়াতুল মুজাহিদীন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শেখ জামিলুর রহমান তাকে ৬০ হাজার রুপী হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। এছাড়াও শেখ জামিলুর রহমান ঢাকায় অবস্থিত তাহরিক উল মুজাহিদীনের সদস্য আবদুর রাজ্জাককে হস্তান্তরের জন্য ১ লক্ষ রুপী আবদুর রহমানকে দিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ঢাকায় ফিরে উক্ত টাকা আবদুর রাজ্জাককে হস্তান্তর করেছিলেন। শেখ জামিলুর রহমান ২০০৩-২০০৪ সালের দিকে ঢাকায় এসে আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এরপর আবদুর রহমান তাকে ঢাকাস্থ জেএমবি'র বাসায় নিয়ে যান। অবশ্য এর পূর্বে শেখ জামিলুর রহমান ঢাকা ও রাজশাহীতে ড. গালিবের সাথে বৈঠক করেন। এখানে উল্লেখ্য, আবদুর রহমানের ভাই ওলিয়ার রহমান ১৯৯৬ সাল থেকে টুণ্ডার ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাসায় লেখাপড়ার ছদ্মাবরণে ভারতের কোলকাতায় দুই বছর অবস্থান করেছিলেন। জেএমবিকে অপারেশনে নামিয়ে দিয়ে টুণ্ডা রহস্যজনকভাবে আর তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। ২০০২ সালে টুণ্ডার সাথে আবদুর রহমানের শেষ সাক্ষাৎ হয়। তবে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার আগে আবদুর রহমান টুণ্ডার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সফল হননি।

১৯৯৮ সালের প্রথমদিকে টুণ্ডা লেখাপড়ার ছদ্মাবরণে শুরা সদস্য হাফেজ মাহমুদ ও আবদুল মতিনকে মুর্শীদাবাদ জেলার লালগোলায় প্রেরণ করেন। ভারতে যাওয়ার পর তারা কোলকাতার মিটিয়াব্রুজ থানার হালদারপাড়া আহলে হাদীস মসজিদের খতীব আইনুল বারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে আইনুল বারীর সহযোগিতায় নদীয়ার পলাশী মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ৮ মাস সেখানে লেখাপড়া করেন। এ সময় হাফেজ মাহমুদ নদীয়ার দেবগ্রামের বাসিন্দা জনৈক লবির'র বাড়িতে লজিং থাকতো। সেসময় টুণ্ডা তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্য এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য নির্দেশ দেয়। মূলত ভারত থেকে অস্ত্র ও

www.pathagar.com

গোলাবারুদ আনার ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন ও জ্ঞান লাভই এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল।

২০০২ সালের প্রথম দিকে বেলাল (৪০), সালাহউদ্দীন (৩০) ও মোতাসিম (২৭) নামে তিন ভারতীয় নাগরিক মুর্শীদাবাদ জেলার মালদহ থেকে গোদাগাড়ি সীমান্ত দিয়ে রহস্যজনকভাবে স্বউদ্যোগে বাংলাদেশের দিনাজপুর আসে। সালাহউদ্দনী ও মোতাসিম মুর্শীদাবাদ জেলার পানব্রুজ জঙ্গীপুরের বাসিন্দা। এ সময় তারা শুধু শূরা সদস্য খালেদ সাইফুল্লাহর সাথে দেখা করে ভারতে ফিরে যায়। পরবর্তীতে তাদের আগ্রহ অনুযায়ী একই বছর খালেদ সাইফুল্লাহর মধ্যস্থতায় টাঙ্গাইলে মোল্লা ওমরের বাড়িতে আবদুর রহমানের সাথে তাদের দেখা হয়। সাক্ষাতে তারা আবদুর রহমানের কাছে তার জিহাদী কার্যক্রমে সর্বপ্রকার সাহায্যের নিশ্চয়তা দেয়া হয় এবং জেএমবি'র ২/১ জন সদস্যকে ভারতে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক তাদের ফিরে যাবার কিছু দিন পর আতাউর রহমান সানী ও হাফেজ মাহমুদ মালদহে গমন করেন। এ সময় ভারতীয় পক্ষ থেকে বাংলাদেশে জিহাদ পরিচালনার জন্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহের প্রস্তাব দেয়া হয়।

শায়খ আবদুর রহমানের ছেলে নাবিল ও মাহমুদ যাত্রাবাড়ীস্থ মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় হাফেজী পড়তো। সেই সূত্রেই আবদুর রহমান সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করতো। এখানেই তার সাথে পরিচয় হয় মাদ্রাসা ছাত্র শাহেদ বিন হাফিজ, হাফেজ মাহমুদ, নাসিরুল্লাহ, আবুল কাশেম ও সানাউল্লাহ'র সাথে। এরা প্রত্যেকে আহলে হাদীসের সমর্থক এবং অন্তরে জিহাদী চেতনা লালন করতো। আবদুর রহমান তাতে ঘৃতাহুতি দেয়। আবদুর রহমানের মতো একজন পয়সাওয়ালা ও সংগঠক পাওয়ায় তাদের অনেক সুবিধা হয়। ফলে মাদ্রাসার মধ্যেই তারা জিহাদ সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা করতে থাকে। পরবর্তীকালে মাদ্রাসার বাইরে গিয়েও বিভিন্ন মানুষের সাথে জিহাদের আলোচনা, তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা ও সমর্থক তৈরী করার কাজ চলতে থাকে।

জেএমবি'র নেতৃবর্গ

প্রাথমিক অবস্থায় ১৯৯৮ সালে জেএমবি শায়খ আবদুর রহমানকে আমীর নিযুক্ত করে একটি শূরা কমিটি গঠন করে জেএমবি তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে। শূরা কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন :

১. শাহেদ বিন হাফিজ (৩২), পিতা-মোহাম্মদ হাফিজ, গ্রাম-হুয়াকুয়া, থানা-সোনাতলা, জেলা-বগুড়া। শাহেদ বিন হাফিজ ২০০১ সালে দল ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং বর্তমানে সে কাপড়ের ব্যবসা করছে বলে জানা গেছে।

২. রানা (২৮), গ্রাম-নিজবালাই, থানা-সারিয়াকান্দি, জেলা- বগুড়া। ২০০০ সালে রানাও দল ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

৩. হাফেজ মাহমুদ ওরফে রাকিব হাসান (২৪), গ্রাম- সফিকপুর, থানা মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর।

৪. সালেহিন ওরফে সালাউদ্দীন (২৪), ৫৮ এইচএম সেন রোড, গ্রাম-বন্দর, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।

৫. খালেদ সাইফুল্লাহ ওরফে ফারুক হোসেন (৩৫), পিতা-নজরুল ইসলাম, গ্রাম-বোয়ালতা, থানা-কাউখালী, জেলা-পিরোজপুর।

www.pathagar.com

শূরা কমিটি গঠনের পর আবদুর রহমানের নির্দেশে সবুজবাগ থানাধীন কদমতলার ইয়াসীন মঞ্জিলের ৪র্থ তলার একটি ফ্লাট ভাড়া করে সংগঠনের কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রথম দিকে জেএমবি'র সদস্যগণ ২/৩ জনের দলে বিভক্ত হয়ে সারা দেশে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে শুরু করে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই শূরা কমিটিতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। আবদুর রহমানের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বা শূরা কমিটি গঠন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। জেএমবি'র পরবর্তী শূরা কমিটির সদস্যরা হলো :

১. সালেহীন ওরফে সালাউদ্দিন। ঠিকানা : ৫৮ এইচএম সেন রোড, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
২. হাফেজ মাহমুদ ওরফে রাকিব হাসান। ঠিকানা : গ্রাম-সফিকপুর, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর।
৩. আব্দুল আউয়াল ওরফে আদিল। ঠিকানা : পিতা-মৃত হামিদ আলী, গ্রাম-কালীগঞ্জ বাজার, থানা-সিংড়া, জেলা-নাটোর।
৪. রকিব হাসান রাসেল ওরফে হাফেজ মাহমুদ। ঠিকানা : পিতা-আব্দুস সোবহান, গ্রাম-ফুলছেন্নাপুর, পোস্ট-জালালপুর, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর।
৫. সালাহউদ্দিন ওরফে সালেহীন। ঠিকানা : পিতা-রফিকুল ইসলাম, গ্রাম-৫৮ এইচএম সেন রোড, বন্দর জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
৬. সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই। ঠিকানা : পিতা-নাজির হোসেন মাস্টার, গ্রাম-কর্নিপাড়া, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া।
৭. ফারুখ হোসেন ওরফে খালেদ সাইফুল্লাহ। ঠিকানা : পিতা-নজরুল ইসলাম, গ্রাম-বোয়ালতা, থানা-কাউখালী, জেলা-পিরোজপুর।

www.pathagar.com

সাংগঠনিক কার্যক্রম

প্রাথমিক প্রস্তুতি

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে জেএমবি শায়খ আবদুর রহমানকে সংগঠনের আমীর এবং উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বা শূরা কমিটি গঠন করা হয়। আমীরসহ উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে জনবহুল আহলে হাদীস এলাকায় গমন করে মসজিদে মসজিদে আলোচনা ও প্রেরণামূলক বক্তৃতা প্রদান শুরু করে। বিশেষ করে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার আহলে হাদীস মসজিদ, খুলনার নিরালা তাবলীগ মসজিদ, জামালপুর, টাঙ্গাইল সহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে জেএমবি তাদের প্রাথমিক স্নায়ুবিক প্রচারকার্য পরিচালনা করে। এ সময়ে তারা বিভিন্ন মসজিদে জুমা এবং অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজের আগে ও পরে বক্তৃতা প্রদান করতো। এ সকল বক্তৃতায় আফগানিস্তানের যুদ্ধ, ফিলিস্তিন যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা প্রভৃতি উল্লেখ করে সকলকে জিহাদের পথে আত্মোৎসর্গ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। শায়খ আবদুর রহমান নিজে, গ্রেফতারকৃত হাফেজ ওবায়দুর রহমান ও সৌদী আরবে চাকরিরত অলিউর রহমান (দু'জনেই আবদুর রহমানের আপন ছোট ভাই) দেশের বিভিন্ন আহলে হাদীস মসজিদে এবং বিভিন্ন ইসলামী জলসায় জিহাদী অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করে জনসাধারণকে জেএমবি'র প্রতি আকৃষ্ট করতো। শূরা সদস্যরা তাদের ঘনিষ্ঠ অন্যান্য গুটিকয়েক দৃঢ়প্রত্যয়ী সদস্যকে দিয়ে এলাকাভিত্তিক সাধারণ সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে। উক্ত সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় খোদাভীরু, নামাজী ও অল্প বয়স্ক ছেলেদের কাছে সংগঠনের সহায়ক বিভিন্ন জিহাদী বই ও জেএমবি কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসিক আল মাগাজী' (পরবর্তীতে আল-ইসলাম) পত্রিকা পড়ার জন্য প্রদান করে। কিছু দিন পর ঐ সকল ব্যক্তিকে সংগঠনে যোগদানের জন্য সরাসরি দাওয়াত দেয়া হয়। এভাবেই প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। ঢাকার পূর্ব বাসাবোর কদমতলা এলাকায় জেএমবি একটি বাসা ভাড়া নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে।

জেএমবি সদস্যদের পর্যায় ভাগ

জেএমবি'র সদস্যগণ নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :

সাথী ও সুধী : সংগঠনে যখন কেউ প্রাথমিকভাবে যোগদান করে তাকে সদস্য/সাথী এবং যে সমস্ত লোকজন সংগঠনকে সমর্থন করে এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে তাদেরকে সুধী বলে। সারা দেশে প্রায় ৪২৫০ জন সুধী রয়েছে।

গায়েরে এহসার : যে সকল সাথী দলের জন্য নিবেদিত, কর্মতৎপর ও ইয়ানত সংগ্রহে পারদর্শী এবং নিজ এলাকায় সংসার ধর্ম পালন করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদেরকে গায়েরে এহসার বলা হয়।

এহসার : উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী ব্যক্তি যে তার সংসার ধর্ম ও জানমাল ত্যাগ করে সংগঠনের জন্য অন্য এলাকায় দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এহসার বলা হয়।

মহিলা ইউনিট : জেএমবিতে ১০-১২ জন করে মহিলা নিয়ে গঠিত শতাধিক মহিলা ইউনিট ছিল। মহিলা সদস্যদের প্রধান কার্যক্রম ছিল ব্যক্তিজীবনে ইসলামের চর্চা করা, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং পরিবারের সদস্যদের জিহাদে উৎসাহিত করা। সাধারণত সংগঠনের সদস্যদের পরিবারের মহিলাগণই এতে যোগ দিয়েছিল। তবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে অনেক সময় পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছিল বলে ২০০৩ সালেই জেএমবি'র মহিলা ইউনিট ভেঙে দেয়া হয়। তবু পারিবারিকভাবে তার

www.pathagar.com

কিছুটা প্রভাব রয়ে যায়। তবে কোনো মহিলা সদস্যদেরই তারা জিহাদ সংক্রান্ত শারীরিক বা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এছাড়া জেএমবিতে কোনো আত্মঘাতী মহিলা স্কোয়াড বলে কখনো কিছু ছিল না।

সুইসাইড স্কোয়াড : জেএমবিতে কোনো সুইসাইড স্কোয়াড ছিল না বা এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণও কখনো কোনো সদস্যদের দেয়া হয়নি। তবে ১৭ আগস্ট ২০০৫ পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেককে আত্মঘাতী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল যাদের দিয়ে কয়েকটি অপারেশনও পরিচালিত হয়েছিল।

সাংগঠনিক কাঠামো

২০০০ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সংগঠনের নিম্নরূপ কাঠামো দাঁড়িয়ে যায় :

ইউনিট : জেএমবি'র ৩ থেকে ৫ জন সাধারণ সদস্য অথবা গায়েরে এহসার-এর সমন্বয়ে একটি ইউনিট গঠিত। ইউনিটের নেতাকে ইউনিট প্রধান বলা হয়। প্রাথমিক সদস্য হওয়ার পর উদ্বুদ্ধকরণ, কিতাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও মুয়াসকার (প্রশিক্ষণ) গ্রহণের পর সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে হলে সাধারণ সদস্যকে ইউনিট দায়িত্বশীলের পদ দেয়া হয়।

থানা/উপজেলা সংগঠন : কয়েকটি ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত। থানা সংগঠনের নেতাকে থানা/উপজেলা দায়িত্বশীল বলা হয়। ইউনিট প্রধানদের মধ্যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি অর্থাৎ যারা দলের মধ্যে নিবেদিত, কর্মতৎপরতায় পারদর্শী, সাথী, সুধী ও ইয়ানত সংগ্রহে পারদর্শী তাদের মধ্য থেকে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে থানার দায়িত্বশীল হিসেবে মনোনীত করা হয়। এহসার সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সাধারণত গায়েরে এহসার ব্যক্তিদেরই দায়িত্ব দেয়া হয়। এহসার সদস্যকে দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে সাধারণত তাকে তার নিকটসহ অন্য এলাকায়/জেলায় দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়।

জেলা সংগঠন : কয়েকটি থানা/উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত। গুরুত্ব বিবেচনা করতঃ কোন একটি উপজেলাকে অথবা কয়েকটি উপজেলাকে একত্রিতভাবে জেএমবি'র

www.pathagar.com

সাংগঠনিক জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাকে একটি সাংগঠনিক জেলা এবং দিনাজপুরের বিরামপুর সদর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও ফুলবাড়িয়া থানাসমূহকে একত্রিতভাবে আরেকটি সাংগঠনিক জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। জেলা সংগঠনের নেতাকে জেলা দায়িত্বশীল বলা হয়। পুরাতন যে সমস্ত এহসার থানার দায়িত্বশীল আছে, তাদের মধ্য হতে যাকে যোগ্য মনে হয় তাকেই জেলার দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয়। জেলার দায়িত্বশীল অবশ্যই এহসার হতে হবে।

জোন সংগঠন : কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। জোনের নেতাকে জোন দায়িত্বশীল বলা হয়। জেলা দায়িত্বশীলদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিকে জোনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় সংগঠন : একটি সম্পূর্ণ বিভাগ অথবা বিভাগের অংশ এবং কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত নেতাকে বিভাগীয় দায়িত্বশীল বলা হয়। সাধারণত শূরা সদস্যদেরকে বিভাগীয় দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

উপজেলা, জেলা, জোন ও বিভাগীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি গ্রেফতার হলে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পদগুলো জেএমবি'র অন্য দায়িত্বশীলদের দ্বারা পূরণ করা হয়ে থাকে। যেমন : রাজশাহী জোনের দায়িত্বশীল আবুল কালাম ওরফে তারেক গ্রেফতার হওয়ার পর শেরপুর জেলার দায়িত্বশীল আব্বাস রাজশাহী জোনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আব্বাস গ্রেফতার হলে শেরপুরের দায়িত্বশীল ফুয়াদ রাজশাহী জোনের দায়িত্ব নেয় এবং বগুড়া মাঝিরা থানার দায়িত্বশীল ব্যক্তি শেরপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার আতাউর রহমান সানী গ্রেফতার হওয়ার পর রেজা ওরফে রবি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

"জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র।"

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ।

(ইক্বামতে দ্বীন, পৃ. ২৭)

www.pathagar.com

জেএমবি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নিজেদের শক্তি বিন্যাসের তালিকা

DCEMBER 2004

বিভাগ:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
তারেক	১	৮	১	১৫	×	১৩৪	৩৮৭		৬২১	৭৪২	১	×	৪৭৬	১৫		৫	৩	৮	×	৬	×	×
আসাদুল্লাহ	৪	২৩	৪	২২	১	২২৫	[illegible]		৫৪২	৭৬০	৫	২	৬৫২	১		×	১	১৬	×	৫	×	×
রহমান	৪	২৫	৫	১৬	×	১২২	৬০০		৭০৪	১১৮	×	×	৫৪৪	১		১	১	২	×	৫	×	×
সুলাইমান	৪	২০	১	২	৮	৬৩	১৩৫		১৩৬০	২৫	×	২	৬৪	×		×	×	২	×	২	×	×
উসমান	৬	৪৪	৬	৫১	২	৬২২	১৭৫০		২০২৫	[illegible]	৪	৬	৭০০	১৭		১০	৩	২১	৬	[illegible]	১	[illegible]
আতিক	৬	৬৬	১	৬	২২	৬৫	১৪৯		৬৪৪	২৪	[illegible]	১	১৭	×		×	×	৬	×	১	×	×
খায়রুল	৭	৬৫	৭	৬৫	৭	৫০০	[illegible]		১৫০০	৬৭৪	৫	৪	১৫৫	৫		১	২	৬৬	১	৫	×	×
সাব্বির	৫	[illegible]	২	৭০	৩০	১৪৪	৬৭০		৪৭৩	৪৭		২	২৯১			৬	২	৪	×	১	[illegible]	×
সর্বমোট	৩৭	২২০	২৭	২১১	৫৫	১৬৫৪	[illegible]		৬৭৩১	১১২৭	২৪	১৭	৪৩৩০	৩১		২৪	১২	২১	৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]

মোমিন:- নারী
1
6
12
9
18
1/24

ACTIVE MEMBER-6739
SYMPATHIZER-4250

www.pathagar.com

জনবল সংগ্রহ বা রিক্রুটিং ব্যবস্থা

১৯৯৮ সালে জেএমবি'র মজলিসে শূরা গঠিত হওয়ার পর কর্মী তৈরীর উদ্দেশ্যে শূরা সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শূরা সদস্যগণ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে নিজেদের আসল নাম পরিবর্তন করে সাংগঠনিক ছদ্মনামে বাসা ভাড়া নিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করে। জেলার বিভিন্ন থানায় তাবলীগের পদ্ধতিতে সফর শুরু করে প্রেরণা, ধর্মীয় আলোচনা, বক্তৃতা ও দাওয়াতের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ বা রিক্রুটিংয়ের কাজ চালাতে থাকে। এক জেলায় কর্মী সংগ্রহ আশানুরূপ হলে শূরা সদস্যগণ পরবর্তী অন্য জেলায় গমন করে। যখন সব জেলাতেই কিছু কিছু কর্মী তৈরী হয় তখন তাদেরকে একত্রিত করে বিভিন্ন আহলে হাদীস মসজিদে তাবলীগবেশে তালিম দেয়া হয়। তালিম দেয়া শেষ হলে সদস্যদেরকে ইউনিট, থানা ও জেলা সংগঠন অনুযায়ী বিভক্ত করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। জনবল সংগ্রহ ও রিক্রুটিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নীতিমালা জেএমবি অনুসরণ করতো, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. কর্মী সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে যে কোন লোককে টার্গেট করতে হবে। একজন সাথী প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩ জন লোককে টার্গেট করবে এবং তাদেরকে প্রাথমিক কর্মী হিসেবে মনোনীত করবে।
২. টার্গেটকৃত ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।
৩. টার্গেটকৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে সংগঠনের নিজস্ব কর্মী অথবা টার্গেটকৃত লোকের পরিচিত অন্যলোক দিয়ে অভ্যন্তরীণ খোঁজ খবর নিতে হবে। এই অভ্যন্তরীণ খোঁজ খবর ব্যক্তিগত ও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।
৪. উক্ত টার্গেটকৃত ব্যক্তি যদি দাওয়াত গ্রহণের অনুকূলে হয় তখন তাকে দাওয়াত দেয়া হয়।
৫. যে বিষয়ে দাওয়াত দেয়া হবে সে বিষয়ে নিজেকে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে সাথে দাওয়াতী বিষয় কি পদ্ধতিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে এবং রসূল (সা.) কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নোট রাখতে হবে।
৬. দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভূমিকা পালন করতে হবে।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রেও জেএমবি বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতো। যেমন :

১. সরাসরি দাওয়াত দেয়া।
২. অন্য কোন পরিচিত বা আত্মীয়ের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া।
৩. তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া।
৪. দাওয়াতীদের মধ্যে যারা মুমিন তাদেরকে কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা ও তার আমল পরিশুদ্ধ করা।
৫. মাযহাবীদের ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে আকীদা সংশোধনের চেষ্টা করা।
৬. দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে স্থান ও সময় নির্ধারণ করা এবং তা টার্গেটকৃত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা।
৭. দাওয়াত দেয়ার স্থান যেন নিরাপদ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেমন মসজিদ, খোলা মাঠ, নিজ গৃহ ইত্যাদি।
৮. অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এ রকম এলাকায় সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা। টার্গেটদের মধ্যে একাধিক দাওয়াতী তৈরী করে ঐ সমস্ত দাওয়াতীদেরকে নিয়ে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা।

আবার সমষ্টিগত আলোচনা শুরুর আগে জেএমবি কিছু অনুসরণীয় পদ্ধতি অবলম্বন

www.pathagar.com

করতো। যেমন :

১. হামদ ও সানা দিয়ে শুরু করা।
২. কালেমা পাঠ করা।
৩. দ্বীন ও দ্বীনের ব্যাখ্যা দান।
৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, না করলে কি ক্ষতি, করলে কি লাভ তা বোঝানো।
৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি মতবাদ চালু আছে? এগুলো দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি? কেন সম্ভব নয় তা বোঝানো?
৬. রসূল (সা.) কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা উপস্থাপন করা। যেমন : উদ্বুদ্ধকরণ (তাহরীজ), প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ (এসতেদাব), সশস্ত্র যুদ্ধ (কিতাল) আল্লাহর রাস্তায়– প্রমাণস্বরূপ কোরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা।
৭. দাওয়াত দেয়ার পর সাথী বা কর্মী ভাইয়ের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া।
৮. বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ানো এবং ইয়ানত নির্ধারণ করা। তবে ২০০২ সাল পর্যন্ত এরূপ সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জীবন বৃত্তান্ত ফরম পূরণ করা হতো। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া চালু নেই।

এই প্রক্রিয়ায় একজন পূর্ণাঙ্গ সদস্য রিক্রুটে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সময় ব্যয় হতো।

জেএমবি'র প্রশিক্ষণ

বোমা তৈরী : শায়খ আবদুর রহমান, সালাহউদ্দিন ও খালেদ সাইফুল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়ে জেএমবি'র প্রশিক্ষক হিসেবে মূল ভূমিকা পালন করে। শায়খ আবদুর রহমান ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের করাচী, বালাকোট প্রভৃতি এলাকা সফর করে তাহরিক-উল-মুজাহিদীন-এর নিকট হতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া শেখ নাসরুল্লাহ (২০০১ সালে রাঙ্গামাটিতে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করে) ১৯৮৯ সালে পাকিস্তান গিয়ে অস্ত্র ও বোমার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

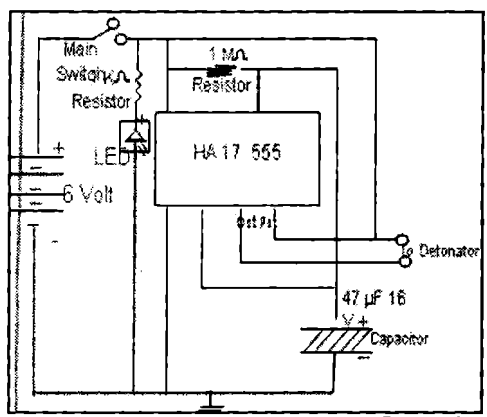

জেএমবি'র বোমা তৈরীর ফর্মূলা

সালাহউদ্দিন ও খালেদ সাইফুল্লাহ ১৯৯৯ সালে শায়খ আবদুর রহমান ও নাসরুল্লাহর কাছে অস্ত্র ও বোমা তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এছাড়াও ২০০২ সালে শায়খ আবদুর রহমান পাকিস্তান গিয়ে লস্কর-ই-তৈয়বা সংগঠনের নিকট থেকেও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। খালেদ সাইফুল্লাহ (আসল নাম-ফারুক হোসেন) 'হরকাতুল জিহাদ-আল-ইসলামী বাংলাদেশ'-এর একজন প্রাক্তন সদস্য এবং আরাকান বাহিনীর সাথে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে জেএমবি আভ্যন্তরীণ তাদের সকল সদস্যের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করে থাকে। মূলত গায়েরে এহসারদের জন্য তিন দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাবলীগের বেশে বিভিন্ন মসজিদে, কওমী মাদ্রাসার মাঠে, চরাঞ্চলে, অল্প জনবসতি এলাকার বড় মাঠ ইত্যাদি স্থানে এই প্রশিক্ষণগুলো দেয়া হতো। প্রশিক্ষণ সেশনগুলোতে শারীরিক কসরত, মার্শাল আর্ট, বোর্ডে এঁকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছাড়াও ফিল্ড ক্রাফট এবং গোয়েন্দাবৃত্তির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এই প্রশিক্ষণগুলো জেএমবি'র নির্ধারিত প্রশিক্ষক দ্বারা করানো হতো। জেএমবি প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথমদিকে প্রশিক্ষণ মূলত সংগঠনের আমীর শায়খ আবদুর রহমান দিতো। সাধারণ সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এহসার এবং শূরা কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। খালেদ সাইফুল্লাহ গোয়েন্দা সংক্রান্ত যেমন: নাম পরিচিতি গোপন রাখা, ব্যবহৃত টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন করা, কেউ অনুসরণ করছে কিনা তা দেখা এবং ক্যামোফ্লাজ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করতো। সকল স্থানে একই রকম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত হতো।

শূরা কমিটির সকল সদস্য এবং এহসারগণ মিলিয়ে মাত্র ৪০ জন বোমা তৈরীতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তবে এই কাজের জন্য অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট কিছু লোক রয়েছে। এইসব কাজের জন্য তারা ইন্টারনেট হতে বিভিন্ন বই-পুস্তক ডাউন লোড করে তা বাংলায় তর্জমা করে তাদের কাজ চালাতো। এছাড়া ২০০১ সালের শেষে বা ২০০২ সালের শুরুতে টাঙ্গাইল জেলার সখিপুরের হাঁটুভাঙ্গা নামক এলাকায় বোমা প্রস্তুত করার উপর তিন দিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে শায়খ আবদুর রহমান, সালাহউদ্দিন এবং শাকিল ওরফে মোল্লা ওমর প্রশিক্ষক হিসেবে অন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে দুইটি ব্যাচে প্রায় ১০-১৫ জন বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এছাড়া ২০০৩ সালের শুরুতে পাবনা জেলার সদর থানায় তিন দিনব্যাপী বোমা বানানোর একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাকিল ওরফে মোল্লা ওমর প্রশিক্ষক হিসেবে অন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়।

জেএমবি সাধারণত তিন প্রকার বোমা প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ দিতো। যথা : ১। এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ৮১ ভাগ এবং এলুমিনিয়াম পাউডার ১৯ ভাগ মিশ্রিত করে ইলেকট্রিক ডেটোনেটরের মাধ্যমে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, ২। পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং এ্যালুমিনিয়াম পাউডার মিশ্রিত করে ইলেকট্রিক ডেটোনেটরের মাধ্যমে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, ৩। কার্বন ৫ ভাগ, পটাসিয়াম ক্লোরেট ৭০ ভাগ এবং সালফার ২৫ ভাগ মিশ্রিত করে গান পাউডার প্রস্তুতকরণ এবং এই গান পাউডার দিয়ে বোমা প্রস্তুত করে ইলেকট্রিক ডেটোনেটরের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো। তবে ডেটোনেটর প্রস্তুতকরণেই এটি অধিক ব্যবহার করতো তারা। এছাড়া অনেককে নাইট্রিক এসিড এবং টিএনটি সম্পর্কে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ধারণা দেয়া হয়েছিল যার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা।

প্রশিক্ষণ : জিএমবি সাধারণত যে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতো বলে জানা গেছে সেগুলো হলো :

এক রাত্রিব্যাপী প্রশিক্ষণ (Training Session) : এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোরআন হাদীসের আলোকে জিহাদ এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা, জিকির আজকার, তাহাজ্জত নামাজ, দোয়া দরুদ, হালকা শারীরিক কসরত ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

তিন রাত্রিব্যাপী প্রশিক্ষণ (Training Camp) : তিন রাত্রিব্যাপী এই প্রশিক্ষণে থাকতো দরসুল কুরআন (জিহাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াতের উপর আলোচনা), দরসুল হাদীস (জিহাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের উপর আলোচনা), দরসুল এখলাছ (গোয়েন্দা

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ), দরসুল সামান (অস্ত্র প্রশিক্ষণ), নামাজ আদায়ের পদ্ধতি, সকাল সন্ধ্যার জিকির আজকার ইত্যাদি। দরসুল এখলাছে গোয়েন্দা পরিচালনার পদ্ধতিও থাকতো। এছাড়াও থাকতো সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ-রাসূলের জীবনী পর্যালোচনা।
মূলত গায়েরে এহসারদের (সাধারণ সদস্য) জন্য তিন দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাবলীগের বেশে বিভিন্ন মসজিদে এই প্রশিক্ষণগুলো দেয়া হতো। এই ধরনের প্রশিক্ষণে একটি কোড নম্বর দেয়া হতো যার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের সময় তাদের পরিচয় প্রকাশ পেত।
উভয় প্রশিক্ষণেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড তথা সংগঠনের পরিচয় এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে এর পার্থক্য, সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি, আয় ও ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি, দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

জেএমবি নেতাদের বিদেশ ভ্রমণ

শায়খ আবদুর রহমান আনুমানিক ১৯৯৭-৯৮ সালে পাকিস্তানে গমন করেন। সেখানে থেকে তিনি তাহরিকুল মুজাহিদীন সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে শায়খ আবদুর রহমান পুনরায় পাকিস্তান গমন করেন। সেখানে তিনি লস্কর-ই তৈয়বার নেতা হাফেজ ভাতভি এবং তাহরিকুল মুজাহিদীন নেতা জামিলুর রহমানের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। খালেদ সাইফুল্লাহ হরকাতুল জিহাদের সদস্য থাকা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এছাড়া শায়খ আব্দুর রহমানের নির্দেশে আতাউর রহমান সানী ২০০২ সালের ১৫ জুলাই ভারত যায় এবং ২৫ দিন থাকার পর আগস্টের ১৩ তারিখে বাংলাদেশে ফেরত আসে। এছাড়াও জেএমবি'র সদস্য হাফেজ মাহমুদ ওরফে রাকিব হাসান শায়খ আবদুর রহমানের নির্দেশে বেশ কয়েকবার ভারত যায়।

জেএমবি'র তহবিল সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

তহবিল সংগ্রহ : জেএমবি'র মাঠ পর্যায়ের সাথীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইয়ানতের (চাঁদা) টাকা ছিল সংগঠনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। জেএমবি'র অর্থ কর্মীদের মাসিক ইয়ানত এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন : ওরশ, যাকাত, ফেতরা, চামড়া, এককালীন দান ইত্যাদি থেকে সংগঠনের তহবিলে জমা হতো। কর্মী বা সুধীদের সামর্থ্য বা ক্ষমতা অনুযায়ী মাসিক চাঁদার হার নির্ধারিত ছিল তবে তা সর্বনিম্ন ১০ টাকার নীচে নয়। ইউনিটভিত্তিক চাঁদা উত্তোলন করা হতো। পরবর্তীতে উত্তোলনকৃত চাঁদা থেকে স্থানীয় কর্মীদের সাংগঠনিক খরচ বহন করার পর অবশিষ্ট টাকা থানা, জেলা, বিভাগ এবং চূড়ান্তভাবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা করা হতো।
বিভিন্ন বিদেশী উৎস থেকে জেএমবি যে অর্থ সাহায্য পেয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সৌদী নাগরিক হাম্মাম কর্তৃক ১০-১২ হাজার টাকা, সৌদী প্রবাসী ভাই ওলিয়ার কর্তৃক পাঠানো ৩ লক্ষ টাকা, তাহরিক উল মুজাহিদীনের আমীর শেখ জামিলুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৬০ হাজার টাকা, সৌদী প্রবাসী শাহ আলমের নিকট থেকে ৩/৪ বারে পাওয়া ৩-৪ লাখ টাকা, ভারতীয় নাগরিক বশীর কর্তৃক ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং মালদহ থেকে প্রতিমাসে ১০-১২ হাজার টাকা অন্যতম। এছাড়াও ২০০৫ সালের জুন মাসে লন্ডন থেকে আগত পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত দুই ব্রিটিশ নাগরিক আবদুর রহমান (৩৫) ও সাজ্জাদ হোসেন (৩২) জেএমবিকে ১০,০০০ ব্রিটিশ পাউন্ড প্রদান করে।

www.pathagar.com

তাছাড়া বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক অফিস, এনজিও অফিসে ডাকাতি কার্যক্রম পরিচালনা করে যে অর্থ এবং মালামাল পাওয়া গিয়েছিল তা আনফাল বা গনিমতের মাল হিসেবে সংগঠনে জমা হতো। উক্ত ডাকাতির নগদ টাকা ও মালামাল বিক্রি করে সংগঠনের নিয়ম মোতাবেক সদস্যদের মধ্যে ৮০% ও বাকী ২০% সংগঠনের বায়তুল মালের ফান্ডে জমা করা হতো। এছাড়াও এহসারদের রিকশা চালানো, চা বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা সংগঠনে জমা হতো। জেএমবি'র অর্থের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

১. জেএমবি'র সাধারণ সদস্য ও অনুসারীদের মাসিক ইয়ানত (চাঁদা) ও উসুল।
২. সুধীদের যাকাত, ফেতরা ও কোরবানীর চামড়ার অর্থ ও অনুদান।
৩. বিভিন্ন সময়ে সুধীদের কাছ থেকে এককালীন অনুদান এবং
৪. বিভিন্ন সময়ে বিদেশী সুধীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এককালীন অনুদান।

আর্থিক লেনদেন

ব্যাংক একাউন্ট : ফরিদুজ্জামান ওরফে স্বপন, পিতা : মো: ইমান উদ্দিন ওরফে ইমান আলী, ঠিকানা : গ্রাম-পাবই, পোস্ট-পাবই বাজার, থানা ও জেলা-জামালপুর এর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, মতিঝিল শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩৮৯২৩ এর মাধ্যমে জেএমবি'র শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানী দেশের বিভিন্ন জায়গায় অর্থ লেনদেন করেছে। ফরিদুজ্জামান ওরফে স্বপন, সানীর পূর্ব পরিচিত হওয়ায় সানীর অনুরোধে ফরিদুজ্জামান জেএমবি'র তিনজন শূরা সদস্যের নামে ইসলামী ব্যাংক মতিঝিল শাখায় একটি যৌথ একাউন্ট খুলতে সহায়তা করে। তাছাড়া ফরিদুজ্জামান ২০০৫ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে তার ব্যক্তিগত একাউন্ট নম্বরটি সানীকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। ঐ একাউন্টে জেএমবি'র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা দেয়া হয় এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত টাকা উক্ত হিসাব নম্বরে টিটি আকারে জমা হতো। এছাড়াও আতাউর রহমান সানী বিভিন্ন সময়ে ফরিদুজ্জামানের ব্যাংক একাউন্টে প্রয়োজন মতো টাকা জমা ও উত্তোলন করতো। আতাউর রহমান সানী ২০০৫ সালের জুলাই/আগস্ট মাসের প্রথম দিকে একসাথে উক্ত একাউন্টে ১,৫০,০০০/- টাকা জমা করে এবং আগস্ট ২০০৫ মাসের প্রথম দিকে ফরিদুজ্জামান ওরফে স্বপনের মাধ্যমে তিন দফায় (প্রথম দফায় ৪০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৪০ হাজার টাকা ও তৃতীয় দফায় ৮০ হাজার টাকা) সর্বমোট ১,৬০,০০০/- টাকা ইসলামী ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম-এ অবস্থিত জেএমবি'র সুধী আরশাদুল আলমের একাউন্টে টিটি করে পাঠায়।

এদিকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মতিঝিল শাখায় মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ডিএ৩২০৫ (নতুন- ০২০৩২০৫৬)-এ শায়খ আবদুর রহমানের একটি ব্যক্তিগত একাউন্ট রয়েছে। একাউন্টটি তিনি ১৯৮৪ সালের ২৮ আগস্ট তারিখে খুলেছিলেন। এছাড়াও আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক মতিঝিল শাখায় রয়েছে তাদের একটি যৌথ ব্যাংক একাউন্ট।

পাশাপাশি আতাউর রহমান সানী, মোহাম্মদ সালেহীন ও রাকিব হাসানের নামে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক মতিঝিল শাখায় একটি যৌথ একাউন্ট রয়েছে। এই একাউন্টটি সংগঠনের আর্থিক লেনদেন এবং হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। উক্ত ব্যাংক একাউন্টের হিসাব নম্বর ৩৪০২৩৭৯৫।

শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও জেএমবি বেশ কয়েকটি ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করে আসছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিল বগুড়ায়। মো. আদনান সানী এবং মো. ফায়াদ হোসেনের নামে যৌথ একাউন্ট- সোনালী ব্যাংক, কলেজ রোড শাখা, বগুড়াতে

www.pathagar.com

ছিল একটি যৌথ একাউন্ট। এর হিসাব নং ৭০৮৫। উক্ত একাউন্টে সর্বমোট ৫,৮১,৩০৯/- টাকা লেনদেন হয়। জব্দের পূর্বে উক্ত একাউন্টে ৫,৩০৯/- টাকা জমা ছিল। রংপুর সদর থানার মামলা নং-৪৭(১১) ০৫, ধারা-বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪/৬ মোতাবেক রংপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৭-১১-২০০৫ তারিখে উক্ত একাউন্টের সমস্ত কাগজপত্র জব্দ করেছেন বলে জানা গেছে।

আশিকুর রহমান, মো. মাহমুদ হাসান এবং জাহেদ হাসানের নামে একটি যৌথ একাউন্ট ছিল বগুড়ার কাঁঠালতলাস্থ সোনালী ব্যাংক বগুড়া বাজার শাখায়। এর হিসাব নং ৭৩২৬। উক্ত একাউন্টে সর্বমোট ১১ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। জব্দের পূর্বে উক্ত একাউন্টে ২,৪৩৪/- টাকা জমা ছিল। রংপুর সদর থানার মামলা নং-৪৭(১১)০৫ ধারা-বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪/৬ মোতাবেক রংপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৭-১১-২০০৫ তারিখে উক্ত একাউন্টের সমস্ত কাগজপত্র জব্দ করেছেন।

মো. আব্দুল আউয়াল, মো. খালেক এবং সিদ্দিকুল ইসলামের নামে ইসলামী ব্যাংক, বগুড়া শাখায় জেএমবি'র আরো একটি যৌথ একাউন্ট (হিসাব নং ১৮৫১৫) ছিল। উক্ত একাউন্টে সর্বমোট ১,৬৬,৩০৪/- টাকা লেনদেন হয়। সর্বশেষ উক্ত একাউন্টে ৫০৪/- টাকা জমা ছিল।

এদিকে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, বগুড়া শাখায় মো. আব্দুল আউয়াল, সিদ্দিকুল ইসলাম এবং মো. শফিউল আলমের নামে আরো একটি যৌথ একাউন্টের (হিসাব নং ৩৪০১৮৬৯৬) সন্ধান পাওয়া গেছে। উক্ত একাউন্টে সর্বমোট ১০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। সর্বশেষ উক্ত একাউন্টে ১,০৬৯/- টাকা জমা ছিল।

মো. মামুনুর রসিদ এবং রবিউল আউয়ালের নামে একটি যৌথ একাউন্ট সোনালী ব্যাংক, বগুড়া বাজার শাখায় পরিচালিত হতো। এর হিসাব নং ৭৩১৯। উক্ত একাউন্টে সর্বমোট ৩,২৩,৪০০/- টাকা লেনদেন হয়। সর্বশেষ উক্ত একাউন্টে ১,৬১৩/- টাকা জমা ছিল।

সঞ্চয়পত্র : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ০৮ বছর মেয়াদী মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড নং এমএসবি-৫৩২৫, ক্রেতা-আয়েশা বেগম, টাকা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সন-২০০৫।

আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট রিসিপ্ট নং ০০৫৯৯৩/৩৭৮৪ তারিখ ২৭এপ্রিল ২০০৪। টাকা ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার মাত্র) ক্রেতা আমিরা আক্তার।

জনতা ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, বগুড়া। পাঁচ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র। ক্রেতা (১) মোছাঃ শামীমা, স্বামী-মোঃ মানিক, (২) মোছাঃ শিল্পী, স্বামী-মোঃ ফাহাদ হোসেন। টাকা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ মাত্র), সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সন-২০০৫।

ইসলামী ব্যাংক, থানা রোড, বগুড়া। ৫ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র। ক্রেতা (১) মোছাঃ আফিফা, স্বামী-মোঃ আদিল, (২) মোছাঃ রহিমা, স্বামী-মাহবুব হোসেন। টাকা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ মাত্র)। সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সন-২০০৪।

জেএমবি সদস্যগণ যেহেতু কঠোরভাবে ইসলামী শরীয়াহ অনুসরণ করতো সে কারণেই তারা তাদের সকল লেনদেন বিভিন্ন ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংকের সাথে করতো। কাজেই জেএমবি'র সকল ব্যাংক একাউন্ট ও আর্থিক লেনদেন শুধু ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে হওয়ায় যদি কেউ মনে করে থাকেন যে জঙ্গীবাদ প্রসারের অর্থায়নে এই ব্যাংকগুলোর কোনো উৎসাহ আছে তাহলে (বর্তমান তথ্যানুযায়ী) তা বড় রকমের ভুল হবে।

www.pathagar.com

অবশ্য শুধু উল্লিখিত টাকায় জেএমবি'র মতো একটি বিশাল সংগঠন এতদিন ধরে চলেছে, কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করেছে তা ভাবলে কিছুটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। সে কারণেই আমার বিশ্বাস জেএমবি'র সাথে আরো অনেক অজানা অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী। কেননা, ব্যবসায়িকভাবে শায়খ রহমান নিজেই বিপুল অর্থের মালিক। এছাড়াও দেশে ও দেশের বাইরে থেকে কোনোভাবে সরাসরি কোনো অর্থ ও রসদ তাদের হাতে এসে থাকতে পারে বলে জোরালোভাবে সন্দেহ হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন নস্যাতে কীভাবে ইসলামের শত্রুরা অর্থ লগ্নী করে থাকে তার একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। হাসানুল কাদির লিখিত 'কাদিয়ানী বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানীরাই' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয় : "বিভিন্ন ব্যানারে কিছুদিন পরপর কাদিয়ানী বা আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয় আহমদিয়াদের দেয়া অর্থ এবং দিকনির্দেশনায়। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ভিডিও চিত্র পশ্চিমি দেশে দেখিয়ে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি অন্যান্য সাহায্য পাওয়া এর লক্ষ্যগুলোর অন্যতম। মুসলমানদের উগ্র এবং সন্ত্রাসী হিসেবে তারা চিহ্নিত করতে চায়। সে সঙ্গে বাংলাদেশকে জঙ্গী কবলিত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করার টার্গেট নিয়েই আহমদিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে।

আহমদিয়া বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের কিছু নেতার কার্যক্রম নিবিড়ভাবে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাদের সাথে আলোচনা করে এসব বিষয় জানা গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কেউ আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে তারাই তাকে খুঁজে বের করে। এ ক্ষেত্রে কখনো তাদের হয়ে কাজ করে ইনডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। কখনো কখনো দূরবর্তী মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। জানা গেছে, আন্দোলনকারী কাদিয়ানী বিরোধী সংগঠনগুলোর অর্থের যোগান নিয়ে এর নেতারা কখনোই দুশ্চিন্তা করে না। খতমে নবুয়ত কমিটির সভাপতি আলহাজ শামসুল হককে তার সংগঠনের পাশাপাশি কাদিয়ানী বিরোধী অন্য কার্যক্রমের অর্থের যোগান নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, কোনো রকম একটি ব্যানার নিয়ে এ দাবীতে আন্দোলন শুরু করলেই হলো, টাকা-পয়সা দেয়ার বহু লোক আছে। দেশী-বিদেশী অনেক ব্যক্তি, সংস্থা টাকা নিয়ে আসে। এজন্য কারো কাছে যেতে হয় না...

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের সভাপতি ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক যায়যায়দিনকে বলেন, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের নামে জন্ম নেয়া সংগঠনগুলোকে আক্রান্তরা নিজেরাই অর্থের যোগান দেয়- এমন রিপোর্ট বহুবার আমার কাছে এসেছে। ভাড়াটে সংগঠন দিয়ে উগ্র উচ্ছৃঙ্খল কর্মসূচি পালন করিয়ে কাদিয়ানী-রা এসব ভিডিও চিত্র পশ্চিমি দেশগুলোতে প্রচার করে। এভাবে তারা বিদেশীদের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে নানা সুযোগ সুবিধা পায়।...

খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আবদুল খালিক যায়যায়দিনকে বলেন, শুনেছি কাদিয়ানীরাই বিভিন্ন সময় টাকা-পয়সা দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে ব্যবহার করে উগ্র কর্মসূচি পালন করায়। এ ধরনের উগ্র কর্মসূচির চিত্র পশ্চিমি দেশগুলোর অর্থদাতাদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আনে কাদিয়ানীরা।...

www.pathagar.com

গত ২০০৬ জুন মাসের শেষ দিকে খতমে নবুয়ত আন্দোলনের আমীর মুফতি নুর হোসাইন নুরানীর উপর প্রকাশিত একটি পোস্টার রাজধানীর বিভিন্ন দেয়ালে ও বাসের পেছনে দেখা গেছে। এ ধর্মীয় নেতার ছবিসহ প্রচারিত ঐ পোস্টারে লেখা ছিল- তিনি কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন করার জন্য ইন্ডিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কাছ থেকে ৫০ হাজার ডলার নিয়েছেন। এ পোস্টারে ডলার নেয়ার প্রমাণ হিসেবে তার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রও ছাপানো হয়েছে।"

এই রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশে জেএমবি তথা জঙ্গীবাদের উত্থান, এর অন্তর্নিহিত কারণ, পৃষ্ঠপোষক, আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তাকারীদের সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র উঠে এসেছে। দেশপ্রেমিক মন নিয়ে শুধু এই একটি রিপোর্ট পর্যালোচনা করলেই জেএমবিকে চিনতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়।

জেএমবি'র অপারেশনাল কার্যক্রম

১৯৯৮ সালে জেএমবি তাদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড শুরু করলেও ২০০১ সালের শেষের দিকে সংগঠনের ভাড়াকৃত ঢাকার বাসাবোর বাসায় অনুষ্ঠিত শূরা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এর নামকরণ 'জিএমবি' করা হয়। তখন থেকেই জেএমবি দাওয়াতের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ, বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদানস্বরূপ অর্থ, ইয়ানত সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর প্রচেষ্টা চালাতো। পরবর্তীতে বিভিন্ন অনৈসলামিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন এনজিও যেমন : গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক অফিস প্রভৃতি স্থানে হামলার মাধ্যমে সর্বপ্রথম তাদের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

১৭ আগস্ট ২০০৫ এর পূর্বে জেএমবি সারা দেশে যেসব অপারেশন পরিচালনা করে নিম্নে সেগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো :

পার্বতীপুরে পেট্রোল বোমাসহ গ্রেফতার : ২০০০ সালের প্রথম দিকে জেএমবি'র এহসার সদস্য শাহাবুলের নেতৃত্বে ১০/১২ জন জেএমবি কর্মী পার্বতীপুর নামে দিনাজপুরের একটি গ্রামে পেট্রোল বোমা ছোড়ার প্রশিক্ষণ নিতে গেলে স্থানীয় জনগণ ডাকাত সন্দেহে ১১টি পেট্রোল বোমাসহ তাদের গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রায় ১ বছর জেলে থাকার পর মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ায় তারা ছাড়া পায়।

রাঙ্গামাটিতে বোমা বিস্ফোরণ : ২০০১ সালের জুন/জুলাই মাসে রাঙ্গামাটির একটি হোস্টেলে অসাবধানতাবশত বোমা বিস্ফোরণে জেএমবি'র শূরা সদস্য নাসরুল্লাহ নিহত এবং অপর এহসার সদস্য শামীম হোসেন গালিব আহত হয়। ঘটনার পর পুলিশ তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করে। ৪/৫ মাস পর গালিব জামিনে মুক্তি পায়।

বাগেরহাটের ইউপি চেয়ারম্যান তারাপদ পোদ্দারকে হত্যার চেষ্টা : ২০০১ সালের শেষের দিকে রাত আনুমানিক ১ ঘটিকার সময় বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাটের ইউপি চেয়ারম্যান এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের জেলা পর্যায়ের নেতা তারাপদ পোদ্দারকে হত্যার উদ্দেশ্যে জেএমবি'র আমীর শায়খ আবদুর রহমান, শূরা সদস্য সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই ও হাফেজ মাহমুদ, জেলা দায়িত্বশীল লিটনসহ এহসার সদস্য এখতিয়ার শরীফ, আবদুল মতিন প্রমুখ তারাপদ পোদ্দারের বাসায় হামলা চালায়। উক্ত ঘটনায় ছুরির আঘাতে তারাপদ পোদ্দার আহত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন বাংলাভাইসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। গ্রেফতারকৃতরা প্রায় সাড়ে তিন মাস জেলে থাকার পর ২০০১ সালের ২৮ অথবা ২৯

www.pathagar.com

নভেম্বরে জামিনে মুক্তি পায়।

সাতক্ষীরার সিনেমা হল ও সার্কাস প্যান্ডেলে বোমা বিস্ফোরণ : ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জেএমবি'র এহসার সদস্য জাহিদুল ইসলাম সুমন ওরফে মিজান এবং সাতক্ষীরা জেলা দায়িত্বশীল সাইফুল্লাহ একই সময়ে সাতক্ষীরা জেলা শহরে আয়োজিত মেলার সার্কাস প্যান্ডেলে এবং সিনেমা হলে টাইম বোমার সাহায্যে হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ৩/৪ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

দিনাজপুরের ছোট গুড়গুলাস্থ জেএমবি মেসে দুর্ঘটনামূলক বিস্ফোরণ : ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুর জেলার ছোট গুড়গুলাস্থ জেএমবি'র ভাড়াকৃত একটি মেসে বোমা তৈরী করার সময় অসাবধানতাবশত বোমা বিস্ফোরিত হলে বাদল নামক এক জেএমবি কর্মী আহত ও পরবর্তীতে মারা যায়। উক্ত ঘটনায় পুলিশ জেএমবি শূরা সদস্য খালেদ সাইফুল্লাহকে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে। প্রায় ৩ বছর জেলে থাকার পর ২০০৫-এর জুলাই মাসে সে জামিনে ছাড়া পায়।

ময়মনসিংহে সিনেমা হলে বোমা হামলা : ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬/৭টার মধ্যে সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের অজন্তা, ছায়াবাণী অলকা ও চিত্রা সিনেমা হলে বোমা হামলা চালানো হয়। উক্ত হামলায় ১৯ জন নিহত ও ১০০ জন আহত হয়। ইতোপূর্বে ইনকিলাবে প্রকাশিত কয়েকটি লেখায় ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িতদের ব্যাপারে যে তথ্য দিয়েছিলাম তার সাথে এই তথ্যের একটা কৌণিক বিরোধ রয়েছে। ভূমিকাতেই বলেছি, সাংবাদিক হিসেবে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধগুলো রচনা করা হয়েছিল। সুলতান কমিশনের রিপোর্টে উক্ত বোমা হামলার সাথে একটি প্রতিবেশী দেশের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্য এমন কয়েকটি সূত্র থেকে আমার কাছে কিছু তথ্য এসেছে যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য এবং এখন পর্যন্ত আমি তথ্যটি অস্বীকার করতে পারছি না। কাজেই দুটো তথ্য মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা এ রকম যে, ময়মনসিংহের সিনেমা হলগুলোতে বোমা হামলার সাথে জেএমবি জড়িত থাকলেও তাদের সাথে হামলার ব্যাপারে ও হামলা চলাকালীন সময়ে একটি বিদেশী শক্তির সহায়তা ও যোগাযোগ ছিল। এ গ্রুপটি ময়মনসিংহে বোমা হামলার সময় বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। বোমা হামলার পরপরই তারা দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

সাতক্ষীরায় অস্ত্রসহ জেএমবি সদস্য গ্রেফতার : ২০০২ সালের শেষের দিকে জেএমবি'র এহসার সদস্য মিজান ও লোকমান মোটরসাইকেলযোগে সাতক্ষীরা সদর থেকে ঝিগলগাছা যাওয়ার সময় পুলিশ চেকপোস্টে তল্লাশিকালে ২টি ওয়ান শুটার এবং কিছু বোমা তৈরীর সরঞ্জামসহ গ্রেফতার হয়। প্রায় দুই বছর জেলে থাকার পর ২০০৪ সালের শেষের দিকে তারা জামিনে মুক্তি পায়।

এনজিও ও ব্যাংক ডাকাতি : ২০০২ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাক অফিস ও গ্রামীণ ব্যাংকে জেএমবি বেশ কিছু অপারেশন পরিচালনা করে। গোপনীয়তার কারণে জেএমবি সদস্যগণ গ্রামীণ ব্যাংককে 'বড় আপা' এবং ব্র্যাক অফিসকে 'ছোট আপা' বলে ডাকতো। অপারেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

২০০২ সালের নভেম্বর মাসে জেএমবি সদস্যরা বগুড়া জেলার গাবতলী থানাস্থ ব্র্যাকের কৈগাড়ী শাখা অফিস থেকে ১টি কম্পিউটার, ৭টি সিলিং ফ্যান এবং অফিসের আসবাবপত্র ডাকাতি করে। ঐ একই মাসে জেএমবি সদস্যরা নাটোর জেলায় গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি করে ১টি রঙিন টেলিভিশন এবং আনুমানিক ২ হাজার টাকা ডাকাতি

www.pathagar.com

করে।
২০০৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর জেএমবি সদস্যরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১টি মোটরসাইকেল, ৫টি বাইসাইকেল, আনুমানিক ১০ হাজার টাকা, ৫টি হাতঘড়ি, ১টি স্বর্ণের চেইন এবং অন্যান্য সামগ্রী ডাকাতি করে।
পরের বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর জেএমবি সদস্যরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ব্র্যাক অফিস থেকে ৪টি মোটরসাইকেল এবং ৫টি বাইসাইকেল ডাকাতি করে।
২০০৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জেএমবি সদস্যরা রাজশাহী জেলার বাগমারা থানাধীন ব্র্যাক অফিস থেকে ৩টি মোটরসাইকেল, ১টি স্বর্ণের চেইন, ২টি স্বর্ণের বালা, ১টি স্বর্ণের আংটিসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ডাকাতি করে।
পরদিন অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর জেএমবি সদস্যরা বগুড়া জেলার গাবতলী থানা সংলগ্ন ব্র্যাক অফিস থেকে ১টি মোটরসাইকেল ডাকাতি করে।
২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে জেএমবি সদস্যরা দিনাজপুর জেলার ব্র্যাক অফিস থেকে ৩টি মোটরসাইকেল, ১টি মোবাইল, ৩টি ঘড়ি, ৪৩৯৪ টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ডাকাতি করে।
২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে জেএমবি সদস্যরা ঠাকুরগাঁও জেলার একটি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১টি মোটরসাইকেল, ১টি ফ্রিজ, ১টি কম্পিউটার, ২টি রঙিন টেলিভিশন, ৬টি বাইসাইকেল, ১টি জেনারেটর, ১টি মোবাইল ফোন, ১১০০০ টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ডাকাতি করে।
একই মাসের ৭ তারিখে জেএমবি সদস্যরা সিরাজগঞ্জ জেলার একটি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২টি ফটোকপি মেশিন, ৪টি কম্পিউটার এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ডাকাতি করে। পরদিন অর্থাৎ ৮ জানুয়ারী ২০০৫ তারিখে জেএমবি সদস্যরা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি ব্র্যাক অফিস এবং আবাসিক এলাকা থেকে ২টি মোটরসাইকেল, ৪টি বাইসাইকেল, ২টি স্বর্ণের বালা, ১টি চেইন, ২টি মোবাইল ফোন, ৬০০০ টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ডাকাতি করে।
জেএমবি সদস্যদের কাছে তথ্য ছিল বরুহা টাঙ্গাইলে আনন্দ নামে জার্মানীর আর্থিক সাহায্যপুষ্ট একটি এনজিও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সঠিক তথ্য যাচাইয়ের জন্য শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানী ঠাকুরগাঁওয়ের শহীদ (২৫) নামে এক জেএমবি সদস্যকে প্রেরণ করে। শহীদ এনজিওটির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানালে সানীর নেতৃত্বে জেএমবির সদস্যগণ টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বশীল বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাটের বাসিন্দা আহমেদের টাঙ্গাইলের পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ভাড়াকৃত বাসায় সমবেত হয়। জেএমবি কর্মী বগুড়ার মারুফ (২৬), দেলদুয়ার টাঙ্গাইলের আলী (২৬), মির্জাপুর টাঙ্গাইলের আকরাম (২২), ঠাকুরগাঁওয়ের শহীদ (২৫), শূরা সদস্য সালাউদ্দিন, জেলা দায়িত্বশীল আহমেদ, স্থানীয় কর্মী সুমন, দিপনসহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন টাঙ্গাইলের বরুহা এলাকায় আনন্দ নামের এনজিওতে ৬ মে ২০০৪ রাত ১টার দিকে হকিস্টিক, দা, কুড়াল, শাবল নিয়ে আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে হামলা করে। প্রহরীকে বেঁধে রেখে এ সময় তারা ঐ অফিস থেকে ১টি মোটরসাইকেল, ১টি কম্পিউটার, ১টি বাইসাইকেল ডাকাতি করে। মোটরসাইকেলটি তারা বিক্রি করে দেয় এবং কম্পিউটারটি এহসার শহীদের মাধ্যমে সানীর বাসাবোর বাসায় আনা হয়। পরে কম্পিউটারটি পাটোয়ারী গলিতে আকরামের বাসায় জেএমবি'র পত্রিকা আল মাগাজি প্রকাশের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হয়।

www.pathagar.com

২০০৪ সালের মে মাসের শেষের দিকে জেএমবি শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে ২০ জন জেএমবি সদস্য দুইটি ওয়ান শুটার গান, চাকু, ছোরা, দা ইত্যাদি নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ব্র্যাক অফিসে হামলা করে। নারায়ণগঞ্জের গাউছিয়ায় জেলার দায়িত্বশীল শামীমের সংগঠনের ভাড়া করা বাসায় বসে এ হামলার পরিকল্পনা করা হয়। হামলার দিন রাত ১০টার দিকে গাউছিয়া ট্রাক স্ট্যান্ড থেকে একটি ট্রাক ভাড়া করে সানী, শামীম এনায়েতের নেতৃত্বে গঠিত দলটি রূপগঞ্জ থানার ভুলতায় ব্র্যাক অফিসে হামলা করে। প্রহরীসহ ১০/১২ জন ব্র্যাককর্মীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এ সময় তারা ঐ অফিসের কাজে ব্যবহৃত ১টি ফ্রিজ, ৬টি মোটরসাইকেল, ৫টি বাইসাইকেলসহ নগদ ৩৫০০ টাকা ডাকাতি করে। ডাকাতির পর সানী এহসার সদস্য শামীমের বাসা হয়ে ঢাকার বাসায় ফিরে আসে। আর তার নির্দেশে এহসার সদস্য গালিব, কাশেম, এনায়েত ও মাহমুদসহ কয়েকজন গায়েরে এহসার সদস্য মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল চালিয়ে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় লুকিয়ে রাখে। শামীম, মিনহাজ, খাত্তাবসহ আরো কয়েকজন ট্রাকযোগে ডাকাতিকৃত কম্পিউটার ও ফ্রিজ নিয়ে বন্দর থানার ফরাজিকান্দায় সংগঠনের ভাড়া করা বাসায় যাওয়ার পথে রূপগঞ্জ থানার গাউছিয়ার তিন কিলোমিটার পশ্চিমে রাস্তার উপর টহল পুলিশ ট্রাকটিকে চ্যালেঞ্জ করলে পুলিশের সাথে জেএমবি কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় তারা পুলিশের কাছ থেকে দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেয় এবং ডাকাতি করা মালামাল কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রিজের উপর থেকে পানিতে ফেলে দেয় ও ট্রাকটি ছেড়ে দেয়। ছিনিয়ে নেয়া রাইফেল দুটি শামীম নিজ হেফাজতে রাখে। এসব লুণ্ঠিত মালামাল সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী আনফাল বা গনিমতের মাল হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে তার ৮০% সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে এবং বাকি ২০% কেন্দ্রে জমা দেয়া হতো।

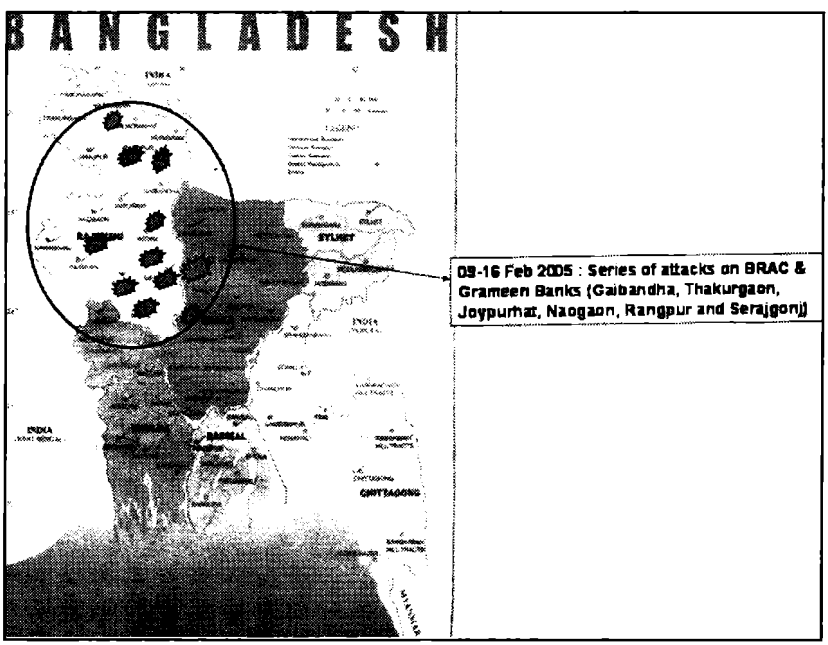

www.pathagar.com

জয়পুরহাটের চিশতিয়া মাজারের ৫ জন খাদেম হত্যা : ২০০৩ সালের ২০ জানুয়ারী তারিখে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে শহীদ, শহীদুল্লাহ, মামুন, হাবিলসহ এলাকার কিছু লোক রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে জয়পুরহাটের কালাই থানাস্থ বেগুন গ্রামের চিশতিয়া মাজারের আস্তানায় হামলা চালিয়ে ৫ জন খাদেমকে হত্যা এবং মাজার হতে ফ্যান, কার্পেট, ঘড়ি, এমপ্লিফায়ার ও সিন্দুক ভেঙে নগদ ২০ হাজার টাকা লুট করে।

সফিপুর, টাঙ্গাইলের ফাইল্যা পাগলার মাজারে বোমা বিস্ফোরণ : ২০০৩ সালের প্রথম দিকে জেএমবি'র শূরা কমিটির সদস্য আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে শাকিল ওরফে মোল্লা ওমরের বানিয়ে দেয়া টাইম বোমার সাহায্যে এহসার সদস্য শহীদ (ঠাকুরগাঁও), মারুফ (বগুড়া)সহ আরো ৪/৫ জেএমবি সদস্য টাঙ্গাইলের সখিপুরস্থ ফাইল্যা পাগলার মাজারে হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ৩/৪ জন নিহত ও আরো অনেকে আহত হয়।

জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ এবং অস্ত্র লুট : ২০০৩ সালের ১৪ আগস্ট জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল থানার মহেশপুর গ্রামে জনৈক জেএমবি কর্মী মনতেজারের বাড়িতে জেএমবি'র জেলা ও থানা দায়িত্বশীলসহ প্রায় ৫০/৬০ জন সদস্য তামিল (প্রশিক্ষণ)-এর জন্য সমবেত হয়। পুলিশ সেখানে রেইড দিলে তাদের সাথে জেএমবি কর্মীদের সংঘর্ষ হয়- এতে পুলিশের ২টি শটগান ও ১টি ওয়ারলেস সেট জেএমবি কর্মীরা ছিনিয়ে নেয়। ঐ রাতেই পুলিশ জেএমবি'র শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানী, আব্দুল আউয়াল ও সালাইউদ্দিনসহ ২১ জনকে গ্রেফতার করে। প্রায় ৫ মাস জেলে থাকার পর ২০০৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে তারা পর্যায়ক্রমে ছাড়া পায়। শটগান ও ওয়ারলেস সেট সালাহউদ্দিন ব্যবহার করতো।

ড. হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা ও হত্যার চেষ্টা : ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ জেএমবি'র শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে এহসার সদস্য মিনহাজ, শামীম, শহীদ, মনির ও শফিউল্লাহ সাদ একুশের বই মেলা থেকে বের হয়ে টিএসসি'র দিকে আসার পথে হুমায়ুন আজাদের উপর চাপাতি ও ছুরি দ্বারা হামলা চালায়। উক্ত হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। মূলত ড. আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটি প্রকাশের পর এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হলে বিষয়টি সানীর নজরে আসে। সানী সে সময় সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে থাকতো। নিউমার্কেট থেকে সে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটি কিনে। এর মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষী চরম কথাবার্তা পড়ে সানী ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বিষয়টি নিয়ে ভাই আবদুর রহমানের সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে আবদুর রহমান তাকে বইটি পাঠাতে বলেন। বইটি পড়ে আবদুর রহমান ড. আজাদকে মুরতাদ ঘোষণা করে তার উপর আঘাত হানার নির্দেশ দেন। তবে জেএমবি ড. আজাদকে প্রাণে না মেরে এমনভাবে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে সে চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়ে বিদেশের মাটিতে মরে অথবা প্রাণে বেঁচে থাকলে যেন এমনভাবে থাকে যা দেখে ভবিষ্যতে কেউ যেন ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস না করে। এ সিদ্ধান্তটি আবদুর রহমানের, না সানীর নিজের তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এরপর সানীর নেতৃত্বে একটি দল হুমায়ুন আজাদের উপর রেকী শুরু করে। এ সময় তারা দেখতে পায় ড. আজাদ প্রতিদিন বই মেলায় গিয়ে আগামী প্রকাশনীতে বসেন এবং ঠিক মাগরিবের আজান দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে বই মেলা থেকে বেরিয়ে আসেন। হুমায়ুন আজাদ যখন বই মেলার গেট থেকে বেরিয়ে আসতেন ঠিক তখনই মাগরিবের আজান শুরু হতো। এ সময় তিনি রাস্তা পার হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সামনে রেখে পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রস্রাব করতেন। প্রত্যেক দিন একই বিষয় দেখে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এরপর ড. আজাদ পায়ে হেঁটে

www.pathagar.com

টিএসসিতে এলে বেশ কিছু ছাত্রী তাকে ঘিরে ধরে এবং তিনি তাদের নিয়ে টিএসসি'র ভেতরে গিয়ে একটি কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে ঘন্টা খানেক সেখানে অতিবাহিত করার পর বেরিয়ে আসেন, অত:পর বাসায় ফেরেন। মূলত এদের কারণেই কয়েকদিন সিদ্ধান্ত নিয়েও সানী ড. আজাদের উপর হামলা করতে পারেনি। অবশেষে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে তারা সফল হয়। কুরবানী দেয়ার জন্য সানী ঢাকা থেকে একটি বড় চাপাতি কিনেছিল। সেটি দিয়ে সানী ড. আজাদের উপর আঘাত করে। এ সময় তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক থাকলেও সানী কোনো গুলি করেনি। শুধু পালানোর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমার শব্দে লোকজন পালাতে শুরু করলে সানী তার কাছে থাকা ব্যাগের মধ্যে চাপাতি লুকিয়ে বই মেলার মধ্যে প্রবেশ করে। সারা বই মেলায় তখন চরম অস্থিরতা। কারো দিকে খেয়াল করার অবকাশ তখন নেই। এই ফাঁকে সানী বাংলা একাডেমীর পুকুরে নেমে চাপাতিসহ ব্যাগটি পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে জনারণ্যে হারিয়ে যায়।

টাঙ্গাইলে ভারতীয় গোয়েন্দা সন্দেহে একজনকে হত্যা : ২০০৪ সালের মার্চ মাসে জেএমবি'র শূরা সদস্য হাফেজ মাহমুদের নেতৃত্বে মিনহাজ, শহীদ, শামীমসহ আরো ৩/৪ জন জেএমবি কর্মী 'নারী তুমি কার' এর লেখক মনির খানকে ভারতীয় গোয়েন্দা সন্দেহে টাংগাইলে দেলদুয়ার বাজার এলাকায় হামলা চালায়। মনির খানকে তারা প্রথমে জিআই পাইপ দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করে এবং পরে আতাউর রহমান সানী ছুরি দিয়ে তাকে জবাই করে হত্যা করে।

পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির শহীদকে হত্যা : ২০০৪ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে বাগমারায় বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে অপারেশন চলাকালে একদিন সন্ধ্যায় নওগাঁর রানীনগর থানা থেকে এলাকাবাসী শহীদ (৩০) নামে এক সর্বহারাকে হামিরকুৎসা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে জানায়, নওগাঁ শহরে সর্বহারাদের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বসবাস করে। সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই, হাফেজ মাহমুদ, আব্দুল আউয়াল এবং ৫/৬ জন জেএমবি সদস্য শহীদকে নিয়ে মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসযোগে রাত ১১টার দিকে সর্বহারা নেতাদের ধরার জন্য নওগাঁ যায়। কিন্তু শহীদ নেতাদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে গড়িমসি করে। শহীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তারা শহীদকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়। তারা শহীদকে বগুড়া-নওগাঁ রোডের নিকটবর্তী আদমদীঘি থানার শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। সকাল আনুমানিক ৫টার দিকে হাফেজ মাহমুদ তাকে জবাই করে। সিদ্দিকুল ইসলাম তাকে এ কাজে সহায়তা করে।

গুড়বাড়িয়া (আত্রাই) ক্যাম্পে তিনজনকে হত্যা : ২০০৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এলাকাবাসী দুই হিন্দু সর্বহারা সদস্যকে ধরে গুড়বাড়িয়া (আত্রাই) ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আব্দুল আউয়াল শায়খকে সংবাদ দেয়। ২/৩ দিন পর শায়খ হামিরকুৎসা ক্যাম্প থেকে গুড়বাড়িয়া ক্যাম্পে আসে। শায়খ এই দুইজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাম্পের লোকজন রাত ১০-১১টার দিকে একজনকে আত্রাই নদীর তীরে নিয়ে যায়। সেখানে শায়খ তাকে জবাই করে। পরদিন সকালে তাহেরপুর এলাকাবাসী এক লোককে ধরে গুড়বাড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানতে পারে এই লোক 'র' এর এজেন্ট। রাতে আত্রাই নদীর তীরে নিয়ে শায়খ আবদুর রহমান নিজেই তাকে জবাই করে। পরদিন রাতে দ্বিতীয় হিন্দু সর্বহারাকে আব্দুল আউয়াল একই আত্রাই নদীর তীরে নিয়ে জবাই করে এবং তিনটি লাশই মাটিতে পুঁতে ফেলে।

ধর্মান্তরিত ২ খ্রীস্টানকে হত্যা : ২০০১ এর শেষের দিকে জেএমবি'র শূরা সদস্য

www.pathagar.com

সালাহউদ্দিনের নেতৃত্বে আমীর, শিপলুসহ ৬/৭ জন জেএমবি কর্মী জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানার দিকপাইত ইউনিয়নের হিন্দু থেকে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত একজন খ্রীস্টান ব্যক্তিকে জবাই করে হত্যা করে। লোকটির নাম জানা যায়নি। এদিকে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে জেএমবি'র শূরা সদস্য সালাহউদ্দিনের নেতৃত্বে হাফেজ মাহমুদ, শহীদ ও বেলাল জামালপুর সদর থানার হাজীপুর বাজারে মুসলমান থেকে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত আব্দুল গনি গোমেজকে হত্যা করে। তারা গোমেজকে হাজীপুর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে প্রথমে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করা হয় এবং পরে শহীদ ছুরি দিয়ে জবাই করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে।

ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং অশ্লীলতার কারণে বিভিন্ন যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা বিস্ফোরণ

সুন্দরগঞ্জ যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা : জেএমবি'র শূরা সদস্য এবং রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বশীল আব্দুল আউয়ালের নির্দেশে ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা করা হয়।

জেএমবি'র এহসার সদস্য আব্দুল হামিদ একজন সাথীকে নিয়ে বগুড়া জেলার গাবতলী থানায় যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা করে।

জেএমবি'র এহসার সদস্য আব্বাস শেরপুর থানা এলাকার একটি যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা করে।

২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেএমবি কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানায় যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা চালানো হয়।

জেএমবি'র এহসার সদস্য তুহিন বগুড়া জেলার ধুনট থানার একটি যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা করে।

তাদের এহসার সদস্য আব্দুল হামিদ সারিয়াকান্দি থানা এরাকায় একটি যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা চালায়।

জেএমবি'র এহসার সদস্য আবদুর রহমান, ইব্রাহীম ও এলাকার কিছু লোক ২৪ এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে রাজশাহী জেলার বাগমারা থানায় যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ১ জন নিহত এবং অনেকেই আহত হয়।

২০০৪ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে জেএমবি'র শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের যাত্রা প্যান্ডেলে বোমা হামলা চালানো হয়। সংগঠনের সদস্য আলী সানীকে টেলিফোনে জানায়, দেলদুয়ারে যাত্রানুষ্ঠানে চরম নগ্নতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এখবর পেয়ে সানী ঢাকা থেকে বোমা তৈরী মসলা নিয়ে বাগেরহাটের বাসিন্দা ও টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বশীল আহমেদের বাসায় ওঠে। সেখানে দুই দিন অবস্থান করে এহসার শহীদের সহযোগিতায় ৪/৫টি বোমা তৈরী করে সানী। পরের দিন সানী, শহীদ (দিনাজপুর), আহমেদ ও আলী যাত্রানুষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং অশ্লীল নাচ শুরু হলে যাত্রা শিল্পীদের থাকার স্থান, জেনারেটরের উপর ও মঞ্চের আশপাশে তারা বোমা নিক্ষেপ করে। এ হামলায় ২/৩ জন সামান্য আহত হয়।

জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ মাসুদ-এর উপর হামলার পরিকল্পনা : ২০০৪ সালের শেষের দিকে জেএমবি'র শূরা সদস্য আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ মাসুদের উপর হামলার পরিকল্পনা করা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে কিছু দিন রেকিও করেছিল তারা। কিন্তু সুবিধামত জায়গায় না পাওয়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা যায়, জনকণ্ঠের সম্পাদক সাহেব সবসময় গাড়িতে চলাফেরা করায় জেএমবি'র বিদ্যমান শক্তি নিয়ে অপারেশন চালাতে সক্ষম হয়নি।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইউনুস হত্যা : ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক ড. ইউনুস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বের হলে জেএমবি'র রাজশাহী জোন কমান্ডার আবুল কালাম ওরফে সফিউল্লাহ ওরফে তারেক এবং এহসার সদস্য যায়েদ (বাগমারা, রাজশাহী), ইব্রাহীম (বাগমারা, রাজশাহী) সহ ৫/৬ জন জেএমবি কর্মী অধ্যাপক ড. ইউনুস-এর উপর হামলা চালায়। হামলাকালে উপর্যুপরি ছুরির আঘাতে ঘটনাস্থলেই ড. ইউনুস মারা যান।

পিস কোর সদস্য ও মার্কিন নাগরিকদের হত্যা পরিকল্পনা : ২০০৫ সালের মার্চ মাসে গাজীপুর জেলা দায়িত্বশীল নিজাম ওরফে রবি ওরফে রেজা আমেরিকান পিস কোর-এর সদস্যদের কার্যক্রম সমন্ধে ঢাকা বিভাগীয় দায়িত্বশীল আতাউর রহমান সানীকে জানালে সানী এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিতে বলে। পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গাজীপুর জেলার দায়িত্বশীল এনায়েত পিস কোরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং এদের উপর হামলার পরিকল্পনা করে। কিন্তু পিস কোরের সদস্যগণ গাজীপুর থেকে চলে গেলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও জেএমবি অন্য যাদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল বলে জানা গেছে তাদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস, সাংবাদিক আবেদ খান ও শাহরিয়ার কবীর, তসলিমা নাসরিন, রাজশাহীর ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হাসান বাদশা প্রমুখ।

রাজশাহীর বাগমারায় জেএমবি'র অপারেশন

রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাগুলো সর্বহারা অধুষিত। সর্বহারাদের বিরামহীন খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, রাহাজানির ফলে এলাকায় চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ও পুলিশ-প্রশাসনও এই সর্বহারাদের নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে ছিল অসহায় ও চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছিল। ২০০৪ সালের প্রথমদিকে বাগমারা থানার সর্বহারা কর্মী মোস্তাক তার দল ছেড়ে দিয়ে জেএমবিতে যোগ দেয়। মোস্তাকের দাদা বাগমারা এলাকার বিএনপি নেতা ও বাগমারা থানার ৩নং কুৎসা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার মাধ্যমে রাজশাহী জেলা বিএনপি'র সেক্রেটারীর কাছে বাগমারা থানা এলাকায় সর্বহারা নিধনের প্রস্তাব দেয়া হয়। মার্চ মাসে তিনি বাংলাভাইয়ের প্রস্তাব রাজশাহীর তৎকালীন পুলিশ সুপারকে জানালে তিনি তাতে সায় দেন। তাদের উৎসাহে ২০০৪ সালের ২৮ মার্চ থেকে রাজশাহীর বাগমারায় সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে সর্বহারা নিধনের লক্ষ্যে এক অভিযান পরিচালিত হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এ সময় রাজশাহীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ প্রশাসন জেএমজেবি সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিল না। জেএমজেবি যে কোন জঙ্গী সংগঠন তারা তা বুঝতে পারেনি। তারা জেন জেএমবিকে এলাকার প্রতিবাদী মানুষের ঐক্য বলে জানতো। ১ এপ্রিল ২০০৪ ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত এক ব্যক্তিকে হত্যার মধ্য দিয়ে জেএমবি তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। ৯ জন মুসলিম নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে শায়খ আবদুর রহমান নিজে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে জবাই করে হত্যা করে। অভিযানকালে জেএমবি 'মুজাহিদ', 'মুসলিম রক্ষা মুজাহিদ ঐক্য পরিষদ' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' তিনটি নাম ধারণ করেছিল। জেএমবি তাদের কার্যক্রমে পুলিশের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা পেতো। অভিযানের সময় সর্বহারা সদস্যদের মাইকে সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দিয়ে ইসলামী জীবনযাপনের জন্য আহ্বান জানানো হতো। সাধারণত মোস্ট ওয়ান্টেড আসামীদের পুলিশের কাছে হস্তান্ত

www.pathagar.com

র করা হতো। অন্যান্য সর্বহারা সদস্যদের তওবা করিয়ে ইসলামী জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো। তবে পুলিশের কাছে হস্তান্তর বা ছেড়ে দেয়ার পূর্বে তাদের অনেকের উপর নির্যাতন চালানো হতো। তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো বিভিন্নভাবে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হতো। কিন্তু মুক্তাগাছায় বাংলাভাই যে এসএমসিহ গ্রেফতার হয়েছিল তা সর্বহারা নেতা বাদশা ব্যবহার করতো বলে জানা গেছে। সর্বহারার অত্যাচারে দিশেহারা এলাকাবাসীর কাছে বাংলাভাই ছিল সত্যিকার অর্থেই এক রবিনহুড। ফলে জেএমবি'র সর্বহারা নিধন কর্মসূচি এলাকাবাসীর মধ্যে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। এ অভিযানে মোট আটজন সর্বহারা ক্যাডারকে হত্যা করে জেএমবি।

সাধারণভাবে বাগমারা অপারেশনে বাংলাভাইয়ের নাম আলোচনায় এলেও এই অভিযানের সাথে জেএমবি'র সিনিয়র পর্যায়ের সকল সদস্যই অংশ নিয়েছিলেন। উক্ত অভিযানকালে তিনটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। তিনটি ক্যাম্পের দায়িত্ব বাংলাভাইসহ জেএমবি'র তিনজন শূরা সদস্য পালন করলেও বাংলাভাই ছিলেন এ অভিযানের সমন্বয়ের দায়িত্বে। তবে তার উগ্র কর্মকাণ্ডের কারণে কখনোই তাকে একক দায়িত্ব দেয়া হয়নি। জেএমবি'র আমীর শায়খ রহমানও বিভিন্ন সময় ক্যাম্পগুলোতে অবস্থান করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেও তিনি পর্দার আড়ালেই থেকে যেতে সক্ষম হন। ক্যাম্পগুলো হলো :

ক. হামিরকুৎসা ক্যাম্প : এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই। উক্ত ক্যাম্পে শূরা সদস্য সালাহউদ্দিন, সানীসহ বেশ কয়েকজন বাংলাভাইকে সহযোগিতা করেছিল। এই ক্যাম্পেই বাবু নামে একজনকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এবং আরো ২৫-৩০ জনকে পিটিয়ে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাভাই এই ক্যাম্পে সংগঠনের থানা দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২০ এপ্রিল তাহেরপুর স্কুল মাঠ থেকে মুকুল নামে এক সর্বহারা সদস্যকে বাংলাভাইয়ের নির্দেশে ধরে নিয়ে আসে আতাউর রহমান সানী। তাকে হকিস্টিক দিয়ে নির্যাতন করা হয় এবং পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

খ. গুড়বাড়ীয়া ক্যাম্প : এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল শূরা সদস্য আব্দুল আউয়াল। তার সাথে আরো ২০-২৫ জন সদস্য ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্য হলো : ১. তারেক (২৬), গ্রাম-ইটাগাছা, থানা ও জেলা-সাতক্ষীরা। ২. নজরুল (৪০), গ্রাম-গুড়বাড়ীয়া, থানা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ। (৩) কাশেম (২৫), গ্রাম-গুড়বাড়ীয়া, থানা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ। উক্ত ক্যাম্পে বিভিন্ন সময় ১০-১৫ জনকে ধরে এনে পেটানো হয়।

গ. বাঁশবাড়ীয়া ক্যাম্প : এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল হাফেজ রকিব হাসান ওরফে হাফেজ মাহমুদসহ আরো ১৫-২০ জন সদস্য। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. গালিব (চাঁদপুরে ধৃত), ২. পলাশ (সাতক্ষীরায় ধৃত), ৩. মামুন (২৬), থানা-হরিপুর, জেলা-ঠাকুরগাঁও। বাকি অন্য যারা ক্যাম্পে ছিল তারা স্থানীয় গ্রামবাসী। উক্ত ক্যাম্পে বাদশাক নামে একজনকে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

উক্ত সর্বহারা নির্মূল অভিযানে বিভিন্ন ক্যাম্পে বাদশা, বাবু, মুসা, গফুর, সিরাজসহ আরো অনেককে বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে এনে হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হতো। এদের মধ্যে বাদশা ও বাবু মারা যায় এবং অন্য সর্বহারাদের বিভিন্ন সময়ে থানা পুলিশ উদ্ধার করে। ২০০৪ সালের মে মাসের পর থেকে জেএমবিকে

www.pathagar.com

পুলিশ সহযোগিতা না করায় জেএমবি বাগমারায় তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে তাদের নিজস্ব সংগঠনের কার্যক্রম চালাতে থাকে।

অস্ত্র, বিস্ফোরক ও ডেটোনেটর সংগ্রহ

২০০১ সালের শেষের দিকে অথবা ২০০২ সালের প্রথমদিকে ভারতের মুর্শীদাবাদ জেলা থেকে বেলাল নামে এক ব্যক্তি চাঁপাইনবাবগঞ্জের অন্তর্গত শিবগঞ্জে আসে। সেখানকার জোন দায়িত্বশীল হাফেজ এমদাদ ওরফে সালমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেএমবি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আগ্রহী হয় এবং শায়খ আবদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার আশা ব্যক্ত করে সেবারের মতো ভারতে ফিরে যায়। সে পরবর্তীতে আবার এসে শায়খ আবদুর রহমানের সাথে রাজশাহীর বালিয়াপুকুরের জেএমবি'র ভাড়াকৃত বাড়িতে বৈঠক করে। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেন শায়খ আবদুর রহমান, আউয়াল, হাফেজ ইমদাদ ওরফে সালমান ও সালাউদ্দিনসহ আরো ২/৩ জন এহসার সদস্য এবং ভারতীয় দলে ছিল বেলাল, রফিক ও সাইফ। বৈঠকে তারা বাংলাদেশে এ ধরনের সংগঠনের কথা জানতে পেরে খুবই খুশি হয় এবং এ ব্যাপারে তারা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে তা শায়খের নিকট জানতে চান।

পরবর্তীতে ২০০২ সালের জুন মাসের শেষের দিকে টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বশীল আলী (ঠিকানা : গ্রাম-পুটিয়াজানি, থানা-দেলদুয়ার, জেলা-টাঙ্গাইল)-এর বাসায় (টাঙ্গাইলের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে) শায়খ আবদুর রহমান, আতাউর রহমান সানী, হাফেজ মাহমুদ ও সালাউদ্দিন এবং ভারতীয় তিন ব্যক্তি বেলাল, সালাহউদ্দিন ও মোহতাসিমের সাথে বৈঠক করে। বৈঠকে ভারতীয়রা সে দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার প্রস্তাব করে। জেএমবি বিষয়টি কিভাবে কার্যকর করা যায় তা ভেবে দেখবে বলে জানায়।

এরই মধ্যে জেএমবি বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাক অফিসে নিজেদের তৈরীকৃত ডেটোনেটরের সাহায্যে হামলা চালিয়েছে জানতে পেরে বেলাল ঐ দেশে (ভারত) ডেটোনেটর এবং বোমা তৈরীর জেল পাওয়া যায় বলে হাফেজ সালমানকে জানায় এবং সেগুলো সরবরাহ করার প্রস্তাব দেয়। সালমান শায়খকে এ কথা জানালে শায়খ এগুলো আনতে বলে। সালমান প্রথমবারের মতো কিছু ডেটোনেটর ও জেল আনার জন্য দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার আরিফকে ভারতে পাঠায়। আরিফ অল্প কিছু ডেটোনেটর ও জেল নিয়ে এলে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শায়খকে জানালে তিনি আরো বেশী করে তা সংগ্রহ করতে বলেন।

ভারতীয় নাগরিক বেলাল এবং সানিফ (গ্রাম- রহসপুর, থানা-পাইকুড়, জেলা-অজ্ঞাত, ভারত) জেএমবি'কে ভারত থেকে আনুমানিক ১০,০০০ ডেটোনেটর ও পাওয়ার জেল সরবরাহ করে। প্রতিটি পাওয়ার জেল ৫০ টাকা ও ডেটোনেটর ২৫ টাকা করে দাম পড়ে। জেএমবি সদস্যরা পাওয়ার জেলকে সাংকেতিক ভাষায় কলা ও ডেটোনেটরকে তাবিজ বলতো।

ভারত থেকে সরবরাহকৃত অস্ত্র, ডেটোনেটর, পাওয়ার জেলসহ এই বিস্ফোরক সরঞ্জাম তরিকুল (পিতা-মৃত আমজাদ আলী, গ্রাম-চর বোয়ালারী, পো.-চরআসাইদাহ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী); আরিফ (পিতা-অজ্ঞাত, থানা-বিরামপুর, জেলা-দিনাজপুর); শফিউল্লাহ ওরফে তারিক (পিতা-আবদুর রহমান মাস্টার, গ্রাম-ইটাগাছা, থানা-সাতক্ষীরা সদর, জেলা-সাতক্ষীরা); শিহাব ওরফে রিফাত (পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-বারকোনা গ্রামের পাশের গ্রাম, থানা-সাঘাটা, জেলা-গাইবান্ধা)-এর মাধ্যমে জেএমবি'র শূরা সদস্য ও উত্তরাঞ্চলের বিভাগীয় দায়িত্বশীল আব্দুল আউয়াল বাংলাদেশে আনে

www.pathagar.com

এবং বিভিন্ন বোমা হামলায় ব্যবহারসহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মজুদ করে। তরিকুল চোরাচালানীর ব্যবসা করার কারণে তার সাথে ভারতের অনেক লোকের চেনা-জানা রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই ডেটোনেটরগুলো আনার জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়েছিল। সবগুলো ডেটোনেটর একসাথে আনা হয়নি। ২০০ পিসের এক একটি বান্ডিল করে বিভিন্ন সময়ে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিডিআরের চোখ এড়াতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

এছাড়াও ২০০৪ সালে বাগমারা থানায় সর্বহারা নিধন অভিযানকালে সর্বহারাদের নিকট হতে আনুমানিক ৫/৬টি ওয়ান শুটার উদ্ধার করা হয়। ২০০৪ সালের জুন/জুলাই থেকে জেএমবি শূরা সদস্য ও উত্তরাঞ্চলের বিভাগীয় দায়িত্বশীল আব্দুল আউয়াল ভারতীয় বেলালের জনৈক কর্মী এনায়েতের কাছ থেকে আরিফ এবং তরিকুলের মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে পঞ্চাশটি ওয়ান শুটার এবং ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে দুইটি নাইন এমএম পিস্তল ক্রয় করে। ভারতে প্রতিটি ওয়ান শুটার গানের দাম ২০০০ টাকা করে তাদের নিকট থেকে রাখা হয়। এসব অস্ত্রের মধ্যে এসএ পরিবহনের পার্সেল সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকায় সানীর ঠিকানায় ২৫টি, এহসার বেলালের মাধ্যমে শূরা সদস্য সালাহউদ্দিনের কাছে ১৫টি এবং এহসার মামুনের মাধ্যমে খুলনায় হাফেজ মাহমুদের কাছে ১০টি ওয়ান শুটার প্রেরণ করা হয়। সারা দেশে এসএ পরিবহনের শাখা থাকায় তারা এসএ পরিবহনকে বেছে নেয়। তবে এসএ পরিবহন কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে এসব অস্ত্র পরিবহন করেছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পার্সেলের সময় তারা ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করতো। পরে স্থানীয় কাউন্টারের সাথে যোগাযোগ করে জেএমবি'র সদস্যরা সেসব অস্ত্র সংগ্রহ করতো। ঢাকায় এ দায়িত্ব পালন করতো এহসার সদস্য মনির।

জেএমবি'র আমদানী করা অস্ত্রের পরিমাণ

ডেটোনেটর

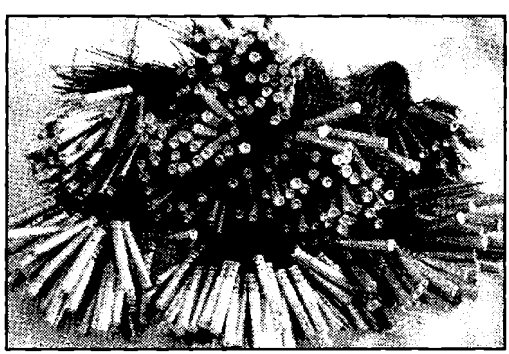

১৭ আগস্টের আগে ২৫০০টি ডেটোনেটর আমদানী করে জেএমবি। এই ডেটেনেটরগুলোর মধ্যে ঢাকায় ১০০০টি, জামালপুরে ৭০০টি, খুলনায় ৫০০টি ও রাজশাহীতে ৩০০টি করে বিতরণ করা হয়। ১৭ আগস্টের পর মোট ৭০০০টি ডেটোনেটর আমদানী করে তারা। এছাড়াও বিডিআর ও বিএসএফ এর হাতে ৪০০ থেকে ৫০০টি ডেটোনেটর ধরা পড়ে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রতিটি ডেটোনেটর ৬ রুপীতে তারা জেএমবিকে সরবরাহ করে।

পাওয়ার জেল

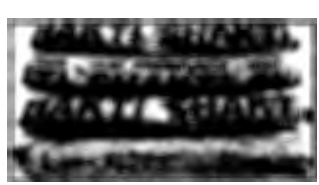

২ থেকে ৩ বারে মোট ২৫০০টি পাওয়ার জেল ভারত থেকে আমদানী করে জেএমবি। ভারতীয় মুদ্রায় প্রতিটি পাওয়ার জেলের মূল্য ধরা হয় ১২ রুপী।

www.pathagar.com

অস্ত্র ও গোলাবারুদ

প্রতিটি ২ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ টাকায় মোট ৫০টি ওয়ান শুটারগান ও ২৫ হাজার টাকা করে ২টি নাইন এমএম পিস্তল ভারত থেকে কেনা হয়। এ নিয়ে ভারত থেকে মোট ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর আমদানী করেছিল জেএমবি'র সদস্যরা। বাগমারা অভিযানের সময় জেএমবি সর্বহারাদের নিকট থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর বেশীর ভাগ তারা পুলিশের কাছে জমা দিলেও দু'একটি অস্ত্র কেউ কেউ রেখে দেয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সর্বহারা নেতা বাদশার নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এসএমসি বাংলাভাই ব্যবহার করতো। বিস্ময়কর হলেও সত্য এটিই ছিল জেএমবি'র সর্বোচ্চ শক্তির আগ্নেয়াস্ত্র। সাধারণত বিশ্বব্যাপী এ ধরনের জঙ্গী সংগঠনের কাছে কমন আর্মস হচ্ছে এ কে ফোরটি সেভেন। কিন্তু জেএমবি'র কাছে একটিও ছিল না তা। এতে প্রমাণিত হয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শর্টটার্মের জন্য জেএমবিকে তৈরী করা হয়েছিল। অবশ্য স্থানীয় বাজার থেকে জেএমবি প্রচুর পরিমাণ বোমা তৈরীর সরঞ্জাম ক্রয় করে এবং এগুলো দিয়ে তারা নিজেরা প্রচুর বোমা ও হ্যান্ডগ্রেনেড তৈরী করতো।

মার্চ ২০০৬ সালের মধ্যে জেএমবি'র নিকট থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও বিস্ফোরকের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	অস্ত্র/বিস্ফোরকের নাম	পরিমাণ
১.	পাইপগান	২১টি
২.	রিভলভার/ পিস্তল	১৪টি
৩.	ইলেকট্রিক ডেটোনেটর	৭৮৯৫টি
৪.	নন-ইলেকট্রিক ডেটোনেটর	৯৯টি
৫.	পাওয়ার জেল	৩১০টি
৬.	ওয়াটার জেল	২২টি
৭.	আইইডি উইথ ডেটোনেটর	১০৭টি
৮.	গান পাউডার	৪৯ কেজি
৯.	হোয়াইট পাউডার	১২ কেজি
১০.	এলুমিনিয়াম পাউডার	২৭ কেজি
১১.	এমোনিয়াম নাইট্রেট	১১১ কেজি
১২.	লেড এজাইড	৪৩ কেজি
১৩.	পটাশিয়াম নাইট্রেট	৪০ কেজি
১৪.	গ্রেন (স্থানীয়)	৩১ কেজি

www.pathagar.com

জেএমবি'র অপারেশনাল শক্তি সঞ্চয়

১৭ আগস্টের পূর্বে জেএমবি বিভিন্ন যাত্রা প্যান্ডেল ও সিনেমা হলে বোমা হামলা, গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক অফিসে ডাকাতি এবং সর্বশেষ বাগমারা অপারেশন সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের পূর্বে শায়খ আবদুর রহমান নিজেই শূরা কমিটির সদস্য এবং অন্য কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তদুপরি সংগঠনের বিভিন্ন অপারেশনের প্রয়োজনে জেএমবি ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, ডেটোনেটর, পাওয়ার জেল ও ওয়াটার জেল এবং স্থানীয় উৎস হতে অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ ও মজুদ করেছে। ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখের বোমা হামলার পূর্বে পরিচালিত সকল অপারেশন কার্যক্রম দেশব্যাপী বোমা হামলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবেই তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও আস্থা অর্জনের জন্য করা হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

বিভিন্ন বৈঠক ও সিদ্ধান্ত

সংগঠন সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শূরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈঠকের খবর আমাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। জেএমবি'র আন্দোলনে এ বৈঠকগুলো গুরুত্ববহ ছিল বলে সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ক্বিতাল বিষয়ক বৈঠক : ২০০৩ সালের মে/জুন মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার কানসাট গ্রামে জনৈক সুধীর বাসায় একটি শূরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে খালেদ সাইফুল্লাহ ব্যতীত সকল শূরা সদস্য এবং সৌদি আরব ফেরত ওয়ালিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। ওয়ালিউর রহমান ফতোয়া দেন যে, যারা জন্মগতভাবে মুসলমান কিন্তু ইসলামিক আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করছে না, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না বরং তারা মুনাফেক এবং ইসলামে মুনাফেকদের হত্যা করার বিধান নাই। শায়খ এ ফতোয়ার বিরোধিতা করে ইসলামিক আইন অনুযায়ী যারা দেশের আইন রচনা করছে না তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেন এবং তাদের ক্বাতিল (হত্যা) জায়েজ বলে মন্তব্য করেন। ফলে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই উক্ত বৈঠক শেষ হয়।

অপারেশন বাগমারা বন্ধের সিদ্ধান্ত: ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানায় জনৈক এহসার ফারুকের বাড়িতে শূরা সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানী, সালাহউদ্দিন, হাফেজ মাহমুদ এবং আব্দুল আউয়াল উপস্থিত ছিল। বাগমারা থানায় জেএমবি'র তিনজন সদস্য মৃত্যুবরণ করার প্রেক্ষিতে ঘটনার পরের দিনই উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেএমবি'র ৬/৭ জন সদস্য বাগমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে হত্যার উদ্দেশ্যে গেলে এলাকাবাসী টের পেয়ে ৩ জন সদস্যকে (ইব্রাহিম, মুরাদ, আবদুর রহমান) ধরে গণপিটুনী দিয়ে মেরে ফেলে। সাকিব, আব্দুল মতিন এবং অজ্ঞাত একজন পালিয়ে বেঁচে যায়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাগমারা থানায় বর্তমানে জেএমবি'র আর কোনো তৎপরতা না চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে।

জেএমবি'র কার্যক্রম স্থগিতের সিদ্ধান্ত : ২০০৫ সালের মার্চ মাসে আশরাফ নামে চট্টগ্রাম জেলার সদরে হালিশহরের বাসিন্দা জেএমবি'র সুধী আশরাফের বাসায় শূরা সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আশরাফ ইউনাইটেড ব্যাংকে চাকরি করে। উক্ত বৈঠকে

www.pathagar.com

শায়খ আবদুর রহমান, আতাউর রহমান সানী, সালাহউদ্দিন, হাফেজ মাহমুদ এবং আব্দুল আউয়াল উপস্থিত ছিল। বৈঠকের মূল বিষয়বস্তু ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে সরকার কর্তৃক জেএমবিকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। উক্ত বৈঠকে সংগঠনের এলাকাভিত্তিক অবস্থা পর্যালোচনা, পুলিশ কর্তৃক জেএমবি সদস্যদের গ্রেফতারের সংখ্যা এবং সাথীদের মনোবল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি চিন্তা করে সংগঠনের কর্মতৎপরতা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা এবং পুলিশী গ্রেফতার থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য দাড়ি কাটার সিদ্ধান্ত হয়। তবে বিষয়টি কর্মীদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত থাকার পরও আত্মগোপনের প্রয়োজনে চরম ক্রান্তিকালেও শায়খ রহমান বা বাংলাভাই কেউই দাড়ি কাটেনি। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় তারা কতোটা কট্টরপন্থা অনুসরণ করতো। ঐ বৈঠকে সংগঠনের কর্মসূচি নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন থেকে সংগঠনের কোন দলিল বা কাগজপত্র সংরক্ষণ করা যাবে না। এছাড়া বৈঠকে কেন্দ্রের এবং বিভাগের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। ঐ সময়ে বগুড়া এবং ঢাকার জয়েন্ট একাউন্ট পর্যালোচনা করে জানা যায়, সংগঠনের কেন্দ্রে আনুমানিক ২০ লাখ টাকা জমা আছে।

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার সিদ্ধান্ত : ২০০৫ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার গায়েরে এহসার সদস্য শরীফের বাসায় শূরা সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানী, সালাহউদ্দিন, হাফেজ মাহমুদ এবং আব্দুল আউয়াল উপস্থিত ছিল। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈঠক চলে। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল লিফলেটের মাধ্যমে সংগঠনের (জেএমবি) দাওয়াত ও প্রচারের জন্য দেশব্যাপী বোমা অভিযান। বৈঠকে শায়খ আবদুর রহমান নিজেই সংগঠনের শূরা সদস্যদের নিকট বোমা ফাটানোর মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবের উপর শূরা সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। আউয়াল এবং হাফেজ মাহমুদ প্রস্তাবের বিপক্ষে মত পোষণ করে। তারা বলে যে, বোমার মাধ্যমে দাওয়াত দিলে মানুষ সুন্দরভাবে গ্রহণ করবে না বরং সারাদেশে সমালোচনা হবে এবং তাদের যা শক্তি তার চেয়ে বেশী প্রকাশ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে শায়খ আবদুর রহমান বৈঠকে উপস্থিত সকলকে বলেন যে, ইতোপূর্বে আমরা দুবার লিফলেটের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছি কিন্তু সেগুলোতে বেশী প্রচার হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে আমাদের জিহাদী অপারেশনকে মিডিয়া ডাকাতি বলে আখ্যা দিচ্ছে। এতে করে সাধারণ কর্মীদের নৈতিক মনোবল দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা যদি একটু ভিন্নভাবে বোমার মাধ্যমে দাওয়াত দেই তাহলে এটা যেমন প্রচার হবে তেমনি মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হবে। শায়খ আরো যুক্তি দেন যে, জিহাদী কাজ জিহাদী ভঙ্গিমায় হওয়া দরকার। আর এ কাজে শক্তি প্রকাশ বেশী হবে না, কারণ বোমাগুলো মানুষ মারার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হবে না এবং বোমাগুলোও খুব ছোট আকারে থাকবে। এ সময় বাংলাভাই বলেন, এভাবে বোমা মারা হলে মিডিয়া কিন্তু আমাদের ছাড়বে না। বাগমারার ঘটনা থেকে আমি বুঝেছি, মিডিয়া কি জিনিস। তখন শায়খ বলেন, বাগমারার ঘটনা এখন আর মিডিয়াতে নেই। তেমনি এই বোমা হামলার ঘটনা নিয়েও মিডিয়া প্রথম প্রথম কিছুদিন মাতামাতি করবে তারপর এক সময় থেমে যাবে। এভাবে শায়খ রহমান সকলকে বোমা হামলার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তারিখ নির্ধারণ না করে শায়খ প্রস্তুতি দেখে তারিখ নির্ধারণ করবেন বলে জানান। তিনি প্রত্যেক শূরা সদস্যকে লিফলেটে কি লেখা হবে তা নমুনা

www.pathagar.com

হিসেবে লিখে ১ কপি করে তার নিকট পাঠানোর জন্য সকলকে নির্দেশ দেন। আদালত প্রাঙ্গণ এবং গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় বোমা ফাটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণে বোমা হামলার সিদ্ধান্ত : ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাস্থ বাসাবো এলাকায় আতাউর রহমান সানীর ভাড়াকৃত বাসায় শূরা সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে শায়খ আবদুর রহমান এবং বাংলাভাই ব্যতীত অন্য সকল শূরা সদস্য উপস্থিত ছিল। নিরাপত্তার কারণে শায়খ এবং বাংলাভাই ঐ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আদালত প্রাঙ্গণে হামলার মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা। খালেদ সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে দুই ঘন্টার এই বৈঠকে প্রথমে নিজ নিজ বিভাগের সংগঠনের অবস্থা ও করণীয় কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে আদালতে জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের টার্গেট করে বোমা হামলা চালাতে হবে। সবাই যার যার বিভাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ শায়খ আবদুর রহমানকে মোবাইলের মাধ্যমে জানাবে। প্রত্যেক দায়িত্বশীল বিভাগের সাথীদের গোপনীয়তা রক্ষা করে সতর্কতার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। এছাড়া মসজিদে মসজিদে সংগঠনের দাওয়াতী কাজ এবং মুয়াশকার (প্রশিক্ষণ) বন্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। কারণ ১৭ আগস্ট পরবর্তী সময়ে এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে চিহ্নিত হওয়ার এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে ফেদায়ী (আত্মঘাতী) পদ্ধতিতে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের কোন দলিল আছে কিনা সে বিষয়টি স্টাডি করার নির্দেশ দেয়া হয়।

জেএমবি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে জিহাদের ডাক

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে জেএমবি'র মাসিক পত্রিকা 'আল মাগাজি' (পরবর্তীতে 'আল ইসলামী' নামকরণ করা হয়) ছাপানোর জন্য আতাউর রহমান সানী ঢাকার পূর্ব বাসাবোর পাটোয়ারী গলিতে একটি বাসা ভাড়া নেয়। উক্ত বাসায় সংগঠনের এহসার সদস্য ইয়াসির (পরিবারসহ), আকরাম ও তামিম (সকলেই গ্রেফতারকৃত) বসবাস করতো। উক্ত বাসা থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি'র মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বিতরণ করা হতো। পত্রিকা বিক্রির টাকা মতিঝিলে অবস্থিত আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখায় জেএমবি'র যৌথ একাউন্টে জমা করা হতো। আকরাম ও তামিম পত্রিকা ছাপানো ও বিলির কাজে ইয়াসীরকে সাহায্য করতো। পত্রিকাগুলো সবুজবাগ থানার বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে অবস্থিত সিটি প্রেস এবং নয়াবাজারস্থ দাউদ মডার্ন প্রেস থেকে ছাপানো হতো। পরবর্তীতে প্রেসগুলোতে হানা দিয়ে র‍্যাব বিপুল পরিমাণ পত্রিকা ছাপানোর নেগেটিভ, পত্রিকার উদ্বৃত্ত কভার পেজ ইত্যাদি উদ্ধার করে। পত্রিকা ছাপানোর সাথে জড়িত সিটি প্রেসের মালিক জুয়েল খান এবং দাউদ মডার্ন প্রেসের মালিক কাইয়ুম খানকে গ্রেফতার করা হলে তারা তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে।

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) বিস্ফোরণের মাধ্যমে জেএমবি তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড প্রচারের জন্য প্রতিটি বিস্ফোরণস্থলে লিফলেট বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত লিফলেটগুলো বাংলা, আরবী এবং ইংরেজীতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইংরেজী লিফলেট তৈরীর জন্য শূরা সদস্য সালাহউদ্দিন এহসার সদস্য মোয়াজের মাধ্যমে মোয়াজেরের নানার (ইংরেজী শিক্ষক) কাছ থেকে খসড়া প্রস্তুত করে। আরবী লিফলেটটি শায়খ আবদুর রহমান নিজেই প্রস্তুত করে।

www.pathagar.com

আতাউর রহমান সানীসহ অন্য শূরা সদস্যরা তাদের অধীনস্থদের কাছ থেকে বাংলা লিফলেটগুলোর খসড়া প্রস্তুত করে শায়খ আবদুর রহমানের কাছে পাঠায়। শায়খ আবদুর রহমান পরে সকল লিফলেট পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত লিফলেট তৈরীর জন্য মোবাইলে সানীকে নির্দেশ দেয় এবং একই সাথে লিফলেটগুলো ছাপানোর জন্য বলে। লিফলেটগুলো ছাপানোর জন্য সানী ঢাকার পূর্ব বাসাবোর বাসিন্দা এহসার সদস্য আকরামকে (বর্তমানে গ্রেফতারকৃত) দায়িত্ব দেয়। আকরাম বাসাবোর বৌদ্ধ মন্দিরের নিকটবর্তী সিটি প্রেসের মালিক জুয়েল খানকে সর্বমোট ৫২ হাজার কপি বাংলা, ইংরেজী ও আরবী লিফলেট ছাপানোর অর্ডার দেয়। অর্ডার অনুযায়ী সিটি প্রেসে ৩৮ হাজার কপি বাংলা লিফলেট এবং ঢাকার নয়াবাজারস্থ কাইয়ুম খানের মালিকানাধীন দাউদ মডার্ন প্রেসে ৭ হাজার কপি ইংরেজী ও ৭ হাজার কপি আরবী লিফলেট ছাপানো হয়। পরে সানীর নির্দেশে আকরাম ও তার সহযোগী তামি কুরিয়ার সার্ভিসে ও এসএ পরিবহনে পার্সেলের মাধ্যমে লিফলেটগুলো সারা দেশের বিভাগীয় এবং জেলা দায়িত্বশীলদের নিকট প্রেরণ করে।

আগস্টে দেশব্যাপী হামলার সিদ্ধান্ত, প্রচার এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকা

২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী সরকার জেএমবি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি'র আমীর শায়খ আবদুর রহমান ২০০৫ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে ময়মনসিংহে শূরা কমিটির একটি মিটিং ডাকে। মিটিংয়ে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে একসাথে একই সময়ে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে সময়ে বোমা হামলার কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। তবে মিটিংয়ে শায়খ আবদুর রহমান জানান যে, এমন একটি তারিখ বেছে নেয়া হবে যাতে পরবর্তীতে দেশবাসী বোমা হামলার তারিখ হিসেবে ঐ তারিখটাকে মনে রাখবে। শূরা কমিটির সদস্য খালেদ সাইফুল্লাহ ঐ সময়ে জেলে থাকার কারণে বৈঠকে অংশ নিতে পারেনি। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঐ মিটিংয়ে এভাবে দেশব্যাপী বোমা হামলার ব্যাপারে জেএমবি'র শূরা সদস্যগণ একমত ছিল না। তবু আমীরের বিশেষ ক্ষমতাবলে এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই পাস হয়। তবে এ বোমা হামলায় যাতে মানুষ না মরে সেজন্য বোমার মধ্যে স্প্লিন্টার না দিয়ে তার পরিবর্তে ধানের তুষ বা কাঠের গুঁড়া ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়।

মিটিংয়ে বোমা হামলা পরিচালনার জন্য শূরা সদস্যদের উপর বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। দেশব্যাপী বোমা হামলার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং এ চার ভাগের দায়িত্ব জেএমবি'র চার শূরা সদস্যকে দেয়া হয়। ভাগগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১, সালাউদ্দিনের দায়িত্বে ছিল জামালপুর জেলা, ময়মনসিংহ জেলা ও সিলেট বিভাগ।
২. হাফেজ মাহমুদের দায়িত্বে ছিল খুলনা ও বরিশাল বিভাগ।
৩. আতাউর রহমান সানীর দায়িত্ব ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং
৪. আব্দুল আউয়ালের দায়িত্বে দেয়া হয় রাজশাহী বিভাগ।
লক্ষণীয় হলো, আমীর হিসাবে আবদুর রহমান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করলেও পরিচিত মুখ হবার কারণে সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাইকে কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার লক্ষ্যে জুলাই মাস থেকেই বোমা তৈরীর সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়। সানীর নির্দেশে আবদুল আউয়াল ৭০০ ডেটোনেটর সংগ্রহ করে পার্সেল করে

www.pathagar.com

ঢাকায় পাঠালে মনির এসএ পরিবহনের কাউন্টার থেকে ডেটোনেটরগুলো সংগ্রহ করে সানীর বাসাবোর বাসায় নিয়ে আসে। একইভাবে চট্টগ্রামের দায়িত্বশীল মোহাম্মদ ৩০ কেজি এমোনিয়াম নাইট্রেট, ৫০ কেজি পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ৭ কেজি সালফার সংগ্রহ করে ঢাকায় সানীর কাছে পাঠায়। এর ২/৩ দিন পর সানীর নির্দেশে এহসার সদস্য মিজান ঢাকার মিডফোর্ড এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ এমোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। এর মধ্যে থেকে ৩০ কেজি বগুড়ায় আবদুল আউয়ারে নিকট, ১৫ কেজি খুলনায় হাফেজ মাহমুদের নিকট, ১০ কেজি সালাহউদ্দিনের নিকট প্রেরণ করে। এছাড়াও সুত্রাপুর থানার বনগ্রামে অবস্থিত সংগঠনের লেদ মেশিন থেকে বেশ কিছু হ্যাণ্ড -গ্রেনেডের ডাইস তৈরী করে তারা। জুলাই মাসের ২০ তারিখে এহসার মিজান ও মনির বোমা বানানোর উদ্দেশ্যে খিলক্ষেতে সংগঠনের ভাড়া করা বাসায় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও ১৫টি ওয়ান শুটার গান এবং হ্যাণ্ড গ্রেনেডের ডাইস এনে জমা করে। জুলাই মাসের শেষের দিকে সানী তার বাসাবোর বাসায় তার আওতাধীন বিভিন্ন জেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠক করে। ঐ বৈঠকে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, দিনাজপুর, মানিকগঞ্জ, যশোর জেলা ও টঙ্গী থানার দায়িত্বশীলগণ অংশ নেন। বৈঠকে সানী আঞ্চলিক প্রধানদের আগস্ট মাসের মাঝামাঝির দিকে বোমা হামলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়। ৩ আগস্ট টাঙ্গাইলের মোল্লা ওমর বোমা তৈরীর জন্য আইসি, রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিটর প্রভৃতি নিয়ে খিলগাঁওয়ের ওভার ব্রিজের নিকট সানীর কাছে হস্তান্তর করে। সানী ঐ দিনই তার বাসায় মিজান ও মনিরকে সাথে নিয়ে বোমার সার্কিট তৈরীর কাজ শুরু করে। ১২ ও ১৩ আগস্ট সানী, শামীম মিজান ও মনির মিলে ১৯০টি বোমা তৈরী করে। ১৪ তারিখে সানী মোবাইলে বিভিন্ন জেলা ও জোন কমান্ডারকে বোমা নেয়ার জন্য তার বাসাবোর বাসায় আসতে বলে। ঐ দিন তাদেরকে কিভাবে প্যাকেটের ভেতর রেখে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে বুঝিয়ে দেয়া হয়। ১৫ আগস্ট কার্টনে আবদ্ধ বোমা নিয়ে শামীম বাসযোগে কুমিল্লা যায়। সেখান থেকে সে চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী জেলার দায়িত্বশীলদের বোমাগুলো বুঝিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাগুলো সানী নিজেই চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে খুলশী থানায় ঝাউতলা মসজিদের পাশে সংগঠনের ভাড়া করা একটি মেসে চট্টগ্রামের দায়িত্বশীলদের মাঝে বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসে। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ জেলার দায়িত্বশীলরা বাসাবোর বাসায় সানীর নিকট থেকে বোমা সংগ্রহ করে। একইভাবে অন্যান্য বিভাগের কমান্ডারগণও তাদের কাছে পাঠানো বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে বোমা তৈরী করে তাদের অধীনস্থ জেলা কমান্ডারদের কাছে প্রেরণ করে।

www.pathagar.com

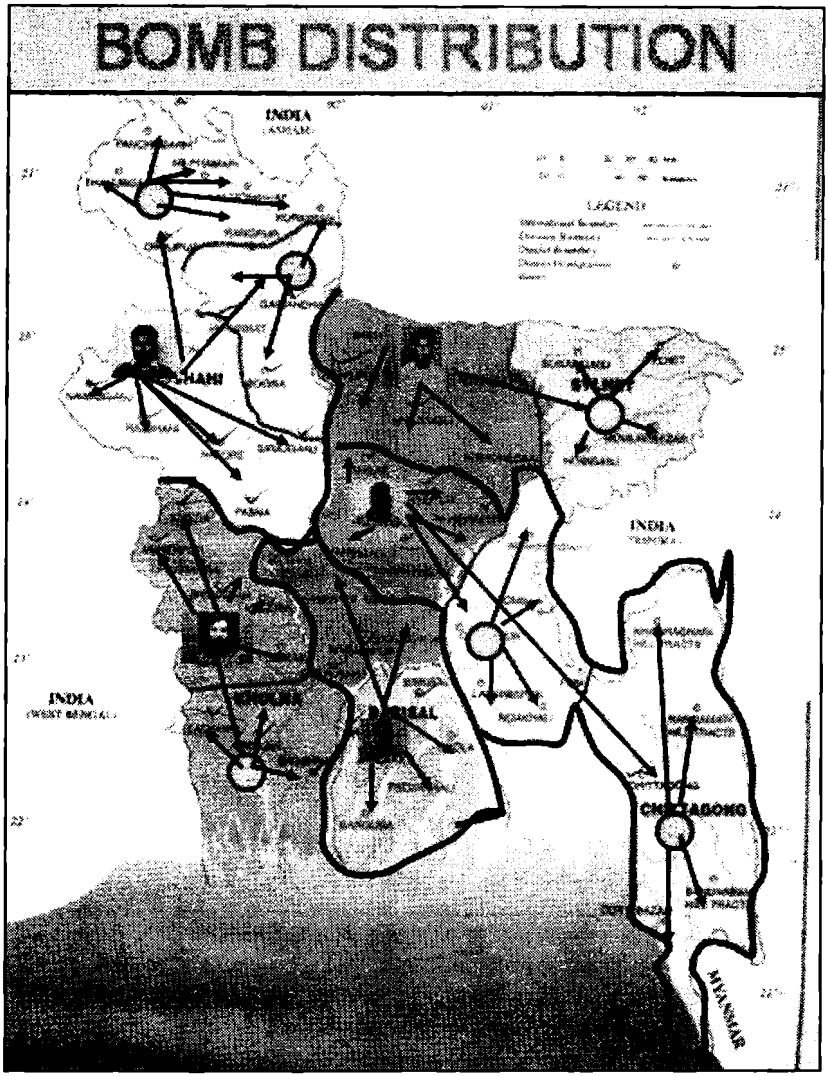

১৭ আগস্ট বোমা হামলার জন্য বোমা সরবরাহের চিত্র

১৪ আগস্ট শায়খ রহমান তার স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে সংগঠনের ভাড়া করা মাদারটেকের বাসায় আসে। সারা দেশে বোমা হামলার পর শায়খ আবদুর রহমানের নিরাপত্তার কথা ভেবে সানীর মাদারটেকের বাসায় অবস্থানরত আবদুল আউয়াল শায়খ রহমানের জন্য ২৯ জুলাই খিলগাঁও থানাধীন বনশ্রী প্রজেক্টে কে-১৬৪/এ বাসাটি ভাড়া করে। ২৮ জুলাই সানী লন্ডন থেকে আসা সুধীদের দেয়া ১০ হাজার পাউন্ডের মধ্যে থেকে ২ হাজার পাউন্ড আউয়ালকে দিয়ে তার একাউন্টে জমা রাখতে বলে এবং আসন্ন

www.pathagar.com

বোমা হামলার সময় তাকে ব্যবহার করতে বলে। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার সময় সানী বাসাবোর পাটোয়ারী বাড়িতে আকরামের বাসায় অবস্থান করছিল। ১৬ আগস্ট আবদুর রহমান সপরিবারে জামাই আবদুল আউয়ালের বনশ্রীতে ভাড়া করা বাসায় ওঠে। ১৭ আগস্ট সকাল ৭টায় আবদুর রহমান বিভিন্ন বিভাগীয় কমান্ডারের কাছে তার ব্যবহার করা মোবাইল ০১৭১৮১৭৯৯৫০ থেকে ফোন করে ১৭ আগস্ট ১১টার সময় সারা দেশে একযোগে বোমা হামলার নির্দেশ দেয়। বিভাগীয় কমান্ডারগণ তাদের অধীনস্থ জেলা কমান্ডারদের নিকট এই বার্তা পৌঁছে দেন। এ সময় আবদুর রহমানের পাশে বসা আবদুল আউয়ালও তার ব্যবহৃত ০১৭১৮৯০৮০৪০ নম্বরের মোবাইল ব্যবহার করে তার অধীনস্থ জেলা কমান্ডারদের বোমা হামলার নির্দেশ দেন। এরপর তারা টিভি খুলে বোমা হামলার নিউজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বোমা হামলা চালানোর পর জেলা কমান্ডারগণ বিভিন্ন স্থান থেকে একের পর এক মোবাইলে ফোন করে বোমা হামলা সফল হয়েছে বলে তাদের জানালে তারা আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। দুপুর ২টার পর থেকে চ্যানেল আইয়ের সংবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার খবর আসতে থাকলে তারা সে খবর শোনে। এরপর তারা ৩ দিন কোনো প্রকার বাইরে না বেরিয়ে বাসাতেই অবস্থান করে।

"সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী বোমাবাজি যারা করে তাদের পক্ষে ইসলামের কোন সমর্থন নেই। এসব ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড যারা করে এবং যারা এর নেপথ্যে থাকে তারা যে নামে ও যে পরিচয়েই থাকুক না কেন, তাদের পক্ষে কথা বলার সমর্থন ইসলাম দেয়নি। তিনি বাংলাদেশে বলেন, ইসলামের নামে যারা বোমাবাজি করছে, আত্মঘাতী হামলা করে মানুষ মারছে তারা ইসলাম, মাদ্রাসা এবং ওলামায়ে কেরামকে হেয়প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই এসব করছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও বোমাবাজি ইসলাম সমর্থনও করে না। ইসলাম প্রচারে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বোমবাজি ও সন্ত্রাস ইসলামের ইতিহাসেও নেই। এসব কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।"

–মাওলানা আহমদ শফি

মুহতামিম, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

চেয়ারম্যান, কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

www.pathagar.com

নিম্নে ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

বিস্ফোরিত /অবিস্ফোরিত বোমার পরিসংখ্যান
জেলাওয়ারী/রেঞ্জভিত্তিক সামারী

ক্রমিক নং	জেলা/ইউনিটের নাম	বিস্ফোরণের সংখ্যা	আহত	নিহত	অবিস্ফোরিত
১।	ডিএমপি, ঢাকা	৩১টি	৬ জন	-	৩টি
২।	সিএমপি, চট্টগ্রাম	১৮টি	৪ জন	-	৩টি
৩।	কেএমপি, খুলনা	১১টি	-	-	-
৪।	আরএমপি, রাজশাহী	১১টি	-	-	-
৫।	ঢাকা রেঞ্জ	৯৫টি	২৪ জন	১ জন	৮টি
৬।	চট্টগ্রাম রেঞ্জ	৫৬টি	১৭ জন	-	১টি
৭।	রাজশাহী রেঞ্জ	৯৩টি	৩০ জন	১ জন	১৭টি
৮।	খুলনা রেঞ্জ	৪৭টি	৮ জন	-	৮টি
৯।	বরিশাল রেঞ্জ	৩৩টি	১৩ জন	-	৮টি
১০।	সিলেট রেঞ্জ	৩৪টি	১ জন	-	২টি
১১।	রেলওয়ে রেঞ্জ	৫ টি	১ জন	-	১টি
সর্বমোট		৪৩৪টি	১০৪ জন	২	৫১টি

জেলাওয়ারী/ রেঞ্জ ভিত্তিক বিস্তারিত পরিসংখ্যান
ডিএমপি, ঢাকা

ক্রমিক নং	জেলা/ ইউনিটের নাম	বিস্ফোরণের স্থান ও সংখ্যা	আহত	অবিস্ফোরিত
১।	ডিএমপি, ঢাকা	মোট ৩১টি টিএসসি চত্বর-১টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম সীমানা প্রাচীর-১টি নিউমার্কেটের ৪ নং গেট-১টি পলাশী বাজার-১টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের দক্ষিণে এলেন বাড়ি রোড-১টি মহাখালী বাসস্ট্যান্ডের সামনে-১টি ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল সংলগ্ন ক্ষুদ্র পার্ক-১টি বিমান বাহিনীর তথ্য ও নির্বাচন কেন্দ্র সংলগ্ন-১টি গুলশান নতুন বাজার ওভারব্রিজের ওপর-১টি গুলশান ২ নম্বর গোল চত্বর-১টি গুলশান ১ নম্বর গোল চত্বর-১টি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ২য়	৬ জন	৩টি

www.pathagar.com

		তলার এরাইভেল কেনপি-২টি ডেসা ভবনের সামনে-১টি জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্বদিকে-১টি যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তার পুলিশ বক্সের পিছনে-১টি সুপ্রীমকোর্ট বার ও হাইকোর্টের এনেক্স ভবনের মাঝখানে-১টি আজিমপুর বাসস্ট্যান্ডের রাজউক মার্কেটের সামনে-১টি সিএমএম কোর্ট,কোতোয়ালী-১টি সিএমএম পুরাতন ভবনের নীচতলা-১টি মহানগর দায়রা জজ আদালতের ২য় তলায় -১টি সদরঘাট টার্মিনালের প্রশাসনিক ভবনের নীচতলা-১টি মালিবাগ হোসাফ মার্কেটের সামনে-১টি শাপলা চত্বর, মতিঝিল-১টি রাজউক ভবনের সামনে-১টি বঙ্গভবনের সামনের আইল্যান্ডে-১টি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায়-১টি ৩৪, মিন্টু রোড-১টি হোটেল শেরাটনের উত্তর পাশে-১টি কনকর্ড টাওয়ার ও হোটেল সোনারগাঁওয়ের মাঝখানে-১টি		

কেএমপি, খুলনা

৩।	কেএমপি, খুলনা	মোট ১১টি খুলনা জজ কোর্টের সামনে-১টি সিএমএম কোর্টের সামনে-১টি খুলনা জজ কোর্টের হাজতখানার সামনে-১টি সিএমএম কোর্ট হাজতখানার সামনে-১টি খুলনা জেলখানা ঘাটের সামনের রাস্তায়-১টি গোলমনি শিশুপার্কের কোণায়-১টি রূপসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে-১টি ডাকবাংলো মোড়স্থ মসজিদ বারান্দায়-১টি নিউ মার্কেটের দোতলায়-১টি দৌলতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালের পিছনে-১টি বিএল কলেজের শিক্ষক হোস্টেলের পিছনে-১টি	২ জন	-

আরএমপি, রাজশাহী

www.pathagar.com

৪।	আরএমপি, রাজশাহী	মোট ১১টি আরডিএ মার্কেট-১টি নিউ মার্কেট-১টি গৌরাঙ্গার মোড়-১টি জিরো পয়েন্ট-১টি বাস টার্মিনাল-১টি কোর্ট চত্বর-৩টি লক্ষীপুর মোড়-১টি নওদাপাড়া কৃষি ব্যাংক-১টি	-	-

ঢাকা রেঞ্জ

৫।	ঢাকা	মোট ৫টি ইপিজেড-এর ১ নং গেটের সামনে-১টি জাহাঙ্গীর নগর ডেইরী ফার্মের ২নং গেট-১টি জামতলা গ্রামে জনৈক আমানউল্লার বাড়ীর পাশে-১টি নবীনগর বাসস্ট্যান্ডের পাশে-১টি সাভার থানাধীন বিনোদবাই জনৈক জসিমের বাড়ীর গেটে-১টি	১ জন	১টি
৬।	নারায়ণগঞ্জ	মোট ৬টি সদর থানার মেইন গেটের বাইরে-১টি পৌরসভা গেটের পাশে-১টি ২নং রেলগেটের নিকট-১টি চাষাঢ়া সোনালী ব্যাংকের সামনে-১টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এর কোণায়-১টি জজ কোর্টের নীচতলার বারান্দায়-১টি	-	-

৭।	গাজীপুর	৮টি বদরুল আলম কলেজের সামনে-১টি এডিসি রেভিনিউ অফিসের সামনে-১টি রাজলক্ষী ঘাটের পাড়ে-১টি কালিমন্দিরের সামনে-১টি চৌরাস্তা সড়কদ্বীপে-১টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে-১টি ডুয়েট ক্যাম্পাস হলের সামনে-১টি শিমুলতলী বাসষ্ট্যান্ডের সামনে-১টি	২ জন	-
৮।	মুন্সিগঞ্জ	-	-	-
৯।	মানিকগঞ্জ	মোট ৫টি জজ কোর্টের সামনে-১টি কালেক্টরেট ভবনের সামনে-১টি সিটি ব্যাংকের সামনে-১টি	-	-

www.pathagar.com

		প্রেসক্লাবের সামনে-১টি সদর হাসপাতাল বাসস্ট্যান্ডের পাশে-১টি		
১০।	নরসিংদী	মোট ৬টি কোর্ট চত্বরে-২টি সরকারী কলেজে-১টি জেলখানার বাইরের মসজিদের ওজুখানায়-১টি পুলিশ লাইন মসজিদের অজুখানায়-১টি বাসস্ট্যান্ডে-১টি	২জন	-
১১।	ময়মনসিংহ	মোট ১১টি বার ভবনে দোতলায় ও উক্ত ভবনের পিছনে-২টি এডিএম কোর্টের সম্মুখে-১টি মুক্তার লাইব্রেরীর সামনে-১টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণে-১টি জেলা পরিষদ অফিসের সিড়িতে-১টি প্রেসক্লাব মার্কেটে-১টি চায়না ব্রীজ মোড়ে-১টি চরপাড়া মোড়ে-১টি আনন্দমোহন কলেজ গেট-১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-১টি	১৩ জন	
১২।	টাংগাইল	মোট ৭টি জজকোর্ট ও ডিসি অফিসের মাঝে-১টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণে-১টি জজকোর্ট বারান্দা-১টি মাহমুদুল হাসান ডিগ্রি কলেজের বাইরে-২টি ঘাটাইল থানা বাসস্ট্যান্ডে-১টি মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে-১টি	-	৪টি

১৩।	কিশোরগঞ্জ	মোট ৬টি ডিসি অফিসের আশপাশে-১টি জজকোর্টের সংলগ্ন-১টি বত্রিশ বাসস্ট্যান্ডে-১টি শহিদী মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা-১টি ডিসি অফিসের পশ্চিম পাশে-১টি জজকোর্টের পিছনে-১টি	৬ জন	-
১৪।	নেত্রকোনা	মোট ৫টি কোর্ট ভবনের সামনে-১টি কোর্ট কেন্টিনের সিঁড়িতে-১টি জজকোর্ট ভবনের গাড়ী রাখার বারান্দায়-১টি জজকোর্ট ভবনে উঠার সিঁড়িতে-১টি ছোট বাজার পৌর মার্কেটের সামনে-১টি	-	-
১৫।	শেরপুর	মোট ৬টি	-	১টি

www.pathagar.com

		জজকোর্ট প্রাঙ্গণ-২টি ডিসি অফিসের ভিতর-১টি নিউ মার্কেট মোড়-১টি বাসস্ট্যান্ড-১টি কয়ার পাড় মোড়-১টি		
১৬।	জামালপুর	মোট ৮টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ-৩টি ডিসি অফিসের সামনে-২টি রেলওয়ে স্টেশন-১টি বকুলতলা-১টি দয়াময়ী মোড়-১টি	-	
১৭।	ফরিদপুর	মোট ৫টি সার্কিট হাউজের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায়-১টি জজকোর্ট চত্বর-১টি সোনালী ব্যাংক কোর্ট বিল্ডিং-এর পাশে-১টি কিরণ সিনেমা হলের সামনে-১টি সামসুদ্দিন মার্কেটের সামনে-১টি	-	
১৮।	গোপালগঞ্জ	৬টি ডিসি অফিসের সামনে-১টি শিল্পকলা একাডেমীর পাশে-১ টি জজ আদালত বাউন্ডারী সংলগ্ন-১ টি বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র হোস্টেল বাউন্ডারীর পাশে-১টি কাঠপট্টি রাস্তায়-১টি টিবি ক্লিনিকের মাঝখানে-১টি		
১৯।	মাদারীপুর	২টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ-১টি হাওলাদার সুপার মার্কেট-১টি		

২০।	রাজবাড়ী	মোট ৩টি জজকোর্ট মসজিদের পাশে-১টি টেনিস ক্লাবের পাশে-১টি পান্না চত্বর-১টি		
২১।	শরিয়তপুর	মোট ৬টি কোর্ট চত্বরে-২টি কেন্দ্রিয় মসজিদ চত্বর-১টি রাজগঞ্জ ব্রীজ এলাকায়-১টি উত্তর পালং-১টি কোট চত্বর-১টি		২টি

www.pathagar.com

২২।	কক্সবাজার	মোট ৬ টি ডিসি অফিসের সামনে কার পার্কিং এর পাশে-১টি জজ আদালত ভবনের নীচ তলা-১টি লালদিঘীর পারে হানিফ কাউন্টারের পাশে-১টি বাজারঘাটা মসজিদ রোডের মাথায়-১টি কেন্দ্রিয় মসজিদ রোডের মাথায়-১টি কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনালে-১টি বড় বাজার পৌরসভা মার্কেটের সামনে-১টি	২ জন	
২৩।	রাংগামাটি	মোট ৪টি প্রেসক্লাবের দেয়ালের পাশে-১টি রিজার্ভ বাজারের বিভিন্ন ডাস্টবিনে-১টি বনরূপা মোড়ে ডাষ্টবিনে-১টি ফরেষ্ট রেষ্ট হাউজের পাশে ডাস্টবিনে-১টি	১ জন	-
২৪।	বান্দরবান	মোট ৫টি ডিসি অফিসের সিড়ির নীচে -১টি বার লাইব্রেরীর পাশে-১টি কেন্টিনের ডাষ্টবিনে-১টি কেন্দ্রিয় ঈদগার পাশে-১টি বাজার জামে মসজিদ গেট-১টি		১টি
২৫।	খাগড়াছড়ি	মোট ৪ টি ডিসি অফিসের নীচতলায়-১টি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যালয়-১টি জজকোর্টের সামনে বটগাছের নীচে-১টি শাপলা চত্বর মুক্ত মঞ্চ-১টি	৩ জন	-
২৬।	কুমিল্লা	মোট ৯টি ডিসি অফিস চত্বরে-৩টি জজকোর্ট চত্বরে-৩টি প্রেসক্লাবের সামনে-১টি শাসনগাছা বাসস্ট্যান্ডে-১টি সেনানিবাস বাসস্ট্যান্ডে-১টি	৪ জন	-

২৭।	চাঁদপুর	মোট ৭টি জজকোর্টের দোতলার বারান্দা-১টি বার লাইব্রেরী-১টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বারান্দা-১টি পৌরসভার ল্যাট্রিন-১টি চাঁদপুর হোটেলের সামনে-১টি পুরান বাজার নিতাইগঞ্জ রাস্তায়-১টি	২ জন	
২৮।	বাক্ষণবাড়ীয়া	মোট ৭টি ডিসি অফিস জেলা ও দায়রা জজ আদালত	১ জন	

www.pathagar.com

		প্রাঙ্গণ-২টি টিএ রোডস্থ মঠ সংলগ্ন-১ টি সদর হাসপাতালের সামনে-১টি পৈরতলা বাসস্ট্যান্ড-১টি রেলওয়ে স্টেশন ২ নং প্লাটফর্ম-১টি মেড্ডা বাসস্ট্যান্ড-১টি		
২৯।	নোয়াখালী	মোট ৪টি পৌর এলাকায় কিরণ ও মোহাম'মদীয় হোটেলের মাঝে-১টি ডিসি অফিসের সামনে -১টি প্রেসক্লাবের সামনে-১টি বড় মসজিদ ট্রাফিক পয়েন্টে-১টি	১ জন	
৩০।	লক্ষ্মীপুর	মোট ৬ টি থানা মসজিদের সিঁড়ির নিকট-১টি পৌরসভার গেইটের পাশে-১টি ডিসি অফিসের এডিএম কোর্টের বারান্দায়-১টি জজ আদালতের সিঁড়ির নীচে-১ টি উপজেলা পরিষদের সিঁড়ির পাশে-১টি সরকারী কলেজে শহীদ মিনারের পাদদেশে-১টি	১ জন	-
৩১।	ফেনী	মোট ৪ টি কেন্দ্রিয় জামে মসজিদের দোতলার সিঁড়ি-১টি পৌরসভার নিকট পাবলিক টয়লেট-১টি মহিপালস্থ হীরা কনফেকশনারী দোকানের সামনে-১টি দাউদপুর ব্রীজের নিকট ড্রেনে-১টি	-	

রাজশাহী রেঞ্জ

৩২।	নব্যবগঞ্জ	মোট ৫ টি ডিসি অফিসের সামনে-১টি কোর্ট বিল্ডিং এর সামনে-১টি জেলা বারের মাঠের সামনে-১ টি মহানন্দা ব্রীজ এর পাশে-২টি বিশ্বরোড় মোড়-১টি	২ জন	১টি

৩৩।	নওগাঁ	মোট ৭টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ গাড়ী পার্কিং শেডে-১টি সহ জজ আদালতের নীচতলার বারান্দায়-১ টি ম্যাজিস্ট্যাট ভবনের বারান্দায়-১টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সামনের প্রবেশ পথে-১টি গোস্তহাটির মোড়ে রাস্তার পাশে-১টি লিটন ব্রীজের মোড়ে রাস্তার পাশে-১টি	-	

www.pathagar.com

		বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডের টিকিট কাউন্টারের সামনে-১টি		
৩৪।	নাটোর	মোট ৭টি জজকোর্টের সামনে খোলা জায়গায়-১টি বার সমিতির সামনে-১টি ট্রেজারী অফিসের বারান্দায়-১টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সিঁড়িতে-১টি মাদ্রাসা মোড়-১টি প্রেসক্লাবের সামনে-১টি ফ্রেন্স পেট্রোল পাম্পের সামনে-১টি	৯ জন এর মধ্যে ১ জন ট্রাফিক সার্জেন্ট	-
৩৫।	রংপুর	মোট ৮ টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চত্বর-২টি জজকোর্ট সংলগ্ন আইনজীবী সমিতি ভবনের পাশে-১টি কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল মসজিদের গেটের সামনে-১টি মডার্ন মোড়স্থ ব্র্যাক অফিসের সামনে-১টি সাতমাথা শহীদ মিনার সংলগ্ন স্থানে-১টি শহরস্থ গুপ্তপাড়া রাস্তার পাশে-১টি শাপলা চত্বর ধানের চাতালের খোলা জায়গায়-১টি	-	-
৩৮।	গাইবান্ধা	মোট ৮টি জজ আদালত প্রাঙ্গণ-২টি বার লাইব্রেরী-১টি ডিসি অফিস প্রাঙ্গণ-১টি পৌরসভা কেন্টিন-১টি বাসস্ট্যান্ডে-১টি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে-১টি	৬ জন	৩টি
৩৬।	নীলফামারী	মোট ১টি বাজারের ট্রাফিক মোড়-১টি	১ জন	৪টি
৩৭।	কুড়িগ্রাম	মোট ৬টি ডিসি অফিসের সামনে-১টি কোর্টের মোহরা শেডের পাশে-১টি জজকোর্ট ভবনের সামনে-১টি বাস টার্মিনালের প্রবেশ দ্বারে দেয়ালের পাশে-১টি শাপলা চত্বর শহীদ মিনারের পাশে-১টি দাদামোড়া জবা কাউন্টারের সামনে-১টি	-	৩টি

৩৮।	লালমনিরহাট	মোট ৫টি ডিসি ভবন এবং জজ ভবনের সামনে-৩টি বিডিআর রেলগেটের পাশে-১টি হাসপাতাল চত্বরে-১টি	-	-
৩৯।	দিনাজপুর	মোট ৯টি	২ জন	১টি

www.pathagar.com

		কেয়া পরিবহন কাউন্টারের রাস্তায়-১টি জেলগেটের সামনে-১টি সদর হাসপাতাল মোড়ে-১টি কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে-১টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সামনে-১টি চক্ষু হাসপাতালের বাইরে-১টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণের পশ্চিমে-১টি বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে-১টি মির্জাপুর বাসস্ট্যান্ডে-১টি		
৪০।	ঠাকুরগাঁও	মোট ৫টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাশে-১টি জজকোর্টের নীচতলার বারান্দায়-১টি জজকোর্টের দোতলার বারান্দায়-১টি আনারকলি বেকারীর সামনে-১টি আর্ট গ্যালারীর মোড়ে-১টি	-	১টি
৪১।	পঞ্চগড়	মোট ৪টি ডিসি অফিসের কাছাকাছি-২টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণে-২টি		
৪২।	পাবনা	মোট ৮টি জজ আদালত চত্বর-২টি ডিসি অফিস চত্বর-২টি অনন্ত মোড়-১টি নতুন বাস টার্মিনাল-১টি এডওয়ার্ড কলেজ গেট-১টি পৈলানপুর-১টি	৫ জন	
৪৩।	সিরাজগঞ্জ	মোট ৭টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ? ডিসি অফিস প্রাঙ্গণ? বাসস্ট্যান্ডের রাস্তায়? রাস্তার উপর	-	-
৪৪।	বগুড়া	মোট ৬টি জজকোর্ট ভবনের সামনে-১টি জজকোর্ট হাজতের পিছনে-১টি ডিসি অফিসের সামনে-১টি সাতমাথা মোড়-১টি বড়গোলা মোড়-১টি তিনমাথা মোড়-১টি	২ জন	

৪৫।	জয়পুরহাট	মোট ৭টি কোর্ট চত্বরে-৪টি	৩ জন	৪টি

www.pathagar.com

		সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন রাস্তায়-১টি বাস টার্মিনালের রাস্তায়-১টি কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে-১টি		

খুলনা রেঞ্জ

৪৬।	খুলনা	মোট ১টি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের কাছে কাদের হোটেলে-১টি	৩ জন	-
৪৭।	বাগেরহাট	মোট ৬টি নতুন কোর্ট চত্বর- ৩টি রেলওয়ে রোড-১টি দাসপাড়া মোড়-১টি মিঠাপুকুর পাড়-১টি	-	১টি
৪৮।	সাতক্ষীরা	মোট ৭টি বাসটার্মিনাল-১টি খুলনা রাস্তার মোড়- ১টি জজকোর্ট/ডিসি অফিস এলাকা-১টি নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-১টি	-	-
৪৯।	যশোর	মোট ৬টি কোর্ট বিল্ডিং-এর ভিতরে-২টি থানার সামনে- ১টি আইনজীবী সমিতির সামনে-১টি জজকোর্টের সামনে-১টি পালবাড়ির মোড়-১টি	১ জন	-
৫০।	মাগুরা	মোট ৪টি জজ আদালত প্রাঙ্গণে- ২টি সদর থানার সামনে-১টি ডিসি অফিস ও কলেজের মধ্যের রাস্তায়-১টি	-	১টি
৫১।	ঝিনাইদহ	মোট ৪টি ডিসি অফিসের সামনে-৪টি	-	১টি
৫২।	নড়াইল	মোট ৪টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ সেটেলমেন্ট অফিসের পাশে- রূপগঞ্জ টাউন ক্লাবের পাশে-	২ জন	৩টি
৫৩।	কুষ্টিয়া	৪টি ডিসি কোর্ট জজকোর্ট ইবি কম্পাউন্ডের মধ্যে	-	
৫৪।	চুয়াডাঙ্গা	৪টি সদর থানার পাশে- ১টি রেলওয়ে স্টেশনের পাশে- ১টি	২ জন	২টি

www.pathagar.com

		রেলবাজারের মাঠপট্টি-১টি জেলা কারাগারের পাশে-১টি		
৫৫।	মেহেরপুর	৭টি প্রেসক্লাবের সামনে-১টি হোটেল বাজার মোড়-১টি বাসস্ট্যান্ডে-১টি ডিসি অফিস চত্বর-৪টি	-	-

বরিশাল রেঞ্জ

৫৬।	বরিশাল	মোট ১২টি লাইন মোড়-১টি জেলখানা মোড়-১টি বিবির পুকুর পাড়-১টি ডিসি অফিস-১টি পোস্ট অফিস-১টি বাংলাবাজার-১টি বটতলা মসজিদ-১টি নতুন বাজার টেম্পু স্ট্যান্ড-১টি বরিশাল ক্লাব-১টি বিএম কলেজ মাঠ-১টি আমতলা রাস্তার মোড়-১টি শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ গেটের সামনে-১টি	৩ জন	
৫৭।	ঝালকাঠি	মোট ১টি উপজেলা ভবনের সিঁড়িপথে-১টি	৫ জন (এর মধ্যে ৪ জন পুলিশ সদস্য)	৬টি
৫৮।	ভোলা	মোট ২টি ডিসি অফিস-১টি দায়রা জজ আদালত ভবনের সামনে-১টি	-	-
৫৯।	পটুয়াখালী	মোট ৫টি ডিসি অফিসের সামনে-১টি জজ আদালত চত্বর-১টি পৌরসভা চত্বরের ভিতরে-১টি চৌরাস্থায়-১টি বিদ্যুৎ ও ফায়ার সার্ভিস গেট-১টি	-	১টি
৬০।	পিরোজপুর	মোট ৬টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-২টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বারান্দা-১টি উপজেলা পরিষদের বারান্দা-১টি	২ জন	-

www.pathagar.com

		রাজার হাটে-১টি কালিবাড়ির নিকট-১টি		

৬১।	বরগুনা	মোট ৭টি জজকোর্ট সংলগ্ন মসজিদ বারান্দায়-১টি কালেক্টরেট চত্বর-১টি হাসপাতাল মসজিদ সম্মুখে-১টি মাছ বাজার ব্রীজের নিকট-১টি সদরঘাট মসজিদের নিকট-১টি ইউএনও অফিস চত্বর-১টি	৪ জন	

সিলেট রেঞ্জ

৬২।	সিলেট	মোট ১২টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণ ও করিডোরে-৩ এডিএম কোর্টের বারান্দা-১টি নাইওরপুল পয়েন্টে-১টি আম্বরখানা-১টি রিকাবিবাজার মাজারের পাশে-১ কদমতলী বাস টার্মিনাল মসজিদ-১টি শাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাহ পরান হলের পিছনে-১টি শাহী ঈদগাহ পাহাড়ের চূড়ায়-১টি নয়াসড়ক পয়েন্টে-১টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদের পাশে-১টি	১ জন	২টি
৬৩।	হবিগঞ্জ	মোট ৭টি জজকোর্ট ছাদের উপর-১টি জজকোর্ট বার লাইব্রেরী করিডোর-১টি কালেক্টরেট ভবনের ছাদের উপরে-১টি নেজারত শাখার সামনে-১টি সোনালী ব্যাংকের সামনে পার্কে-১টি ঈদগাহ মাঠে-১টি পৌরসভা সুপার মার্কেটের ছাদের উপর-১টি	-	
৬৪।	সুনামগঞ্জ	মোট ৮টি জজকোর্টের ছাদের উপর সিঁড়িতে-২টি ডিসি অফিসের বাথরুমে-১টি বার লাইব্রেরীর সিঁড়িতে-১টি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে-১টি রাজগোবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে-১টি	-	

www.pathagar.com

		মল্লিকপুর ব্রীজের পাশে-১টি		
৬৫।	মৌলভী-বাজার	মোট ৭টি জজকোর্ট প্রাঙ্গণে-২টি কালেক্টরেট চত্বর-২টি পৌরসভা চত্বরে-১টি কুসুমবাগ এলাকায়-১টি ডিসি মার্কেটের সামনে-১টি	-	-

রেলওয়ে রেঞ্জ

৬৬।	জিআরপি, চট্টগ্রাম	মোট ৩টি ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনের বিশ্রামাগারের সামনে-১টি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১ম শ্রেণীর কাউন্টারের সামনে-১টি কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফরমের পূর্বদিকে-২টি	১ জন	-
৬৭।	জিআরপি, সৈয়দপুর	মোট ২টি রাজবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন ওভার ব্রীজের নীচে-২টি	-	১টি
মোট		মোট ৪৩৪টি	১০৪ জন	৫১টি

সর্বমোট

নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	গ্রফতারের সংখ্যা	বিস্ফোরিত বোমার সংখ্যা	অবিস্ফোরিত বোমার সংখ্যা
২ জন ঢাকা জেলায় ছালাম (১১) নবাবগঞ্জ জেলায় রবি (২০)	১০৪ জন	৪৭ জন	৪৩৪টি	৫১টি

www.pathagar.com

১৭ আগস্ট ২০০৫ জেএমবি কর্তৃক দেশব্যাপী বোমা হামলার চিত্র। ছবি : ডেইলী স্টারের সৌজন্যে

১৭ আগস্টের পর শূরা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এবং আত্মঘাতী বোমা হামলার সিদ্ধান্ত

সেপ্টেম্বর ২০০৫ মাসের মাঝামাঝি শায়খ আবদুর রহমানের নির্দেশে বাসাবোর পাটোয়ারী গলিতে ভাড়াকৃত বাসায় খালেদ সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে শূরা সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে খালেদ সাইফুল্লাহসহ হাফেজ মাহমুদ, সালাউদ্দিন, আউয়াল এবং সানী উপস্থিত ছিল। শায়খ আবদুর রহমান এবং বাংলাভাই নিরাপত্তার স্বার্থে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেনি। বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বিচারকদের উপর

www.pathagar.com

আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো। উক্ত বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেয়া সকলকে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য বলা হয়। এছাড়া প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার গতানুগতিক ধারার পরিবর্তনের ব্যাপারেও আলোচনা হয়। অক্টোবর ২০০৫ থেকে ফেদায়ী পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বনশ্রীর বাসায় আউয়াল, সানী এবং শায়খ আবদুর রহমান আলোচনায় বসেন। উক্ত আলোচনায় আব্দুল আউয়াল আত্মঘাতী বোমা হামলার কোন দলিলাদি আছে কিনা তা জানতে চাইলে আবদুর রহমান তাকে এ ব্যাপারে পরবর্তীতে জানাবেন বলে জানান। এর কিছুদিন পর আবদুর রহমান আব্দুল আউয়াল এবং অন্যান্য শূরা কমিটির সদস্যদের মোবাইলের মাধ্যমে জানান, তিনি আত্মঘাতী হামলার দলিল পেয়েছেন যা পরবর্তীতে সাক্ষাতের সময় দেখানো হবে। এরই প্রেক্ষিতে শূরা কমিটির সকলেই তাদের পরবর্তী হামলা ফেদায়ী তথা আত্মঘাতী পদ্ধতিতে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৭ আগস্ট ২০০৫ পরবর্তী জেএমবি কর্তৃক আত্মঘাতীসহ বিভিন্ন বোমা হামলা মূলত শায়খ আবদুর রহমানের নির্দেশে এবং আতাউর রহমান সানী কর্তৃক সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা/জোন কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়

আত্মঘাতী বোমা হামলা

চট্টগ্রামে বোমা হামলা : গত ৩ অক্টোবর ২০০৫ আনুমানিক বেলা ১২টা থেকে সোয়া ১২টার মধ্যে চট্টগ্রামের আদালত এজলাসে দুটি এবং এজলাসের বাইরে একটি বোমা হামলা করা হয়। জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য মো: লাল্টু (১৮), সাহাদাত হোসেন (২৫) ও সোহেল (২৫) এ হামলা চালায়। উক্ত হামলায় দুই জন আহত হয়। হামলার পর পালানোর সময় একটি বোমাসহ হামলাকারী তিন জন এবং পরবর্তীতে নগরীর চৈতন্যগলি থেকে আরো ৩ জনসহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনার পর প্রায় দুই মাসের মাথায় অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর ২০০৫ আনুমানিক সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম জেলা জজ কোর্টের প্রবেশ মুখে পুলিশি তল্লাশির সময় আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য হোসেন আলী (১৬) এ হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ২ জন নিহত এবং আত্মঘাতী হামলাকারীসহ (পরবর্তীতে নিহত) অনেকে আহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মারাত্মক আহত অবস্থায় আত্মঘাতী হামলাকারীকে গ্রেফতার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চাঁদপুরে বোমা হামলা : ৩ অক্টোবর ২০০৫ আনুমানিক বেলা ১২টা ৫ মিনিটে চাঁদপুর জেলা জজ আদালত এজলাসে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। জেএমবি'র সদস্য আবুল কালাম (১৯) এবং সোহরাব হোসেন বিশ্বাস (২১) উক্ত হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ১ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়। ঘটনার পর হামলাকারী দুইজনসহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

লক্ষীপুরে বোমা হামলা : ৩ অক্টোবর ২০০৫ আনুমানিক বেলা ১২টায় লক্ষীপুর জেলা জজ কোর্টের ভিতরে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। জেএমবি সদস্য মামুন (২০) উক্ত হামলা চালায়। হামলায় ১ জন নিহত ও আনুমানিক ৩০ জন আহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ হামলাকারী মামুনকে গ্রেফতার করে।

ঝালকাঠির বোমা হামলা : ১৪ নভেম্বর ২০০৫ আনুমানিক সকাল ৯টায় ঝালকাঠি জেলার সদর থানার কোয়ার্টার পল্লী এলাকায় বিচারকদের বহনকারী মাইক্রোবাসে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়। জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য মামুন আলী (২৩) এই

www.pathagar.com

হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ২ জন জেলা জজ নিহত এবং আত্মঘাতীসহ আরো ৩ জন আহত হয়। ঘটনার পর হামলাকারী জেএমবি সদস্য মামুনকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে এবং হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে তাকে আসামী করে ঝালকাঠি থানায় মামলা হয়।

গাজীপুরে বোমা হামলা : গত ২৯ নভেম্বর ২০০৫ আনুমানিক সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে গাজীপুর জেলা আদালত ভবনের সামনে আইনজীবী সমিতির কক্ষে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। উক্ত হামলায় আত্মঘাতী, এডভোকেট, বিচারপ্রার্থীসহ ৭ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা হামলার আলামত হিসেবে জালের কাঠি, ইলেকট্রিক তার, ব্যাটারীসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে। হামলাকারীকে শনাক্ত করা যায়নি। তবে পরবর্তীতে সে জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ঘটনার দুই দিন পর অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর ২০০৫ সকাল ১১টা থেকে ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রবেশ মুখে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। উক্ত হামলায় ১ জন নিহত এবং সাংবাদিক, পুলিশ, আইনজীবী, সাধারণ জনগণসহ কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়। উক্ত হামলায় জেএমবি'র আত্মঘাতী দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাককে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করে। অবশ্যই এসকল বোমা হামলাকে জেএমবি ও মিডিয়াগুলো আত্মঘাতী বললেও প্রথম দিকের বোমা হামলায় জেএমবি সদস্যরা বোমাগুলো ছুঁড়ে মেরেছে এবং পালানোর চেষ্টা করেছে। কাজেই সকল বোমা হামলাকে আত্মঘাতী বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বিচার্য বিষয়।

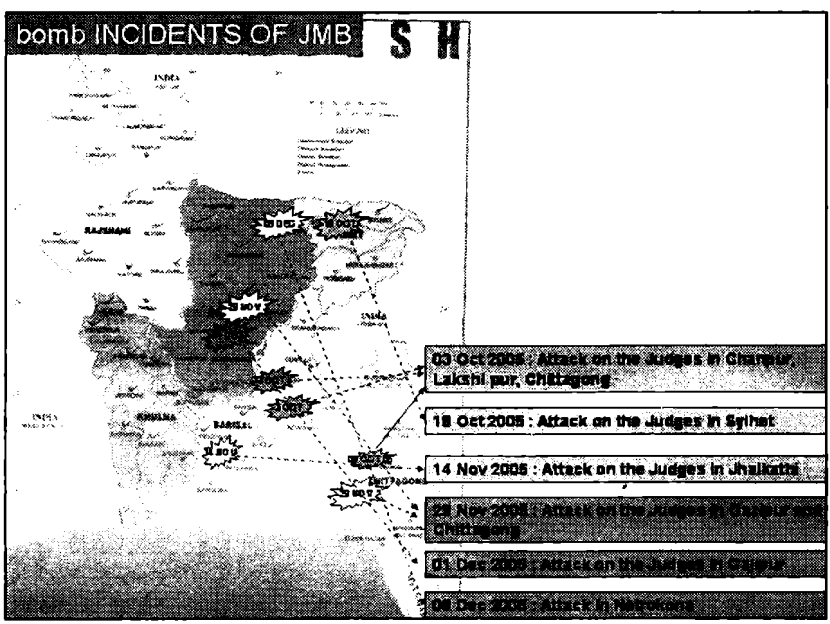

জেএমবি'র বিভিন্ন আত্মঘাতী বোমা হামলার স্থানসমূহ

www.pathagar.com

জেএমবি'র রাজনৈতিক যোগাযোগ

রাজশাহীতে বাগমারা অপারেশনের মাধ্যমেই জেএমজেবি'র নাম দেশবাসী জানতে পারে। আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই জেএমবি'র সাথে বর্তমান সরকারের যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবী করে বলে, জেএমবি আসলে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সৃষ্টি। তাদের মতে, সরকার তাদের নানামুখী ব্যর্থতা ঢাকতে এই ১৭ আগস্ট বোমা হামলা ঘটনার জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার শুরুতে জেএমবি'র অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। প্রথম দিকে এটাকে তারা মিডিয়ার সৃষ্টি বলে চালানোর চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে মিডিয়ার ব্যাপক লেখালেখির ফলে প্রধানমন্ত্রী বাংলাভাইকে ধরার নির্দেশ দেয়। এক সময় তারাও জেএমবিকে আওয়ামী লীগ ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসরদের সৃষ্টি বলে দাবী করে। এই পারস্পরিক দোষারোপের ফলে জনগণের মাঝে ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের মনে এ প্রশ্ন রয়েই যায়, আসলেই জেএমবি'র সাথে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ ছিল কিনা? প্রশ্নটির উত্তর অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই বহুভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাচাই করা হয়েছে। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের জন্ম ও এর মুখোশ উন্মোচনে প্রশ্নটির জবাব দেয়া খুবই জরুরী। বিশেষ করে জেএমবি'র মূল হোতা বা গডফাদারদের শনাক্তকরণে এ প্রশ্নটির উত্তর এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই।

জেএমবি ও বিএনপি

পূর্বেই বলা হয়েছে, জেএমবি বা জেএমজেবি'র প্রথম আত্মপ্রকাশ রাজশাহীর বাগমারায়। মূলত সর্বহারা নির্মূল অভিযানের মাধ্যমে জেএমবি প্রকাশ্যে আসে। শুরু থেকে কিছু মিডিয়ায় জেএমবি'র নাম উচ্চারিত হলেও সাধারণ মানুষ এদের সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে জেএমবি যে এমন একটি ভয়ানক জঙ্গী সংগঠন মানুষ তা ঘূণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেননা, সেটা জানতে পারলে বাগমারায় জেএমবি'র সর্বহারা নির্মূল অভিযান এতোটা জনপ্রিয় হতো না বা জেএমবি'র সাথে সাধারণ মানুষের জনসম্পৃক্ততা এতো গভীর হতো না। উত্তরাঞ্চলের জনগণ সর্বহারা সদস্যদের খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপকর্মে অতিষ্ঠ ছিল। পুলিশের কাছে আশ্রয় চেয়ে তারা এর কোনো সমাধান পায়নি। শুধু পুলিশের দুর্নীতির কারণে নয়, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশও ছিলো অসহায়। কাজেই নিরুপায় জনগণের কাছে বাংলাভাই যেন কোনো রবিনহুডের মতো আবির্ভূত হয়। সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসও সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছিলেন, বাংলাভাই বাগমারার জনগণের কাছে রবিনহুডের মতো জনপ্রিয় ছিল। শুধু সাধারণ জনগণ নয়, সর্বহারাদের অত্যাচারের কাছে সরকারী দলের লোকজন এমনকি এলাকার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীগণও ছিল অসহায়। সরকারী দলের এক প্রতিমন্ত্রীর ভাতিজাকে নির্মমভাবে খুন করেছিল সর্বহারা সদস্যরা। মন্ত্রীত্বে থেকেও ভাইপো'র হত্যাকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে পারেননি তিনি। শুধু তাই নয়, এক প্রতিমন্ত্রীকে কাফনের কাপড় দিয়ে চিরকূট দিয়েছিল সর্বহারা সদস্যরা। তাদেরকেও চিহ্নিত করতে পারেননি তিনি। র‍্যাব সৃষ্টির আগে এই সর্বহারাদের দমনের কথা দেশবাসী কখনো ভাবতেও পারেনি। সেই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাই যখন Vigilant Operation এর মাধ্যমে সর্বহারা দমনের প্রস্তাব নিয়ে আসে তখন তাদের উদ্যোগকে হয়তো বাধ্য হয়েই সমর্থন দিয়েছিলেন সরকারেরই উত্তরাঞ্চলীয় কোনো কোনো সরকার দলীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি ও নেতা-কর্মী। ফলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে জেএমবিকে সমর্থন দান অনেকটা সহজ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে– যা কিনা সরকারকে

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বেশ খানিকটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। ধৃত জেএমবি সদস্যগণ জানিয়েছে, তারা তাদের অপারেশনে সরকারের দু'একজন প্রতিমন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছিল। উল্লেখ্য, জেএমবি'র অভিযান ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অপারেশনে সর্বহারা সদস্যদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র উদ্ধার করা হতো সেগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হতো এবং ধৃত সর্বহারা সদস্যদেরও পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হতো।

অবশ্য সরকারের এই দু'একজন প্রতিমন্ত্রীর বা কোনো পুলিশ সুপারের সমর্থন এটা প্রমাণ করে না যে জেএমবি জোট সরকারের সৃষ্টি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকার বা জনগণ কেউই তখন এই জেএমবি ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারেনি। কেননা, চরম বামপন্থী রাজনৈতিক ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠা প্রতিমন্ত্রী জেএমবি'র মতো ইসলামের নামধারী জঙ্গী সংগঠন তৈরী করবেন এটা অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে, ক্ষমতায় আসার পর থেকে জোট সরকারকে একটি মহল দেশ-বিদেশে সবচেয়ে বেশী যে কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে তা হচ্ছে এই 'মৌলবাদের' উত্থান। কাজেই জেএমবি'র জন্ম দিয়ে জোট সরকার পুনরায় নিজের পায়ে কুড়াল মারবে এটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

জেএমবি ও আওয়ামী লীগ

আ.লীগের পাল্টা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সবসময় অভিযোগ করে এসেছে যে, ১৭ আগস্ট বোমা হামলা আ.লীগ ও তাদের 'প্রভুদের' কাজ। তারা অভিযোগ করেছে আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে আ.লীগ তাদের বিদেশী প্রভুদের সাহায্যে জেএমবি'র জন্ম দিয়েছে। এটা প্রমাণে তারা সামনে নিয়ে এসেছে যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম এমপি'র সাথে জেএমবি আমীর শায়খ আবদুর রহমানের আত্মীয়তার সম্পর্ক।

সন্দেহ নেই যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম এমপি'র সাথে শায়খ আবদুর রহমানের আপন শালা-দুলাভাই সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এতেই কি প্রমাণিত হয় যে, জেএমবি আ.লীগের সৃষ্টি কিংবা জেএমবি'র সাথে মির্জা আযমের সম্পর্ক ছিল? শুধু আত্মীয়তার ভিত্তিতে কি কাউকে অপরাধী করা উচিত? ইসলাম বা বিশ্বে প্রচলিত কোনো মানবিক আইনের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সূত্রে কেউ অপরাধী বলে বিবেচিত হতে পারে না। আ.লীগের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলের পক্ষে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য দেশে জঙ্গীবাদের জন্ম দেবে বিশেষ করে ইসলামের নামে তা অবিশ্বাস্য বৈকি। সবচেয়ে বড় কথা, আ.লীগের সাথে জেএমবি'র সম্পর্ক ছিল এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ধৃত জেএমবি সদস্যদের কেউ জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেনি যে, তাদের সাথে আ.লীগের সম্পর্ক ছিল।

জেএমবি ও জামায়াত

জেএমবি'র উদ্ভবে সবচেয়ে যে দলটির নাম বেশী উচ্চারিত হয়েছে তার নাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, পেশাজীবী সমাজ, এমনকি জোটের প্রধান শরীক দল বিএনপিরও বেশ কিছু নেতা জেএমবি'র উত্থানের পেছনে জামায়াতকে দায়ী করে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছে। এর পেছনে একটা যুক্তিও আছে। জেএমবি মূলত আহলে হাদীস নির্ভর সংগঠন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমর্থকদের একটা বিরাট অংশ আহলে হাদীস সমর্থক। তাছাড়া জেএমবি'র আমীর, মজলিসে শূরা, এহসার, গায়েরে এহসার সাধারণ সদস্য– এ পর্যন্ত যারা ধরা পড়েছে তাদের বেশীর ভাগই জীবনের কোনো না কোনো সময় জামায়াতের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। আমীর শায়খ আবদুর রহমান, শূরা সদস্য বাংলাভাই,

www.pathagar.com

সামরিক কমান্ডর আতাউর রহমান সানী জেএমবিতে যোগদানের পূর্বে জামায়াতের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। কাজেই এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, জেএমবি'র উত্থানের সাথে জামায়াতের কোনো ভূমিকা আছে কিনা?

উত্তরটি নেতিবাচক। কারণ জেএমবি'র উত্থানের সাথে জামায়াত জড়িত এমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেএমবি'র অধিকাংশ নেতা-কর্মী সাবেক জামায়াতী হলেও বর্তমান জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন কেউ জেএমবি'র সাথে জড়িত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দলীয়ভাবে জামায়াত জেএমবিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণও নেই। বরং জেএমবি'র উত্থানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে রাজনৈতিক দলটি তার নাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। কাজেই জামায়াত জেএমবি তৈরী করে নিজেই নিজের কবর খুঁড়বে এতো অপরিপক্ক রাজনৈতিক দল তারা নয়।

জেএমবি ও অন্যান্য ইসলামী জোট

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে জেএমবি'র সাথে অন্যান্য ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে যারা কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন তাদের সম্পর্ক নিয়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, আক্বীদাগত কারণে জেএমবি'র সাথে অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর সম্পর্ক থাকার কোনো সুযোগ ছিল না। সে কারণে এই ধারার কোনো ইসলামী রাজনৈতিক নেতা ও আলেম-ওলামা জেএমবির বোমা হামলাকে জিহাদ বা ইসলামী কর্মকাণ্ড বলে সার্টিফিকেট দেয়নি। এসব ইসলামিক দলের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায়, তারা যদি বিশ্বাস করতেন যে এটা জিহাদ বা জেএমবি সঠিক পথে আছে তাহলে তারা হাজারো চাপের মধ্যে সে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। বরং তারাই জেএমবি'র বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করে, সংবাদপত্রে লিখে দেশবাসীকে সতর্ক করেছে এ বলে যে, জেএমবি আসলে ইসলামের সহায়ক কিছু নয়। এরপরও জেএমবি'র কিছু সদস্য কওমী ধারার থেকে এসেছে। এদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, এই অংশটি মূলত আফগান ফেরত হরকাতুল মুজাহিদীনের সদস্য বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। জিহাদের তামান্না নিয়ে যারা আফগান যুদ্ধে গিয়েছিল, আফগান যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তারা হরকাতুল জিহাদ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হলেও বাংলাদেশে ইসলামী জিহাদের ব্যাপারে তাদের কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু জেএমবি গঠিত হবার পর জিহাদি জোশে এদের কেউ কেউ জেএমবিতে যোগ দেয় বা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বোমাবাজির সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। মুফতি হান্নান বা খালেদ সাইফুল্লাহ তাদেরই নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুফতি হান্নান বা খালেদ সাইফুল্লাহ বা তাদের মতো অন্য যারা এই ধরনের নাশকতার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়ার সাথে সাথে হরকাতুল জিহাদ নেতারা তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে এবং সেটা সম্ভব না হলে তাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে বলে জানা গেছে।

জেএমবি'র সাথে বিদেশী কানেকশন

জেএমবি'র সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক এই প্রবন্ধের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। মূলত আবদুল করিম টুণ্ডার মাধ্যমে পাকিস্তানের লস্করই তৈয়বার সাথে জেএমবি'র যোগাযোগ হয়। লস্কর-ই তৈয়বা জেএমবি'র কয়েকজন সিনিয়র সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়। সামান্য কিছু আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিল যা পূর্বেই জানানো হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো যখন মুসলমানদের উপর কোনো ষড়যন্ত্র করেছে তখন তারা কোনো মুসলমান বা মুসলিম দেশের সহায়তা নিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশেই

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী শক্তির অনুচর ও অনুগত সংস্থা রয়েছে। কাজেই ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো যখন কোনো মুসলিম দেশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তখন তারা অপর মুসলিম দেশে অবস্থিত এসব অনুগত সংস্থা বা অনুচরদের সাহায্য নেয়। এতে করে আক্রান্তরা বেশীর ভাগ সময়ই বুঝতে পারে না যে, এটা আসলে কোনো ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র। এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে এ রকম বহু ষড়যন্ত্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এখানে জেএমবি'র সাথে অন্যান্য দেশের যোগাযোগের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

জেএমবি'র যুক্তরাজ্য কানেকশন

২০০৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দুই ব্রিটিশ নাগরিক জেএমবি'র সিলেট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত দেলোয়ারের সাথে যোগাযোগ করেন। এ দুই নাগরিক হচ্ছে সাজ্জাদ (৩০) ও হাবিবুর রহমান (৩৫)। তারা উভয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। এ দুইজন ব্রিটিশ নাগরিক দেলোয়ারের মাধ্যমে আবদুর রহমানের সাক্ষাৎ কামনা করে। কিন্তু ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় সে যাত্রায় সাজ্জাদ আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। সে সিলেট থেকেই আবদুর রহমানের সাথে টেলিফোনে কথা বলে এবং ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে সরাসরি ব্রিটেনে চলে যায়। পরবর্তীতে হাবিবুর রহমান সালাউদ্দিনের মাধ্যমে ঢাকায় আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে। হাবিবুর রহমান জানায়, যুক্তরাজ্যের আল মুহাজেরুন নামক জিহাদী সংগঠনের নেতা ওমর বাকরী তাদের আন্দোলনে সহায়তা করতে চায়। উক্ত সাক্ষাতের সময় তিনি একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ওমর বাকরীর কিছু জিহাদী সিডি নিয়ে আসেন এবং সেগুলো আবদুর রহমানকে হস্তান্তর করেন। তাছাড়া সাজ্জাদ ব্রিটেনে গিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে ওমর বাকরীর সাথে আবদুর রহমানের কথা বলিয়ে দেন। ২০০৫ সালের জুন মাসে সিলেট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সালাউদ্দিনের মাধ্যমে উল্লিখিত দুইজন ব্রিটিশ নাগরিকের সাথে পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত জনৈক আবদুর রহমান বাংলাদেশে আসেন এবং শায়খ আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ মাসের ২৫ তারিখে সকাল ৭টার দিকে শায়খ রহমান মোবাইলে রাজারবাগে গ্রীন লাইনের ভলভো কাউন্টার থেকে দুইজন ব্রিটিশ নাগরিককে রিসিভ করে বাসায় নেবার জন্য সানীকে বলে। ঐদিন বেলা দুইটার সময় শায়খ রহমান সানীর বাসায় আসে। বেলা ৪টার দিকে সানী ভলভো কাউন্টার থেকে সাজ্জাদ ও আবদুর রহমান নামে দুই বিদেশীকে রিসিভ করে সিএনজি যোগে বাসায় নিয়ে যায়। বাসায় আবদুর রহমানের সাথে তাদের কুশল বিনিময় হয়। এরপর ২০-২৫ মিনিট বৈঠক চলে। বৈঠকে সানীও উপস্থিত ছিল। বৈঠকের পর তারা রাতে হোটেলে থাকার জন্য সিএনজি নিয়ে জোনাকী হোটেলের উদ্দেশে রওনা হয়। অবশ্য তারা রাতে কোথায় থাক তা জেএমবি'র কেউ জানতো না। পরের দিন সানী আবার মোবাইলে যোগাযোগ করে বিকাল ৫টার সময় একই ভলভো কাউন্টার থেকে বিদেশী দুইজনকে রিসিভ করে বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি রুমে তারা বৈঠকে বসে। বৈঠকে বিদেশীদ্বয় জেএমবির কার্যক্রম আরো জোরালোভাবে করার জন্য বলে। ঐদিন রাতে তাদের বাড়িতেই অবস্থান করে। পরের দিন তারা সকাল ১০টায় বাসা থেকে বের হয়ে ঢাকার আড়ং এবং কারিতাস থেকে হস্তশিল্পের জিনিস কেনার নামে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা ৭টার দিকে আবার বাসায় ফিরে আসে। রাতে তারা বাসায় থাকে এবং পরদিন সকাল ৭টার দিকে হোটেলে ওঠার কথা বলে জোনাকী সিনেমা হলের উদ্দেশে সিএনজি নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ঐ সময় তারা কোথায় ছিল তা জেএমবি'র সদস্যগণ জানতো না।
যাই হোক, এই বৈঠকের সময় আবদুর রহমান জেএমবি'র কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের

www.pathagar.com

ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা নিজেদেরকে আল কায়েদার সহযোগী যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোনো একটি জিহাদী সংগঠনের সদস্য বলে দাবী করে। তারা জেএমবিকে অন্যান্য আন্তর্জাতিক জিহাদী সংগঠনের সাথে আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কাজ করার প্রস্তাব দিলে শায়খ তাতে সম্মতি দেন। এছাড়াও তারা তাদের সংগঠনের জন্য বাংলাদেশে অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রশিক্ষণের ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে আবদুর রহমানের সহায়তা কামনা করে। তারা আবদুর রহমানকে জেএমবি'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ হাজার পাউণ্ড প্রদান করে এবং সেই সাথে বগুড়ার সারিয়াকান্দির পান্থপাড়া চরে জেএমবি'র বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ অবলোকন করে। উল্লেখ্য, ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার সময়ও তারা এদেশে অবস্থান করেছিলেন এবং টানা তিন মাস বাংলাদেশে অবস্থানের পর ১৭ আগস্টের বোমা হামলার কিছুদিন পর তারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। তবে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার পরও জেএমবি নেতারা চিঠি ও ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতো। আত্মঘাতী বোমা হামলার পর সারা দেশে জেএমবি'র নেতাকর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলে তারা বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য থেকে আগত উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কাছে টেলিফোনে পরামর্শ চেয়ে পাঠান। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে তারা সালাউদ্দিনের কাছে দিকনির্দেশনা সম্বলিত তিন পৃষ্ঠার একটি ই-মেইলে প্রেরণ করে। উক্ত ই-মেইলে তারা জেএমবিকে জিহাদী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস, সংস্থা, র‍্যার ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গের উপর হামলা ও আক্রমণ পরিচালনা এবং তাদের অপহরণের নির্দেশ দেয়।

এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয়, উল্লিখিত ব্রিটিশ নাগরিকদ্বয় জেএমবি'র অপারেশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বিশেষ করে, ২০০৫ সালের জুন মাসের প্রথম থেকে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর পর্যন্ত তাদের বাংলাদেশে অবস্থান, জেএমবি নেতাদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক, ১০ হাজার পাউন্ড অর্থ সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ জেএমবি'র সাথে তাদের সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে। বিশেষ করে, ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলার সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আর বাংলাদেশে তারা কোনো বিদেশী সংস্থার হয়ে জেএমবিকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছিল। বাংলাদেশ ও ইসলাম বিরোধী এই সংগঠন হতে পারে 'র', 'মোসাদ', সিআইএ, এমআই সিক্স কিংবা এদের সমন্বিত প্রয়াসও হতে পারে। এ সকল ইসলাম বিরোধী সংগঠনের এ ধরনের নানা অপকর্মের উদাহরণ এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় জেএমবি বা জঙ্গীবাদ বাংলাদেশে নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়। বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া সাম্রাজ্যবাদীদের একটি ষড়যন্ত্র।

জঙ্গীবাদের সাথে বাণিজ্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ৯/১১-এর পর সারা বিশ্বে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি নির্মাণ কোম্পানীগুলো ব্যাপকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর বাংলাদেশে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির ব্যবহার ও দাম এক লাফে কয়েকশত গুণ বেড়ে গেছে। উল্লেখ্য, এসব নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির বেশীর ভাগ তৈরী করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

সৌদী যোগাযোগ

হাম্মাম নামে জনৈক সৌদী নাগরিক ২০০৪ সালে বাংলাদেশে এসে প্রথমে আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে তাকে বগুড়ায় জেএমবি'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। মি. হাম্মামকে আহলে হাদীস পরিচালিত বিভিন্ন মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঐ সকল মাদ্রাসার ভিডিও চিত্র ধারণ করে তাকে দেয়া হয় যাতে

www.pathagar.com

তিনি সৌদী আরব থেকে সাহায্য আনতে পারেন। উক্ত সৌদী নাগরিক বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে তার ব্যবহৃত দামী মোবাইল ফোন এবং নগদ ৭ হাজার টাকা জেএমবি সদস্যদের দিয়ে যান। সৌদী আরবের রিয়াদস্থ আল কাসিম কোম্পানীতে চাকরি করেন আবদুর রহমানের ছোট ভাই ওলিউর রহমান। ওলিউর রহমান জেএমবি'র অন্যতম পরামর্শক ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিভিন্ন সময় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে যোগাযোগ সহায়তা ছাড়াও নগদ ৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জেএমবি'র তহবিলে। এছাড়াও সৌদী প্রবাসী জনৈক শাহ আলম ৩/৪ বারে ৩-৪ লক্ষ টাকা দিয়েছিল।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ইসলামিক এনজিও রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির দাওয়া বিভাগের পরিচালক আকরামুজ্জামানের সাথে আবদুর রহমানের সম্পর্ক ছিল। আবদুর রহমান আকরামুজ্জামানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে অনেক জিহাদী বই সংগ্রহ করেন। এছাড়াও এনজিওটি আবদুর রহমানকে তার গ্রামের বাড়িতে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করে।

জেএমবি'র ইন্ডিয়া কানেকশন

১৯৯৬ সালে ঢাকার পল্টনস্থ এশিয়া ড্রাগন ট্রাভেল এজেন্সি অফিসে মাওলানা ইসহাকের মাধ্যমে আবদুল করিম টুণ্ডা প্রথম আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ বৈঠকে ইসহাক সাহেবকে আবদুর রহমান ওলিউরের ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দেন। এক সপ্তাহ পরে যাত্রাবাড়ি বটতলা মাদ্রাসা ছাত্রদের মেসে আবদুর রহমানের সাথে টুণ্ডা দ্বিতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ করেন এবং জিহাদের বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐ বৈঠকে টুণ্ডা

ওরিকা কোম্পানির ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড, গোমিয়া লেখা ভারত থেকে আমদানীকৃত পাওয়ার জেল

আবদুর রহমানকে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহায়তার আশ্বাস দেন। তারা উভয়েই যোগাযোগের জন্য ঐ মাদ্রাসার ছাত্র সানাউল্লাহকে ব্যবহার করতো। ১৯৯৭ সালে আবদুর রহমান টুণ্ডার সাথে চট্টগ্রামের ঝাউতলা আহলে মসজিদে গমন করেন এবং এখানে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। টুণ্ডা কৌশলে আবদুর

www.pathagar.com

রহমানকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পরিবর্তে পাকিস্তানে যেতে রাজি করান। তিনি এ ব্যাপারে সব ব্যবস্থা করে দেবেন জানিয়ে আবদুর রহমানকে ভিসা পাসপোর্ট তৈরী করার নির্দেশ দেন। ঐ বছরই আবদুর রহমান টুণ্ডার ব্যবস্থাপনায় দিল্লী হয়ে পাকিস্তান যাবার লক্ষ্যে বেনাপোল-হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং দুই বছর আগে থেকে কোলকাতায় বসবাসকারী তারই ভাই ওলিউরের বাসায় ওঠেন। কিন্তু সে যাত্রায় আবদুর রহমানের পক্ষে আর পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এখানে উল্লেখ্য, আবদুর রহমানের ভাই ওলিউর রহমান ১৯৯৬ সাল থেকে টুণ্ডার ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাসায় লেখাপড়ার ছদ্মাবরণে ভারতের কোলকাতায় দুই বছর অবস্থান করেছিলেন। জেএমবিকে অপারেশনে নামিয়ে দিয়ে টুণ্ডা রহস্যজনকভাবে আর তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। ২০০২ সালে টুণ্ডার সাথে আবদুর রহমানের শেষ সাক্ষাৎ হয়। তবে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার আগে আবদুর রহমান টুণ্ডার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সফল হননি।

১৯৯৮ সালের প্রথমদিকে টুণ্ডা লেখাপড়ার ছদ্মাবরণে হাফেজ মাহমুদ ও আবদুল মতিনকে মুর্শীদাবাদ জেলার লালগোলায় প্রেরণ করেন। ভারতে যাওয়ার পর তারা কোলকাতার মিটিয়াব্রুজ থানার হালদারপাড়া আহলে হাদীস মসজিদের খতীব আইনুল বারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে আইনুল বারীর সহযোগিতায় নদীয়ার পলাশী মাদ্রাসায় ভর্তি এবং ৮ মাস সেখানে লেখাপড়া করে। এ সময় হাফেজ মাহমুদ নদীয়ার দেবগ্রামের বাসিন্দা জনৈক লবির'র বাড়িতে লজিং থাকতো। সে সময় টুণ্ডা তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্য এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য নির্দেশ দেয়। মূলত ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ আনার ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন ও জ্ঞান লাভই এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল।

১৭ আগস্ট বোমা হামলা করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। 'অপারেশন পারপেল' নামে এই পরিকল্পনা করে গোয়েন্দা সংস্থাটি।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার অভিযোগে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতারকৃত ভারতীয় নাগরিক নাসির উদ্দিন দফাদার বলেন, "আমি ভারতীয় নাগরিক। আমি ভারতের একটি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে ইমামতি করতাম। সে সময় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার জনৈক কর্মকর্তার সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি গোয়েন্দা সংস্থার চাকুরি নিই এবং ট্রেনিং গ্রহণ করি। অস্ত্র চালনা থেকে শুরু করে কমান্ডো হামলা পর্যন্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত হবার পর আমাকে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে এসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করে তার রোকন হবার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি নির্দেশ মোতাবেক জামায়াতে যোগদান করি। ১৯৯৫ সালে আমাকে আহলে হাদীস-এর সাথে যোগদান করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি আহলে হাদীসে যোগদান করি। ২০০৩ সালে আমাকে শায়খ আবদুর রহমানের জামায়াতুল মুজাহিদীনের সাথে যোগদান করতে বলা হয়। আমি নির্দেশ মোতাবেক তার দলে যোগদান করি এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্যাডারদের ট্রেনিং দিই। আমার পরিবার ভারতেই আছে, ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় আমি সরাসরি জড়িত।" (আমার দেশ: ২৬-০৮-২০০৫)।

ভারতের আরেক নাগরিক গিয়াসউদ্দিন এই সিরিজ বোমা হামলার সাথে জড়িত বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। গিয়াসউদ্দিনও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের নির্দেশ মোতাবেক বাংলাদেশে তার দায়িত্ব পালন করে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেনিংপ্রাপ্ত আরেক ভারতীয় নাগরিক ডা. এস এম মাসুদ বিন ইসহাক গ্রেফতার হলে পুলিশকে সে সিরিজ বোমা হামলার বিস্তারিত তথ্য দেয়। 'র'-

www.pathagar.com

এর নির্দেশে সে জেএমবিতে যোগ দেয় এবং ২০০৩ সালে জেলা আমীরের পদপ্রাপ্ত হয়। (নয়াদিগন্ত : ১৯-৯-০৫)। বোমা হামলার ব্যাপারে সে পুলিশকে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়। ভারতীয় আরেক নাগরিক গ্রেফতার হবার পর পাগলের ভান করে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে সে ভয়ঙ্কর সব তথ্য পরিবেশন করে। হাইকোর্ট মাজার থেকে গ্রেফতারকৃত আরেক ভারতীয় নাগরিক সিরিজ বোমা হামলার সাথে জড়িত। সরকারের স্পর্শকাতর স্থাপনার উপর বোমা হামলার দায়িত্ব দিয়ে 'র' তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল বলে জানা গেছে।

ভারতীয় নাগরিক গিয়াসউদ্দিন ও নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পরিকল্পনায় ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার মাওলানা মহসিন ভাদুরিয়া, রামেশ্বর প্রসূন এবং আরো অনেকে। উত্তর চব্বিশ পরগণার রামেশ্বর প্রসূনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৯টিরও বেশী ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং চালু আছে। ঐসব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্ট বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।

২০০২ সালের প্রথম দিকে বেলাল (৪০), সালাহউদ্দীন (৩০) ও মোতাসিম (২৭) নামে তিন ভারতীয় নাগরিক মুর্শীদাবাদ জেলার মালদহ থেকে গোদাগাড়ি সীমান্ত দিয়ে রহস্যজনকভাবে স্বউদ্যোগে বাংলাদেশের দিনাজপুর আসে। সালাহউদ্দিন ও মোতাসিম মুর্শীদাবাদ জেলার পানব্রুজ জঙ্গীপুরের বাসিন্দা। এ সময় তারা শুধু শূরা সদস্য খালেদ সাইফুল্লাহর সাথে দেখা করে ভারতে ফিরে যায়। পরবর্তীতে তাদের আগ্রহ অনুযায়ী একই বছর খালেদ সাইফুল্লাহর মধ্যস্থতায় টাঙ্গাইলে মোল্লা ওমরের বাড়িতে আবদুর রহমানের সাথে তাদের দেখা হয়। সাক্ষাতে তারা আবদুর রহমানের কাছে তার জিহাদী কার্যক্রমে সর্বপ্রকার সাহায্যের নিশ্চয়তা দেয়া হয় এবং জেএমবি'র ২/১ জন সদস্যকে ভারতে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক তাদের ফিরে যাবার কিছুদিন পর আতাউর রহমান সানী ও হাফেজ মাহমুদ মালদহে গমন করে। এ সময় তারা সাংগঠনিক কারণে মালদহে জেএমবি'র একটি শাখা খোলার প্রস্তাব দিলে মালদহকে জেএমবি'র ৬৫তম সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা দিয়ে বেলালকে জেলা দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়। এ সময় ভারতীয় পক্ষ থেকে বাংলাদেশে জিহাদ পরিচালনার জন্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহের প্রস্তাব দেয়া হয়।

২০০৩ সালে বেলাল জেএমবি'র বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে জানায়, ভারত থেকে এক থেকে দেড় হাজার টাকা মূল্যে ওয়ান শুটার গান সরবরাহ করা যাবে। জেএমবি নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর আরিফ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), শিহাব (গাইবান্ধা) এবং তরিকুলের (গ্রেফতারকৃত) মাধ্যমে অস্ত্র ও বিস্ফোরকগুলো সংগ্রহ করে। বলতে গেলে একবারে নামেমাত্র মূল্যে জেএমবি ভারত থেকে এই অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো সংগ্রহ করে।

২০০৪ সালের শেষদিকে শূরা সদস্য হাফেজ মাহমুদ মালদহে গমন করে। এ সময় বেলালের সাথে তার সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হলে তিনি জেলা দায়িত্বশীল পদ থেকে বেলালকে সরিয়ে রফিককে নিয়োগ করেন। কিন্তু হাফেজ মাহমুদ তাতে ব্যর্থ হন। মালদহ থেকে জেএমবি'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে মুর্শীদাবাদ থেকে কেন্দ্রীয় ফান্ডে ইয়ানত হিসেবে ১০-১২ হাজার টাকা প্রদান করা হতো।

জেএমবি ভারত থেকে যে পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর নিয়ে আসে তার সবগুলো প্যাকেটের গায়ে 'ইণ্ডিয়া এক্সপ্লোসিভ কোম্পানী লি. গোমিয়া' লেখা আছে। কোম্পানীটি ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানী। সেই কোম্পানী থেকে এই বিপুল পরিমাণ

www.pathagar.com

পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর বাংলাদেশে রফতানী হলো আর কর্তৃপক্ষ কিছুই জানলো না তা অবিশ্বাস্য। তাছাড়া এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক একবারে বাংলাদেশে আসেনি। এসেছে ৩/৪ শত করে বিভিন্ন প্যাকেটে। এর দুই একটি চালান সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে ধরাও পড়েছে। নিশ্চয় বিএসএফ বিষয়টি সরকারের উর্ধ্বতন মহলে জানিয়েছে এবং সরকার বিষয়টি খতিয়ে দেখে থাকবে। কাজেই সরকারের অজ্ঞাতসারে যদি পাচারের ঘটনা হতো তাহলে সরকার কোম্পানীটিকে আগেই সতর্ক করতো এবং এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাংলাদেশে আসতো না।

বেলালসহ যেসব ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে এসেছিল তারা টার্গেট করে বাংলাদেশে এসে শায়খ রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে জেএমবি'র সাথে জড়িত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে তারা আগে থেকেই জেএমবি'র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিল। আর এতে প্রমাণিত হয় ঐ সকল ভারতীয় নাগরিক মূলত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর গুপ্তচর ছিল। আর একারণেই তাদের পক্ষে নামমাত্র মূল্যে ভারতের সরকারী কোম্পানী থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক রফতানী সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক আমদানীকে ঘিরে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। ভারতে যদি এইসব পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর এত সহজলভ্য হতো তাহলে সেদেশের শতাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর হাতে তা সবার আগে পৌঁছার কথা এবং ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে তা ব্যবহার করবে। কিন্তু ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কখনো এইসব ডেটোনেটর ও পাওয়ার জেল ব্যবহার করেছে তা শোনা যায়নি। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সবসময় ব্যবহার করে আরডিএক্স নামক বিস্ফোরক। পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর সহজলভ্য হলে এতো কষ্ট করে আরডিএক্স সংগ্রহ করতোনা। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে যেসব বিস্ফোরক সহজলভ্য ছিল না তা কী করে বাংলাদেশের জেএমবি'র হাতে এলো বিপুল পরিমাণে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই জেএমবি'র সৃষ্টির অন্তরালের কালো হাতটি সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শূরা সদস্য হাফেজ মাহমুদ বেলালকে মুর্শীদাবাদ জেলার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় প্রমাণ করে বেলালের শিকড় অন্যত্র ছিল যা হাফেজ মাহমুদের পক্ষে উপড়ানো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মুর্শীদাবাদ জেলায় জেএমবি'র বিস্তৃতি না ঘটা এবং এ সত্ত্বেও প্রতি মাসে জেএমবি'র ফান্ডে ১০-১২ হাজার টাকা প্রদান যথেষ্ট রহস্যজনক। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যভিত্তিক দলটির ই-মেইল পর্যালোচনা করে এ কথা কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে তারা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হয়ে কাজ করছিলেন।

এক কথায় জেএমবি, তার আমীর শায়খ আবদুর রহমান ও অন্য নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে একথা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শায়খ আবদুর রহমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা ব্যবহৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং জেএমবিও তাদেরই সৃষ্টি। আর এটা যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কাজ সেটা প্রমাণে খুব বেশী কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আবদুর রহমান নিজে ভারতীয় গুপ্তচর সন্দেহে একাধিক ব্যক্তিকে জবাই করেছে, তিনি বা তার সংগঠন কি করে 'র'-এর দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সাধারণ চোখে বিষয়টি ভাবনার এবং বৃহৎ প্রশ্নেরও বটে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন ভূরিভূরি নজির চোখে পড়ে। (এই বইয়ের পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হলো না)। এখানে নতুন কিছু দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

তুলে ধরতে চাই।

বিশ্বে আজ আর কারো জানতে বাকি নেই যে, পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের হত্যার সাথে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ জড়িত। শুধু তাই নয়, তারা এই হত্যাকাণ্ডের সময় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যাতে তাদের দিকে না পড়ে সে জন্য নিজ দেশের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং পাকিস্তানে দায়িত্বরত মার্কিন এম্বাসাডার আর্নল্ড রাফায়েলকে ঐ একই প্লেনে তুলে দিয়ে তাকেসহ হত্যা করেছিল তারা।

২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান থেকে অপহৃত হয় ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের দক্ষিণ এশীয় ব্যুরোপ্রধান ড্যানিয়েল পার্ল। অপহরণকারীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের দ্বৈত নাগরিক পার্লকে অপহরণ করে ই-মেইলের মাধ্যমে গুয়ান্তানামো বে-তে বন্দী পাকিস্তানীদের মুক্তি ও ফেরত দানের দাবী জানিয়েছিল। পাকিস্তান অপহরণকারীকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তাকে গ্রেফতার করে। অপহরণকারীর নাম ওমর সাইদ শেখ। সে পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ নাগরিক এবং তার প্রাথমিক শিক্ষাও শুরু হয়েছিল যুক্তরাজ্যে। লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্সে পড়াকালীন ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্স তাকে নিয়োগ করে এবং কসোভোতে জিহাদে যেতে প্ররোচিত করে। এরই মধ্যে সে আবার ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করে। বসনিয়া জিহাদ শেষ করে ফেরার পর এমআই সিক্স তাকে পাকিস্তানে নিয়োগ করে। এ সময় সে আফগানিস্তানের খোশতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সে মোল্লা ওমর এবং ওসামা বিন লাদেনের সান্নিধ্যে পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছিল। ওমর সাইদ শেখ ড্যানিয়েল পার্লকে হত্যা করেছিলেন। আর বিষয়টিতে পাকিস্তান ব্যাপক কূটনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার সদ্য প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ 'ইন দ্য লাইন অন ফায়ার' গ্রন্থে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি দিয়েছেন।

১৯৭৪ সালে সিকিম দখলের প্রেক্ষাপট তৈরীর জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেখানে ব্যাপক বোমাবাজি ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনা পাঠানোর পূর্বে সেখানে তামিল টাইগারদের জন্য অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ সহায়তা ভারতীয়রাই দিয়েছিল। পরে সেই এলটিটিই দমনে শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠিয়েছিল ভারত।

এবার বাংলাদেশের দিকে তাকানো যেতে পারে। স্বাধীনতার পর ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র শেখ মুজিব সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও ভারত বাংলাদেশে জাসদ নামে এক বিপ্লবী রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে, সেজন্য তারা জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে বেছে নেয় সেই ব্যক্তিকে যিনি স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর লুটপাটের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সাথে গোলাগুলিতে জড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী হিসেবে গ্রেফতার হন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মভীরু মেজর জলিল যদি বুঝতেন যে তিনি ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হতে যাচ্ছেন তাহলে জাসদের সভাপতি হতে রাজি হতেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন। এ কারণেই ভারত জাসদ তৈরীতে তৃতীয় হাত ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, এই জাসদের সশস্ত্র শাখা গণবাহিনী ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপহরণের জন্য সশস্ত্র অপারেশন পরিচালনা করে। এতে ৪ জন নিহত হয়। মূলত বাইরে শেখ মুজিবের সাথে মিত্রতা বজায় রাখলেও তাকে চাপে রেখে কাজ উদ্ধার করা ও বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শূন্য করাই ছিল জাসদ তৈরীর ভারতীয় লক্ষ্য। সেকারণেই শ্রেণীশত্রু নিধনের নামে ৩০ হাজার সচেতন ও প্রতিশ্রুতিশীল যুবককে হত্যা করেছিল জাসদ।

www.pathagar.com

কাজেই শায়খ আবদুর রহমান যে একইভাবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল তা আর বুঝতে কারো বাকি থাকার কথা নয়।

জেএমবি : মিথ ও বাস্তবতা

জেএমবি নিয়ে আমাদের দেশে নানা কথা ও কাহিনী প্রচার হয়েছে। মূলত পুলিশ তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে এবং কতিপয় সংবাদপত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কথা ও কাহিনী প্রচার করেছে। জেএমবি যা নয় তাই প্রচার করে চমক সৃষ্টি করেছে। জেএমবি একটি বিশাল জঙ্গী সংগঠন। সারা দেশে এদের লক্ষ লক্ষ জঙ্গী, হাজার হাজার সুইসাইড স্কোয়াড সদস্য, মহিলা সুইসাইড স্কোয়াড সদস্য, আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ প্রভৃতি নানা কথা এবং জেএমবি উত্থানের পেছনে অশিক্ষা, দরিদ্রতা, মাদ্রাসা শিক্ষা দায়ী এমন কথাও বিস্তর আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে জেএমবি নিয়ে গবেষণা করে পাওয়া গেছে ভিন্ন চিত্র। ৩০ মার্চ ২০০৬ সাল পর্যন্ত জেএমবি'র ধৃত ৭২০ জন সদস্যের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে গবেষণা করে জানা গেছে ভিন্ন কথা। এতে করে জেএমবি সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনী ও মিথগুলোর অনেকগুলো অসত্য, অতিরঞ্জিত প্রমাণিত হয়েছে।

JMB ACTIVIST RATIO AND PROFILE

Sympathizer	4,250	39%	10,989		
Activist	6739	61%			
	Untrained	5091	76%	6739	
	Trained	1648	24%		
	HARD CORE GROUP	Ehsar(Full time activist)	169	10%	218
		Zone and Zilla responsible	40	2%	3.2% of total activist
		Sura Members	7		

প্রথমেই জেএমবি'র জনবল কাঠামোর দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। র‍্যাব কর্তৃক জব্দকৃত জেএমবি'র বিভিন্ন নথিপত্র ঘেটে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেএমবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কেন্দ্রীয় রিপোর্টে দেখা যায় : জেএমবি'র মোট সদস্য সংখ্যা ৬৭৩৯ জন। এছাড়া জেএমবি'র প্রতি সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ৪২৫০ জন। জেএমবি'র ভাষায় এদেরকে সুধী বলা হয়। এই ৬৭৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৭৬% বা ৫০৯১ জন প্রশিক্ষণবিহীন বা তালিম ছাড়া কর্মী। অর্থাৎ ২৪% বা ১৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মী। এই ১৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মীর মধ্যে আবার ১৬৯ জন অর্থাৎ ১০% এহসার বা পূর্ণকালীন সদস্য, মোটামুটি ২% বা ৪০ জন জোন বা জেলা দায়িত্বশীল এবং ৭ জন শূরা সদস্য। এই প্রশিক্ষণের আবার বেশীর ভাগই ছিল দাওয়াতি তালিম। অস্ত্র প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

ছিল শুধু পূর্ণকালীন সদস্যদের অর্থাৎ সর্বমোট সদস্যের মাত্র ৩.২% অর্থাৎ ২১৬ জন নিয়ে গঠিত জেএমবি'র হার্ড কোর গ্রুপ। লজিস্টিক সাপোর্টের মধ্যে ছিল ১২টি মোটরসাইকেল, ৯৬টি সাইকেল, ৪টি কম্পিউটার, ৪১টি মোবাইল, ১টি ফ্রিজ ও ৪টি জেনারেটর। আহলে হাদীস বাংলাদেশ দাবী করে দেশে তাদের দেড় কোটি অনুসারী আছে। সেই হিসেবে মোট আহলে হাদীস অনুসারীদের মাত্র .৭৩% জেএমবি'র কর্মী বা সমর্থক ছিল। অর্থাৎ ৯৯.২৭% আহলে হাদীস অনুসারী জেএমবি'র এই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করেনি। কাজেই জেএমবি উত্থানের জন্য ঢালাওভাবে আহলে হাদীস অনুসারীদের কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না।

ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে প্রস্তুত ঐ তালিকা থেকে আমরা আরো দেখতে পাই, জেএমবি'র মহিলা সুইসাইড স্কোয়াডের কথা আমাদের মিডিয়াতে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। কিন্তু জেএমবিতে মহিলা স্কোয়াড তো দূরে থাক তাদের কোনো সুইসাইড স্কোয়াডই ছিল না। ১১ জুলাই ২০০৩ তারিখে জনৈক আবদুল্লাহর প্রস্তুত করা ও স্বাক্ষরিত তালিকা থেকে আমরা আরো দেখতে পাই, সেখানে ৭২৮ জন মহিলাকে সদস্য হিসেবে দেখানো হলেও ডিসেম্বর ২০০৪ সালের তালিকায় মহিলা সদস্যদের ঘর সম্পূর্ণ খালি রয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, জেএমবিতে প্রথম দিকে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও দাওয়াতী কাজে পর্দার খেলাফ হচ্ছে বুঝতে পেরে পরে তাদের বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রত্যেক জেএমবি সদস্যদের বলা হয়, সংগঠনের কাজে তারা তাদের পরিবারের মহিলা সদস্যদের মাঝে দাওয়াত দেবে ও তাদের সাহায্য গ্রহণ করবে। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর সরকার জেএমবি সদস্যদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করলে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জেএমবি সদস্যকে ফেদায়ী বা আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়।

সাধারণত ধারণা করা হয়, বেকারত্ব জঙ্গীবাদের উত্থানের অন্যতম কারণ।

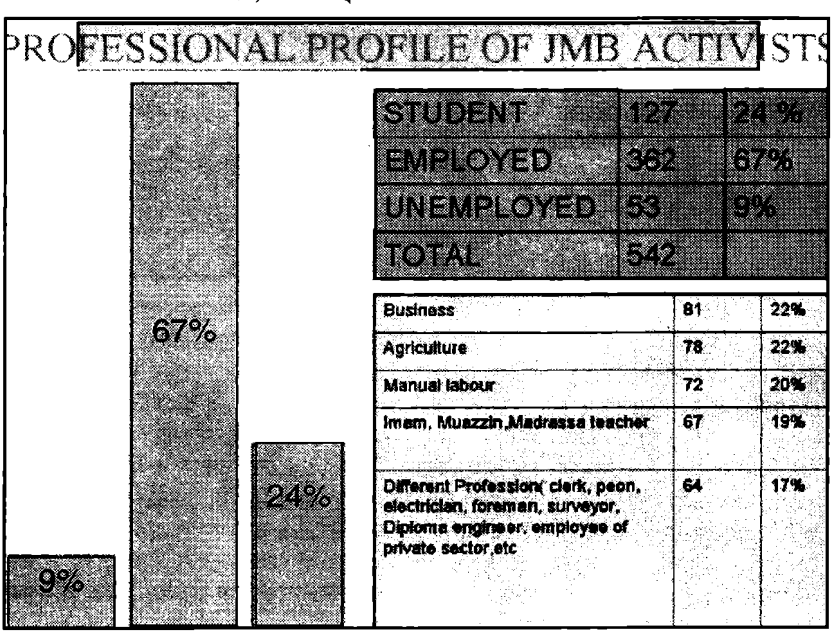

www.pathagar.com

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মার্চ ২০০৬ সাল পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া ৭২০ জন জেএমবি সদস্যকে নিয়ে গবেষণা করেছে সরকারের একটি সংস্থা। গবেষণায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তা রীতিমত চমকপ্রদ। ৭২০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৯% বেকার। ৬৭% কর্মজীবী এবং ২৪% ছাত্র। আবার এই ৬৭% কর্মজীবীর মধ্যে ২২% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ২২% কৃষক, ২০% কায়িক মজুর, ১৯% ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসা শিক্ষক এবং ১৭% অন্যান্য পেশাজীবী মানুষ। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয় বেকারত্ব জঙ্গীবাদের উত্থানে কোনো বড় কারণ নয়।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নিরক্ষরতা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে জঙ্গীবাদের উত্থানের বড় কারণ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। বিশেষ করে যারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা জেএমবি'র উত্থানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য জোরালো দাবী তুলেছিল। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই। জেএমবির গ্রেফতারকৃত ৭২০ জন সদস্যের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৭% অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। অর্থাৎ ৯৩% জেএমবি সদস্য শিক্ষিত। এই ৯৩% শিক্ষিত জেএমবি সদস্যদের মধ্যে আবার ৫৩% সাধারণ শিক্ষায় এবং ৪০% মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। অর্থাৎ এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে না যে জঙ্গীবাদের উত্থানে মাদ্রাসা শিক্ষা দায়ী, পূর্বেই বলা হয়েছে। পেশাগতভাবেও জেএমবি সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৯% ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদ্রাসা শিক্ষক– যা অন্যান্য অনেক পেশার থেকে কম।

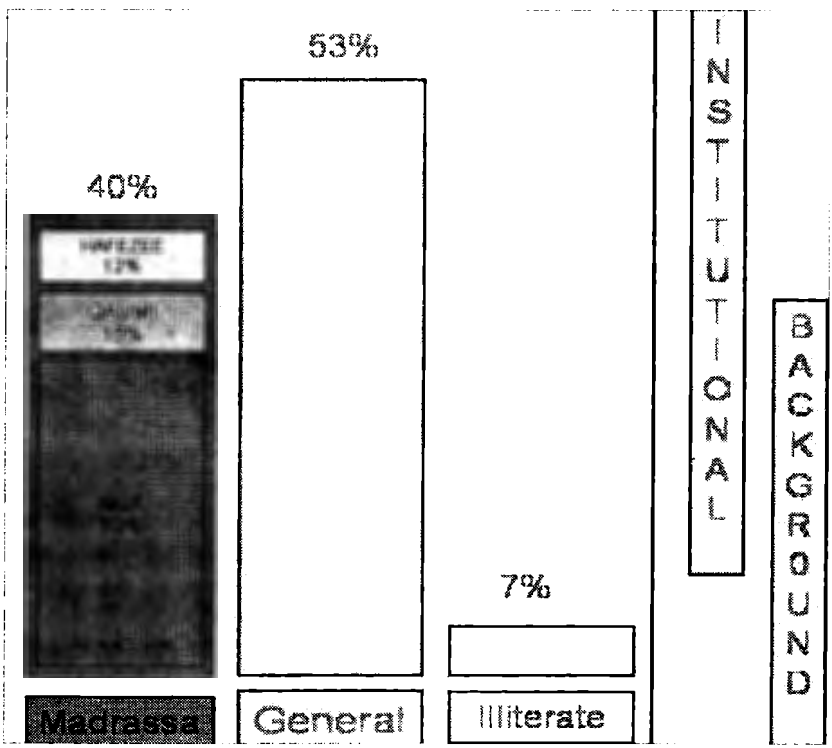

www.pathagar.com

আবার মাদ্রাসা শিক্ষিত জেএমবি সদস্যদের মধ্যে ৭৩% এসেছে আলীয়া ধারা থেকে, কওমী ধারা থেকে এসেছে ১৫% এবং হাফেজী ধারা থেকে এসেছে মাত্র ১২%। অর্থাৎ যারা কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গীবাদের কোকুন বা আঁতুরঘর বলে দাবী করে থাকেন তারা যে কতটা বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করেন তা এই পরিসংখ্যান দেখলে সহজেই চোখে পড়বে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে যে ইসলামী জিহাদী তৎপরতা চলছে তাদের বেশীর ভাগই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ওসামা বিন লাদেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জঙ্গীবাদ আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমীর ও সাত শূরা সদস্যসহ সাত শতাধিক বিভিন্ন পর্যায়ের জেএমবি ধরা পড়ায় বাংলাদেশ থেকে জেএমবি'র কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে কি? সরকার, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কেউই নিশ্চিত নয় যে, চলমান অভিযানের ফলে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান একেবারে থেমে যাবে। বরং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান এই দেশে নানা কারণে সামনের দিনগুলোতে জঙ্গীবাদ আরো বেশী করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ আবহমান কাল ধরে ইসলামপ্রিয় হলেও ধর্মের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো উগ্রতা, বাড়াবাড়ি বা ধর্মান্ধতা দেখা যায়নি। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ মুসলমানদের উপর যেভাবে হিন্দুইজম, ক্রিশ্চিয়ানিজম ও জায়োনিজম জুলুম, নির্যাতন চালাচ্ছে তাতে করে তাদের মনেও দানা বাধছে বিক্ষোভের বিষবাষ্প। মুসলমানদের পবিত্র ঘর, গ্রন্থসমূহকে তারা শুধু অপবিত্রই করছে না, বহু ক্ষেত্রে ধ্বংস করে ফেলছে। মহানবী সা.-কে নিয়ে তৈরী করা হচ্ছে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন ও চিত্র নির্মিত হচ্ছে, টয়লেটের মধ্যে ফ্লাশ করে ফেলা হচ্ছে আল কুরআন শরীফকে। এসব আক্রমণ যে শুধু হিন্দু-ইহুদী-খ্রিস্টবাদী দেশের সাধারণ জনগণ করছে তা নয়, সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মীয় নেতাদের মুখেও তার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে প্রায়শ। তাইতো আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ্ জুনিয়রের মুখে শুনি ক্রুসেডের হুঙ্কার, এমনকি খ্রিস্টান ধর্মের শীর্ষ নেতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টও তার ভালমানুষির আলখেল্লা খুলে মুসলমানদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাসমূহের অন্যতম মহানবী সা.-এর নামে কটূক্তি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। অথচ মৌলবাদী সন্ত্রাসী নামক 'গালির' খাতায় তাদের নাম উঠছে না। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রপাগাণ্ডার কারণে মুসলমান ও সন্ত্রাসী নামটি আজ তারা সমার্থক বানিয়ে ফেলেছে।

ইসলামে পৃথিবীর সকল মুসলমান ভাই ভাই। এক ভাইয়ের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানো মুসলমানদের জন্য ফরজ। কাজেই বুশ ও তার ইভানজেলিক বন্ধুরা যতদিন না মুসলমানদের উপর অন্যায় অত্যাচার জুলুম নিপীড়ন না থামাবে ততদিন মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের মুসলমানরাও তার বাইরে যেতে পারে না।

এদিকে পাশ্চাত্য যখন কোনো মুসলমান দেশকে কব্জা করতে চায় বা জব্দ করতে চায় তখন সেই মুসলিম দেশকে ধরার জন্য খুঁত বের করার চেষ্টা করে। যদি সেখানে আগে থেকে ধরার মতো কোনো দোষ বিদ্যমান না থাকে তাহলে তারা নিজেরাই নিজস্ব অনুচর ও নিয়োগীদের দ্বারা সেখানে দোষ জন্ম দেয়। এই দোষ কোথাও 'Weapon of mass distruction', কোথাও 'Terrorism' বা সন্ত্রাসবাদ আবার কোথাও অন্য কোনো নামে জন্ম দেয়। পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শাসন ক্ষমতা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে

www.pathagar.com

তাদের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। ফলে এই নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে তারা অনেক সময় প্রাচ্যদেশীয় মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে ফেলে। মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে যে অন্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে, যার ফলে অনেক সময় তাদের পক্ষে সত্য মিথ্যা যাচাই করার অবকাশ থাকে না এবং শায়খ আবদুর রহমানদের মতো লোকেরা আদতে বুঝতেই পারে না আসলে তারা কারো ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছেন এবং তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কাজেই পাশ্চাত্যের এই মুসলিম বিদ্বেষী নীতি ও ষড়যন্ত্র যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও জিহাদ (পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে যা জঙ্গীবাদ) জন্ম হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এবারে স্থানীয় সমস্যার দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। জেএমবি'র সাম্প্রতিক বোমা হামলাকে এদেশের সকল শ্রেণীর আলেম সমাজ ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশে এই বোমা হামলার সময়ে কতগুলো ইসলামী দলের সমন্বয়ে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় থাকা। কারণ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বেশীর ভাগ আলেমগণ মনে করেছিলেন বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় থাকার ফলে দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে জেএমবি'র এই বোমা হামলা তাদের কাজের পথে অন্তরায় হয়ে পড়েছে। সে কারণেই তারা জেএমবি'র বোমা হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকে কুফরী বলে আখ্যা দিয়েছে। অথচ সারা বিশ্বেই বর্তমানে জিহাদী মুসলমানরা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে একটি ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যদি কোনো ইসলাম বিদ্বেষী সরকার ক্ষমতায় থাকতো বা ভবিষ্যতে কোনো দিন আসে এবং সেই সরকার ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতো বা করে যেমন, ইসলামী শিক্ষা বাতিলের উদ্যোগ, কাদিয়ানীদের মুসলমান ঘোষণার উদ্যোগ, ফতোয়া বিরোধী রায় সংরক্ষণ প্রভৃতি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর কোনোরূপ জুলুম বা নির্যাতন চলে তাহলে কিন্তু এই বোমা হামলা বা আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে একই ফতোয়া অভিন্ন থাকবে না। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি, মুফতি হান্নান যখন গোপালগঞ্জে বোমা হামলা করেছিল তখন কিন্তু এদেশের কোনো আলেম সেই বোমা হামলাকে কুফরী বলে ফতোয়া দেয়নি। শুধু তাই নয়, মুফতি হান্নান বাংলাদেশের অনেক নেতৃস্থানীয় আলেম, বুজুর্গ ও ইসলামী চিন্তাবিদের কাছে শেলটারও পেয়েছিল। কাজেই বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান রোধে এখানে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সরকারের ক্ষমতায় থাকা বা কোনো সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়াটা একটা জরুরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আসল কৃতিত্ব কাদের

জঙ্গীবাদ বাংলাদেশের একার কোনো সমস্যা নয়। নানা কারণে বিভিন্ন রূপে জঙ্গীবাদ আজ বিশ্বের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যে কাজটি ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, স্পেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র করতে পারেনি বাংলাদেশ কিভাবে সেই কাজটি করতে সক্ষম হলো? যে কাজটি সিবিআই, র, আইএসআই, এমআই সিক্স, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, সিআইএ, এফবিআই, মোসাদ, ইন্টারপোল প্রভৃতির মতো দুদে গোয়েন্দা সংস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে তখন বাংলাদেশে র‍্যাবের সফলতার পেছনে রহস্য কী? তাহলে কি সিবিআই, র, আইএসআই, এমআই সিক্স, স্কটল্যান্ড

www.pathagar.com

ইয়ার্ড, সিআইএ, এফবিআই, মোসাদ, ইন্টারপোল প্রভৃতির চেয়ে র‍্যাব বেশী দক্ষ, বেশী চৌকস, বেশী আধুনিক গোয়েন্দা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ? নাকি ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনে ততটা আন্তরিক নয়, যতটা বাংলাদেশের সরকার? যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার কি বিন লাদেন, আইমেন আল জাওয়াহিরী, মোল্লা ওমর প্রভৃতি আল কায়েদা নেতাদের আদৌ ধরতে চায় না যেমনটি চেয়েছে বাংলাভাই ও শায়খ আবদুর রহমানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার? আসল সত্যটা কি? কি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বাংলাদেশ এমন একটি অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, র‍্যাব ও পুলিশের অসামান্য সাফল্যকে কোনোভাবেই ছোট না করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশে জঙ্গীবাদকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারার প্রধান সাফল্যের দাবীদার এদেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা। বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, খতীব, আলেম সমাজ, পীর মাশায়েখগণ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই জেএমবি'র এই বোমা হামলাকে অনৈসলামিক ও বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশের পথে বিশাল অন্তরায় এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। যে কারণে তারা শুরু থেকেই মসজিদে মসজিদে খুতবার মাধ্যমে, সভা সেমিনার করে, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে আলোচনা করে দেশবাসীকে জেএমবি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। এতে করে জেএমবি সদস্যরা দেশবাসীর মাঝে নিজেদের হামলার পক্ষে কোনো ধর্মীয় ফানুস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। দেশবাসী এমনকি জেএমবি'র শতকরা.৭৩ ভাগ সদস্য যে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য সেই আহলে হাদীস সমর্থক জনগণও জেএমবিকে কোনো রূপ আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়নি। এতে করে ১৪ কোটি জনগণ থেকে বস্তুত জেএমবি আলাদা হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ ও এর ১৪ কোটি জনতার সৃষ্ট জনারণ্য তাদের জন্য অভয়াশ্রমে পরিণত হয়নি। ফলে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে তারা আলাদা হয়ে পড়ে। বাবা তার সন্তান জেএমবি সদস্য জেনে সকল আপত্যস্নেহ উপেক্ষা করে যখন তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে শুরু করে তখন বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে জেএমবি সদস্য শনাক্ত করতে পারলে সাধারণ মানুষই তাদের ধরে পুলিশে সমর্পণ করতো। ফলে তাদের পক্ষে বাংলাদেশের কোনো এক কোণেও লুকিয়ে থাকা বা আত্মগোপন করে থাকাও সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ সরকার, র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সাফল্যের মূল কারণটি এখানেই নিহিত। জনগণ যদি জেএমবি সদস্যদের একবার জিহাদী বলে গ্রহণ করতো, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতো, খাদ্য-রসদ দিতো তাহলে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশে ১৪ কোটি মানুষের জনারণ্য থেকে র‍্যাব বা পুলিশের পক্ষে তাদের খুঁজে পাওয়া হতো খুবই কষ্টকর এবং অনেক ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৯৭১ সালে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মাঝ থেকে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পায়নি পাকিস্তানী বাহিনী। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক এমনকি ব্রিটেন এবং আমেরিকার ব্যর্থতার মূল কারণ মূলত এটাই। সেখানে জিহাদকারীরা স্থানীয় জনমানুষের সহায়তা পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম। সম্ভবত এটি বাংলাদেশের মানুষের ধর্মসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের বহি:প্রকাশের পরিচয় বহন করে। যাই হোক, বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র ব্যতিক্রম যারা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও সফল ব্যবস্থা নিতে পেরেছে। বাংলাদেশের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া, অনেক বড় সাফল্য, বিশ্বের

www.pathagar.com

ইতিহাসে রচিত এক অনন্য অধ্যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তার অস্তিত্বের উপর নেমে আসা সবচেয়ে বড় আঘাতকে তারা দারুণ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছে। যখন রাজনৈতিক দলগুলো জঙ্গীবাদের জন্য একের উপর অন্যে দোষারোপে ব্যস্ত ছিল তখন এদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছে জঙ্গীবাদের সফল মোকাবেলায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে সে ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবার সামর্থ্য রাখে। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশ এটা পেরেছে এদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতকে তাদের পক্ষে রেখেই বা তাদেরকে ক্ষুব্ধ না করেই। এ কারণেই জঙ্গীবাদ দমনে আসল কৃতিত্ব এদেশের তৌহিদী জনতার, আলেম-ওলামা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বের কাছে এই বার্তা তুলে ধরেছে যে বাংলাদেশের মুসলমানরা কোনো প্রকার জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না।

বাংলাদেশ কেন টার্গেট

প্রশ্নটির অনেকগুলো উত্তর। প্রথমত: বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রটির রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে ইউনিপোলার পৃথিবীর একমাত্র মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ইসলাম। হান্টিংটন যাকে 'ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিশ্বে কোনো মুসলিম দেশই মাথা উঁচু করে দাঁড়াক এটা পাশ্চাত্যের কাম্য নয়। তাই তারা মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে নানামুখী আগ্রাসন। যেখানে সম্ভব হয়েছে বা উপযুক্ত অজুহাত পাওয়া গেছে সেখানে সরাসরি আগ্রাসন চালানো হয়েছে। আর যেখানে সরাসরি আগ্রাসন চালানোর মতো অজুহাত পাওয়া যায়নি সেদেশগুলোতে অজুহাত তৈরীর জন্য চালানো হচ্ছে নানামুখী অপকর্মতৎপরতা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে চাপে রাখার জন্য বা নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অজুহাত তৈরীতে নানা প্রকার অপকর্ম চালানো হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের এই কূটনীতি এখন অনেক আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তাদের আঞ্চলিক ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। কাজেই অমিত সম্ভাবনাময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশও তাদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের প্রসারকে উল্লিখিত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে, বাংলাদেশ কেন জঙ্গীবাদের টার্গেট হয়েছে?

একদিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ খুব সহজেই মুসলিম বিদ্বেষী বিশ্বশক্তির টার্গেটে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে নদীবিধৌত উর্বর সমভূমি, মিষ্টি পানির সহজপ্রাপ্যতা, বিশাল বাজার, ভূ-কৌশলগত অবস্থান, বিপুল পরিমাণ গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের মজুদসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধের কারণে বাংলাদেশ স্থানীয় ও দূরবর্তী বিভিন্ন শক্তির টার্গেটে পরিণত হয়েছে। এই শক্তিগুলো চায় না বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকুক। বাংলাদেশ স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাশীল ও নিজের পায়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তা চায় না। তাই তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানা প্রকার সঙ্কট সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগায়। জেএমবি তেমনই একটি অপজন্ম। সমস্যা হলো, জেএমবি নেতৃবৃন্দ সেটা বুঝতে অক্ষম। ধর্মের ঠুলি তাদের চোখে এমনভাবে সাঁটানো হয়েছে যে তারা সত্যি মিথ্যার প্রভেদ বুঝতেও অক্ষম। ষড়যন্ত্রকারীরা জেএমবি সদস্যদের বিভ্রান্ত করতে কয়েকটি মুসলিম দেশের তাদের কতিপয় মিত্রের সহযোগিতা নেয়ায় তাদের কাজটি সহজ হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কারণে সমুদ্রপথেও বাংলাদেশ এই অঞ্চলের গেটওয়ে হিসেবে অবস্থান করছে। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

এলাকায় বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করতে চায়। ভারতও চায় সেটি। তারা এই বন্দরের মাধ্যমে তাদের সেভেন সিসটার্স রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ করতে চায়। তাছাড়া ঐ রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার প্রয়োজনেও ভারতের এমন একটি সমুদ্র বন্দর জরুরী। চট্টগ্রাম বন্দরের সামরিক গুরুত্বের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও সমান আগ্রহের। শোনা যায়, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নৌ-ঘাঁটি স্থাপনে খুবই আগ্রহী এবং তারা এজন্য বাংলাদেশের একটি দ্বীপ ব্যবহার করতে চায়। অন্যদিকে মায়ানমারের সাথে সুসম্পর্কের কারণে চীন বঙ্গোপসাগর এলাকায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। বিষয়টি একই সাথে ভারত ও আমেরিকার জন্য মাথা ব্যথার কারণ। তাই তারা উভয়েই চট্টগ্রাম ও তার সন্নিকটস্থ এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি রাখতে চায়। বঙ্গোপসাগর এলাকায় আমেরিকার যে কোনো নৌ-ঘাঁটি চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে নি:সন্দেহে। কিন্তু বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় কোনো আগ্রাসী পরাশক্তির অবস্থান বাংলাদেশের জন্য কোনো প্রকারেই শুভকর নয়। তাই বাংলাদেশ বিষয়টিতে এতদিন পর্যন্ত কোনা সম্মতি দেয়নি। বাংলাদেশ শক্তিশালী হলে তাদের এ স্বপ্ন সম্ভবপর নয়। বঙ্গোপসাগর নিয়ে রয়েছে আরো নানামুখী ষড়যন্ত্র। প্রতিবছর বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী দিয়ে কয়েক লক্ষ কোটি টন পলিমাটি পরিবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মেশে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান এলাকায় ক্রস ড্যাম তৈরী করে বাংলাদেশের মোট আয়তনের কয়েকগুণ বেশী ভূ-খণ্ড অল্পদিনের মধ্যে গঠন করা সম্ভব। এটা সম্ভব হলে শুধু ভূ-খণ্ড নয়, বাংলাদেশের জন্য বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি এলাকায় বাড়বে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক জোন। সে এলাকার মৎস্য সম্পদ, জলজ সম্পদ এবং পানির নীচে অবস্থিত সম্ভাব্য বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও রয়েছে। ইতোমধ্যে মিয়ানমার ও ভারত বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানাকে তাদের নিজেদের এলাকা দাবী করে সেখানে গ্যাস উত্তোলন ও রফতানীর জন্য একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে। এ লক্ষ্যে তারা গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে বলে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। বাংলাদেশ বিষয়টি জানলেও অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে সেদিকে যথেষ্ট নজর দিতে পারেনি। ষড়যন্ত্রকারীরা সেটাই চায়। বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে, এখানে গণতন্ত্র শক্তিশালী হলে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সঙ্কট কেটে গেলে সে তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা দাবী করবে। তালপট্টি দ্বীপের অবৈধ দখলদাররা সে সুযোগ বাংলাদেশকে কখনো দিতে চাইবে না।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে ইহুদী-খ্রিস্ট শক্তির রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে আরেকটি পূর্ব তিমুরের মতো স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাতে চায়। সে লক্ষ্যে তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় ২০টিরও বেশী খ্রিস্টান মিশন তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকে তাদের এই কার্যক্রম শুরু হয়। সংগঠনগুলো হচ্ছে : বান্দরবান জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ প্রেস ব্যাটারিয়ান চার্চ, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টান চার্চ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান চার্চ, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট ফেলোশীপ, ইভানজেলিকাল এপস্টোলিক চার্চ, হেব্রোন মিশন, সিসিডিবি এনজিও (খ্রিস্টিয়ান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ), ফাতেমা রাণী ক্যাথলিক চার্চ, ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়, বিএফজি মিশনারী প্রভৃতি খাগড়াছড়ি জেলায় কর্মরত Gospel for Asia, Bangladesh United Christian Association (BUCA), Shadhu Joseph Church, Khagrachari District Baptist Fellowship প্রভৃতি;

www.pathagar.com

রাঙামাটিতে কর্মরত বন্ধু যিশুটিলা, ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, সেন্ট ট্রিজার কনভেন্ট, মিশন অফ মার্সি, সেভেন ডেজ এ্যাডভানটেজ মিশন অব বাংলাদেশ প্রভৃতি। এ মিশনগুলো দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য এলাকার সাধারণ মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে খ্রিস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেছে। পার্বত্য এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত লক্ষাধিক লোককে তারা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের মিশনারীরা শুধু নয়, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকসহ তাদের বিভিন্ন ডোনার সংগঠন কোনো রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে একচোখাভাবে উপজাতীয়দের মাঝে কোটি কোটি ডলার বিতরণ করছে। শুধু স্বতন্ত্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ বৈচিত্রময় বনজ ও প্রাণী সম্পদ এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদের অসীম সম্ভাবনা। সেই সাথে ভূ-কৌশলগত কারণেও এই অঞ্চলটির অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে– যে কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়ে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হলে বা অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকলে বাংলাদেশ তাদের ষড়যন্ত্রের দিকে বেশী নজর দিতে সক্ষম হবে না।

তেল আবিষ্কারের পর থেকে উপসাগরীয় এলাকায় যে অস্থিরতা ও যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ বিশ্লেষকগণ তাকে নাম দিয়েছেন তেলের জন্য যুদ্ধ। এখন পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম ছাড়া বর্তমান সভ্যতাকে এক ঘন্টার জন্যও কল্পনা করা যায় না। বর্তমানে বিশ্বে তেল-গ্যাসের কিছু বিকল্প আবিষ্কৃত হলেও অদ্যাবধি সেগুলো নির্ভরযোগ্য জালানি হিসেবে প্রমাণিত হয়নি। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন বিশ্বে পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানির গুরুত্ব বাড়তে থাকবে। ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলোর জ্বালানি চাহিদা সবচেয়ে বেশী। কাজেই তারা চায় যে কোনো মূল্যে নিরাপদ জ্বালানির সংস্থান। সেটা করতে গিয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যে অন্যায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেও পিছ-পা হয়নি। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কাজেই তাদের প্রয়োজন নতুন নতুন জ্বালানির উৎস। ঠিক সেই সময় বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হচ্ছে একের পর এক বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাস ও উন্নতমানের কয়লার খনি। খনি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই গ্যাস ও কয়লার খনির অভ্যন্তরেই লুকিয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল, স্বর্ণ, হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ দ্রব্য। এ সকল খনিজই কার্বনের বিভিন্ন রূপ বলে বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে একটি খনির ভেতরে এমন আরো অন্যান্য খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেছে। এছাড়া বাংলাদেশের কক্সবাজারের বালুতে মিশে রয়েছে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম, জিরিকন, ইলেমনাইট প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ। খনিজ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কক্সবাজারের বালুতে আনুমানিক ১৪৫ লক্ষ কোটি ডলারের মূল্যবান খনিজ পদার্থ মজুদ আছে। এছাড়া লাউয়াছড়া, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে রয়েছে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম খনি। ইউরেনিয়াম একটি অতি মূল্যবান ধাতু। পারমাণবিক চুল্লীতে কাঁচামাল হিসেবে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দেশপ্রেমিক ও দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে আমরা আমাদের এইসব সম্পদের সুফল ভোগ করতে পারছি না। আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সেখানকার দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করতে পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো ও তাদের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো গৃহযুদ্ধ তৈরী করে তা জিইয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের মূল্যবান এই খনিজ সম্পদের প্রতিও আজ তাই বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর চোখ পড়েছে। আর তাদেরকে সহায়তা দিচ্ছে তাদের সরকার। বুশ, ব্লেয়ার, ক্লিনটন ও তাদের স্থানীয় রাষ্ট্রদূতদের তাদের দেশের

www.pathagar.com

কোম্পানীগুলোর পক্ষে প্রকাশ্য ওকালতি করতে দেশবাসী ইতোমধ্যেই দেখতে পেয়েছে। আজকে বিভিন্ন গ্যাস ব্লক ইজারা পাবার লক্ষ্যে এবং উত্তোলিত গ্যাস রফতানী করতে দেয়ার শর্তে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে নানা প্রকার অপকর্মে ইন্ধন যোগাচ্ছে, এমনকি সরকারের ক্ষমতার উত্থান-পতনে তারা জড়িয়ে পড়ছে বলে পত্রপত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বহুবার অভিযোগ করেছেন, বর্তমান সরকার গ্যাস রফতানীর আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় আসতে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সহায়তা নিয়েছে। এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এরই মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। দেশের মধ্যে অস্থিতিশীলতা থাকলে তাদের পক্ষে এই কাজটি খুবই সহজ হয়ে যায়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোনো একক দেশের উপর থেকে বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমাতে পূর্বমুখী কূটনীতি গ্রহণ করেছিল। অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে ব্যস্ত থাকায় সরকার সেই কূটনীতির ফলোআপ করতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের পরে শুরু করেও ভারত পূর্বমুখী কূটনীতিতে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। তারা বাংলাদেশের কাছে বিনিময় ছাড়া ট্রানজিট করিডোর, বন্দর, গ্যাস রফতানী, ঢালাও বাজার সুবিধা, উন্মুক্ত সীমান্ত বাণিজ্য প্রভৃতি চায়। জঙ্গীবাদের মতো সঙ্কট মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক এসব বিষয়ের আলোচনায় দুর্বল হয়ে পড়বে। জেএমবি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বাংলাদেশ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে কথা বলতে পারবেন না। পুশইন, পুশব্যাক নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে না। পদ্মা নদীর পানি চুক্তি রিভিউ করতে পারবে না। ছিটমহল ও অমীমাংসিত সীমান্ত নিয়ে কথা বলতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশ বিশ্বে মডারেট মুসলিম কান্ট্রি হিসেবে যে সুনাম অর্জন করেছিল তা এই বোমা হামলার মাধ্যমে প্রশ্নবোধক করে দেয়া গেছে।

অন্যদিকে বিশ্বে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের হাতে আগ্রাসী শক্তির কেউ নিহত হলে বাংলাদেশের মুসলমানরা অন্তরে আনন্দ লাভ করতো। এছাড়াও অনেক বাংলাদেশী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে, জুলুম হচ্ছে সেখানে গিয়ে তাদের পক্ষে জিহাদে অংশ নিতো। এই বোমা হামলার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা একদিকে যেমন এই নেটওয়ার্কটি ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে জিহাদকে জঙ্গীবাদের মোড়কে আবৃত করে তার প্রতি এদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। কাজেই বাংলাদেশ কেন জঙ্গীবাদের টার্গেট হলো তার অন্তর্নিহিত কারণ জানতে হলে বৈশ্বিক দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের গতি-প্রকৃতিকে সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে আর তাহলেই থলের বেড়াল বেরিয়ে আসবে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের অন্যতম ভুসুকুপাদ। চর্যাপদের এই কবি আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে লেখা তার একটি কবিতার কয়েকটি লাইন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সাথে হুবহু মিলে যায়। চর্যাপদের ৬ সংখ্যক পদে ভুসুতুপাদ বলেছেন :

'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু আহেরী'

অর্থাৎ হরিণ নিজ নিজ মাংসের সুস্বাদু গুণের কারণে সকলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সে কারণেই শিকারি ভুসুকু মুহূর্তের জন্য তার পিছু ছাড়ে না।

বাংলাদেশের অবস্থাও তাই। ভূ-কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, অমিত সম্ভাবনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ বিদেশীদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

সাবাস বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হিমালয়ের পাদদেশে বাংলাদেশ নাম নিয়ে ছোট্ট একটি দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ব মানচিত্রের বুকে। ৩৫ বছর পর আজ আবার বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সর্বগ্রাসী বন্যা যখন বাংলাদেশের মাঠ, ঘাট, ক্ষেত-খামার ভাসিয়ে নেয়, ডুবিয়ে দেয় গ্রাম, জনপদ, শহর, নগর করাল গ্রাসে, তারই মাঝে মাথা উঁচু করে যেমন জেগে ওঠে দীঘি, ধানের শীষ। বাংলাদেশ দাঁড়িয়েছে তেমনি করে। কিন্তু আজ বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে, জঙ্গীবাদ দমনকারী হিসেবে অর্জিত কৃতিত্বে বাংলাদেশের মাথা শুধু হিমালয় নয়, ছাড়িয়ে গেছে স্ট্যাচু অব লিবার্টিকেও। তারুণ্যের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাই বলতে পেরেছিলেন :

'সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

ড. মুহম্মদ ইউনূসের নোবেল বিজয় তেমনই একটি নতিজা। আজন্ম যে দেশটি দারিদ্র্যের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে আছে আজ সেই বিশ্বকে দেখিয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ। নোবেল পুরস্কারের শতাধিক বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশী ড. মুহম্মদ ইউনূসই প্রথম যিনি অর্থনীতির উপরে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পেলেন। তার এই পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রমাণ করলো আমরা শুধু ভিক্ষার থলে নিয়ে বিশ্বের দরোজায় দাঁড়িয়ে নেই। আমাদের ভিক্ষার থলি থেকে যে মাইক্রো ক্রেডিট তত্ত্ব বের হয়েছে তা আজ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজে লাগছে। আমাদের ব্র্যাক আজ বিশ্বের দেশে দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের মশাল হাতে নিঃস্ব মানুষের হাতে সম্বল তুলে দিচ্ছে। আমরা শুধু বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত দেশই নই বরং বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আমাদের দক্ষতা থেকে বিশ্ব আজ শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসীকে আজ তাই বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল অনুকরণ করতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একই আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতিও।

বিশ্ববাসীকে আজ একথা জোর গলায় বলার সময় এসেছে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশের জন্ম তা কখনো ব্যর্থ হবে না, অকার্যকর হবে না। অনেক চাপ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি সুবিধা দিইনি বরং তাদের মুখের উপর তাদের প্রণীত দলিল পিআরএসপি ছুড়ে দেবার সামর্থ্য রাখি। বিশ্বব্যাংকের টাকা না হলে যে দেশটির বাজেট অসম্ভব তাদের পক্ষে এই সাহসটি অনেক বড় দু:সাহস। আমরা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের মুখের উপর বলে দিতে পারি, জাতিসংঘ ছাড়া শুধু তাদের কথায় আমরা কোনো দেশে আমাদের সৈন্য পাঠাবো না। আমরা ট্রানজিট, করিডোর, গ্যাস রফতানী ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পেরেছি। প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে পেরেছি আমাদের কয়লা খনিজ সম্পদ। ফুলবাড়ি আমাদের সে শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের ভূখণ্ডের প্রতি কারো লোলুপ হাত প্রসারিত হলে তার কী পরিণতি হতে পারে বড়াইবাড়ির দিকে তাকিয়ে বিশ্ববাসী জেনে নিতে পারে। একইভাবে ভারত, পাকিস্তান, স্পেন, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র শুধু নয়, এমনকি তাদের সম্মিলিত শক্তি যা পারেনি, বাংলাদেশ আজ তাই করে দেখিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, স্পেন, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সম্মিলিত শক্তি পারেনি তাদের দেশের আত্মঘাতী বোমা হামলা ও সন্ত্রাসবাদের মূল হোতাকে জীবন্ত নি:শর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করাতে। কিন্তু বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পেরেছে। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীদের চাপিয়ে দেয়া জঙ্গীবাদের নীলনকশাও আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। এ রকম আরো শত শত গর্বের অর্জন আছে আমাদের– ৩৫ বছরের বাংলাদেশের। তাই আজ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় কণ্ঠ মিলিয়ে বিজয়ের কোরাস গাইতেই পারি–

'বন্ধু, তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ
সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি
বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'।

"বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে সমাজে ত্রাস ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং এসব অপকর্মের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা এক ভয়ঙ্কর ফেৎনা। ফেৎনা হত্যার চেয়েও জঘন্য। অতএব, এরূপ কাজের সাথে জড়িত বিপথগামী লোকদেরকে সম্ভব হলে তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে বুঝানো প্রয়োজন। সঠিক পথে ফিরে না আসলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।"

–মুফতী আব্দুর রহমান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

www.pathagar.com

কেন এই বোমা হামলা

আবারও আত্মঘাতী বোমা হামলা হলো গাজীপুরে। এ নিয়ে তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বোমা হামলা হলো। এবার বোমা হামলা হলো গাজীপুর ডিসি অফিসে। হামলাকারী চায়ের ফ্লাক্সে করে ডিসি অফিসের গেটে পুলিশের চেকিংয়ের কাছে এসে বোমা হামলা চালিয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর তারিখের এই বোমা হামলায় ১ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছে। এর আগে গত ২৯ নভেম্বর একযোগে গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। এতে ১০ জন নিহত এবং ৯০ জন আহত হয়েছে। ২৯ নভেম্বর বোমা হামলার পর গাজীপুর জুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ও সরকারের জঙ্গীবিরোধী ব্যাপক অভিযানের মধ্যেও মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে গাজীপুরে আবার বোমা হামলায় দেশে জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে এবং একই সাথে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। কেননা টি-ফ্লাক্সে করে জেএমবি সদস্যরা যে বোমা হামলা করতে পারে এমন একটি তথ্য সরকারের কাছে আগে থেকেই ছিল। ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার পর রাজশাহীতে ধৃত এক জেএমবি সদস্য জেআইসিতে জিজ্ঞাসাবাদে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এ মর্মে তথ্য দিয়েছিল যে, তারা অচিরেই টি-ফ্লাক্স ব্যবহার করে ১৭ আগস্টের মতো সারা দেশে আরো একটি বোমা হামলা চালাতে যাচ্ছে।

এদিকে ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠি জেলায় জেএমবি'র আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমদ এবং সহকারী জজ জগন্নাথ পাঁড়ে। এর আগে গত ৩ অক্টোবর দেশের তিনটি জেলা লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম জেলার আদালত এজলাসে প্রকাশ্যে বিচারককে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো এবং ১৮ অক্টোবর সিলেটে বিচারক বিপ্লব গোস্বামীকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো। তুলনামূলকভাবে সীমিত আকারে হলেও এ বোমা হামলায় হতাহতের সংখ্যা ১৭ আগস্টের বোমা হামলার প্রায় সমান। এসব বোমা হামলায় জেএমবি আত্মঘাতী পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় হামলাকারী জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য ইফতেখার হাসান মামুন (২৩) গুরুতর আহত হয়েছে। তবে হামলার পর মামুন জনতার হাতে ধরা পড়লে নিজ দেহে রক্ষিত দ্বিতীয় বোমাটি'র বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহত্যার

www.pathagar.com

(তার মতে শহীদ) চেষ্টা করেছিল। তবে তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে। হামলাকারী মামুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে সে এই বোমা হামলা চালিয়েছে। জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান এ বোমা হামলা চালানোর ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল। শহীদ হওয়ার ইচ্ছে নিয়েই সে এ বোমা হামলা চালিয়েছে এবং সারা দেশে এ রকম আরো বোমা হামলা চালানো হবে বলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরো জানিয়েছে মামুন। চট্টগ্রামে ২৯ নভেম্বর বোমা হামলায় জড়িত জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য আলী হোসেন মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তারের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে একই ধরনের কথা বলেছে। গাজীপুরে আহত জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্য আবদুর রাজ্জাক ডাক্তারদের কাছে বলেছে, তাদের নেতা তার হাতে বোমা তুলে দিয়ে বলেছে- যাও, বেহেস্তের চাবি দিয়ে দিলাম।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর ইতোমধ্যে তিন মাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার এ বোমা হামলার খলনায়ক বা নাটের গুরুদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এমনকি এ বোমা হামলা প্রতিরোধে ব্যর্থতার দায়ে আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কারো বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়াও হয়নি। পুলিশ অবশ্য আবদুর রহমানের জামাতা আবদুল আউয়ালকে গ্রেফতার ও রংপুরে নুরপুরে জেএমবি'র উত্তরাঞ্চলীয় প্রধান ঘাঁটি খুঁজে বের করতে পারায় কিছুটা কৃতিত্বের দাবী করতেই পারতো, তবে খোদ রাজধানীতে আবদুর রহমানের লুকিয়ে থাকা এবং অভিযানের আগে পালিয়ে যাওয়ায় সে কৃতিত্বের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের এতসব এলাহি কাণ্ডের পরও বিশেষ করে সার্ক উপলক্ষে রাজধানীতে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে চিরুনী অভিযানের পরও খোদ রাজধানীতে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মতো আবদুর রহমানের টানা তিন মাস বাসা ভাড়া করে বসবাস দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ফাটল চিহ্নিত করেছে। একেই বলে বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো। একইভাবে উত্তরাঞ্চলেও জেএমবি'র প্রধান ঘাঁটিতে অপারেশনের আগেই জেএমবি সদস্যদের পালিয়ে যাওয়ায় সরকারের চলমান জঙ্গী বিরোধী অভিযান প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

পুলিশের দাবী ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় জড়িত থাকার দায়ে এ পর্যন্ত তারা চার শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং ৩৪টি বোমা হামলার ঘটনায় চার্জশীট দিয়েছে। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় জড়িত থাকার দায়ে যাদের গ্রেফতার করেছে তাদের মধ্যে বোমা হামলার সাথে সরাসরি জড়িত বা জেএমবি'র সদস্য শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। পুলিশ নিজেদের ঢাকতে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক নিরীহ আলেমদের গ্রেফতার করেছে এবং জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি নিয়েছে অথবা পুলিশী নির্যাতন থেকে বাঁচতে তারা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। সরকার হরকাতুল জেহাদ নেতা মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করেছে। এটা নিশ্চয়ই সরকারের একটি বড় সফলতা। কেননা, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সামগ্রিকভাবে সরকার কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। মুফতি হান্নান টুঙ্গীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসমাবেশে বোমা পোঁতার দায়ে অভিযুক্ত। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১৭ আগস্ট বোমা হামলার সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রমাণ করতে পারেনি। অবশ্য এ ব্যর্থতার পুরোটাই যে গোয়েন্দা সংস্থার তা নয়। এর সাথে অনেকাংশে জড়িয়ে আছে সরকারী ব্যর্থতা বা সদিচ্ছার অভাব। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের চলমান বোমা হামলার সাথে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট তথ্য প্রমাণও পেয়েছেন। কিন্তু এসব তথ্য সরকারের কাছে তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে

www.pathagar.com

উল্লেখ করলে সরকার তাতে বিব্রত বোধ করে এবং তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বিভিন্ন সময়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এই লেখককে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বোমা হামলার সাথে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতার অনেক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকারের কাছে তা বলতে গেলে সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয় এসব বিষয় নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু খুঁজে দেখ বাংলাদেশের ভেতরে কারা এই বোমা হামলার সাথে জড়িত। ১৭ আগস্ট বোমা হামলা তদন্তের সাথে জড়িত সারা দেশের আইও বা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সম্প্রতি ঢাকায় তলব করে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে জানা গেছে। সেখানে তাদের কি ব্রিফ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলেও অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে, তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে তদন্তে যদি বোমা হামলায় কোনো বিদেশী সংশ্লিষ্টতার তথ্য বেরিয়ে আসে তাহলে তা যেন সরকারকে জানানো হয় কিন্তু কোনো অবস্থায়ই সেটা যেন চার্জশিটে উল্লেখ না করা হয়। এটা পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত ঝর্ণাধারার উৎস বন্ধ না করে পাদদেশে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টার নামান্তর।

প্রকৃতপক্ষে আ.লীগ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যেসব চাঞ্চল্যকর বোমা হামলা হয়েছে সেগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এসব বোমা হামলার তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্টগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, ২১ আগস্ট আ.লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের প্রধান বিচারপতি জয়নুল আবেদিন পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'অখন্ড পাকিস্তান যারা মেনে নিতে পারেনি তারা এই বোমা হামলা চালিয়েছে।' ১৭ আগস্ট পরবর্তীকালে জেএমবি'র বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে যেসব এক্সপ্লোসিভ পাউডার ও জেল পাওয়া গেছে তাতে প্রতিবেশী দেশের একটি কোম্পানীর নাম উল্লেখ আছে। তারপরও সরকার এ বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সার্ক সম্মেলনের সাইড লাইন কূটনৈতিক বৈঠকে খালেদা জিয়া এ বিষয়ে মনমোহন সিং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনার কোনো এজেন্ডায় রাখা হয়নি ঐ বৈঠকে। সরকারের এই সিদ্ধান্তহীনতা ও দ্বিধার ফলে বোমাবাজদের বাড় আজ এত বাড়ন্ত।

প্রকৃতপক্ষে জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ সংখ্যালঘু নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থানে প্রশ্রয়দান ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মোকাবেলায় শুরু থেকে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আবার কোনো ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিলেও তা ছিল ভুল। যেমন, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়। বাংলাদেশে যারা কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন করেছে তাদের প্রধান দাবী ছিল কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা। এটা করা হলে বাকী সব ছোটখাটো দাবী এমনিতেই বাস্তবায়িত হয়ে যেত। এছাড়া আলেম সমাজের কেউ এমন দাবী করেনি যে, কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ করতে হবে, বাংলাদেশ থেকে বের করতে হবে, উপাসনালয় ভেঙে দিতে হবে বা এমন অন্য কিছু। বাংলাদেশে মুসলিম ছাড়াও আরো অনেক ধর্মাবলম্বী আছে। তারা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন ও প্রচার করছে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অধিকার সমহারে ভোগ করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষিত সংখ্যালঘু প্রিভিলেজ কোটার সুযোগও তারা ব্যবহার করছে। কাদিয়ানীদেরও এসব সুযোগ দিতে বাংলাদেশের কোনো আলেমের আপত্তি আছে এমন কথা জানা যায়নি। শুধু মুসলিম সেজে তারা যেন মুসলমান সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা ছিল আলেম সমাজের দাবী। সরকার সাংবিধানিকভাবেই এ কাজটি

www.pathagar.com

করতে পারতো। কেননা, আমাদের সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদের ১(ক) ধারায় বলা হয়েছে : "আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।" এই 'আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে'-র প্রয়োগ করে সরকার নিজের ঘাড় বাঁচিয়ে সহজেই সমস্যাটির সমাধান করতে পারতো। কিন্তু তা না করে ধর্ম মন্ত্রণালয় কাদিয়ানীদের পুস্তক ও প্রকাশনা নিষিদ্ধের যে প্রজ্ঞাপন জারী করেছিল তাতে কাদিয়ানী বা মুসলিম সমাজ কেউ তো খুশী হতে পারেইনি, উল্টো দাতাদের জেরার জবাব দিতে দিতে সরকারকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে।

একই ঘটনা ঘটেছে তথাকথিত ইসলামী উগ্রবাদীদের তৎপরতা দমনের ক্ষেত্রেও। সরকার শুরুতে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি'র অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। অন্যদিকে সর্বহারাদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরুতে সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের 'জাগ্রত জনতা'র কর্মকাণ্ডকে সরকারের একটি অংশ সাপোর্ট দিয়েছিল বলে শোনা যায়। পরবর্তীকালে বাংলাভাইয়ের বিরুদ্ধে সরকার একশনে গেলে বাংলাভাই অওয়ামী লীগ নেতা ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম এমপি'র আপন দুলাভাই জেএমবি নেতা শায়খ আবদুর রহমানের সাথে হাত মেলায়।

প্রশ্ন হল, কেন এই বোমা হামলা? জেএমবি দাবী করছে বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য তারা এই বোমা হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য এভাবে বোমা হামলা চালিয়ে মুসলমানদের হত্যা ইসলামে জায়েজ কি? বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আছে। এসব দল ও সংগঠনে দেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ ধারার বাইরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত হাক্কানী আলেম, পীর, আউলিয়া ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তাদের কেউ আজ পর্যন্ত এভাবে বোমা হামলা করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার চেষ্টাকে সমর্থন করেছেন এমন কথা কোথাও শোনা যায়নি। বরং বায়তুল মোকাররমের খতীব থেকে শুরু করে এসব আউলিয়াগণের অনেকেই প্রকাশ্যে এ ধরনের বোমা হামলাকে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বাংলাদেশে জেএমবি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইহুদী-খৃষ্ট-ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদরত মুজাহিদদের জিহাদের কাহিনী ও কলাকৌশল দেখিয়ে তাদের সদস্যদের উজ্জীবিত করছে ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু সেসব স্থানের পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এক নয়। কেননা, ফিলিস্তিন ও ইরাকে আরব মুজাহিদগণ জিহাদ করছেন ইহুদী-খ্রীষ্ট মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। বসনিয়া, চেচনিয়াতে মুসলমানরা যুদ্ধ করছে খ্রীষ্টবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, কাশ্মীরে মুজাহিদগণ জিহাদ করছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। বর্তমান বিশ্বের কোথাও মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে না। ইরান, ইরাক বা পাকিস্তানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বে এ রকম বোমা হামলা বা নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু নাইন-ইলেভেন পরবর্তীকালে সে পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। তাহলে বাংলাদেশে জেএমবি কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে?

ইসলামে এক মুসলমান কর্তৃক অন্য মুসলমানের জীবন ও সম্পদ বিনষ্টের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার

www.pathagar.com

প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা নিসা-৯৩)। হাদীসে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী (শয়তানী কাজ) আর মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী। (বুখারী-হা. ৬৫৮৩)। অপর একটি হাদীসে আরো বলা হয়েছে, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আবযা (রা.) বললেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো : "এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।" অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'বানী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং নবী (সা.) এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, আমার যদি কোনো কাফিরের সাথে লড়াই হয় আর যদি সে তরবারীর আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং তারপর কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? রাসূল (সা.) বললেন, না তাকে হত্যা করবে না। মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর একথা বলছে। রাসূল (সা.) আবার বললেন, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে। (বুখারী-হা. ৩৭২০)। এদিকে ইসলামের ইতিহাসও প্রমাণ করে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে যুগে যুগে ইসলামের শত্রুরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যম মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আর তখনই দুনিয়াতে ইসলামের পরাজয় ঘটেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এই বোমা হামলায় লাভবান হচ্ছে কারা? বোমা হামলায় বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানরা কি কোনোভাবে লাভবান হচ্ছে? সন্দেহ নেই সার্ক সম্মেলনের পর যখন দেশবাসী ও মিডিয়াগুলো যখন সুষ্ঠু সার্ক সম্মেলন আয়োজনে সরকারের সফলতা নিয়ে মূল্যায়ন করতে শুরু করেছিল তখনই এই বোমা হামলা সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের ধারণা, চলমান সমাজের ঘুষ, দুর্নীতি, ধর্ষণ, অস্থিরতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ যখন ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নেয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। সে সময় ইসলামের এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে ইসলামকে বিকৃতরূপে জনগণের সামনে তুলে ধরে মানুষকে ইসলামের দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে এই বোমা হামলা চালানো হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে শত্রুরা মুসলমানদের মধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করেছে। তারা ইসলামের লেবাসে মুসলমান সমাজে মিশে গিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেমন যে মৌলবাদ একসময় ছিল আজকের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্রান্ড লেভাই জীনস-এর আদি মালিক লেভাই বংশ সংশ্লিষ্ট ইহুদী ধর্মীয় গুরু র‍্যাববাইদের সাথে ইহুদী ধর্মের আদি কিতাবের দ্বন্দ্ব, যে মৌলবাদ ছিল বাইবেল বনাম গির্জার দ্বন্দ্ব, যে মৌলবাদ ছিল গির্জা বনাম খ্রীষ্টিয় সমাজসমগ্রের দ্বন্দ্ব–সেই মৌলবাদকেই আজ ইহুদী-খ্রীস্ট চক্র মুসলমান সমাজে চালান করে দিয়ে তাদের উপর নিপীড়ন করছে।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা লরেন্স কিংবা হামফ্রে-র ইতিহাস আমাদের অনেকের জানা আছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা লরেন্স হলিউডি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 'লরেন্স অব এরাবিয়া' নামে

www.pathagar.com

বিশ্বখ্যাত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই লরেন্স আরব মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে খালিফাকে তুর্কি বলে তার বিরুদ্ধে আরব মুসলমানদের একত্র করে যুদ্ধে নামিয়েছিল। অন্যদিকে জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা প্রদত্ত তথ্যানুসারে জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন ইসলামী চিন্তা, বিজ্ঞান ও খেলাফতের পাদপীঠ ইস্তাম্বুলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা হামফ্রেকে প্রেরণ করে তারা। লম্বা দাড়ি, পাগড়ি-জোব্বা পরা হামফ্রে নিজেকে সুদূর আলজেরিয়া থেকে ইস্তাম্বুলে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে আসা এক যুবক বলে পরিচয় দেয় এবং আশ্রয় নেয় ইস্তাম্বুলের একটি মসজিদে। 'মোহাম্মদ' নামে পরিচয় দানকারী ধর্ম শিক্ষায় প্রবল আগ্রহী এই যুবককে মসজিদের ইমাম সরল বিশ্বাসে কাছে টেনে নেন। মোটামুটি ইসলামের তাহজীব-তমুদ্দুন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং নিজেকে মুসলিম সমাজে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পর 'শায়খ মোহাম্মদ' নামধারণ করে হামফ্রে ইসলাম প্রচারে ইস্তাম্বুল থেকে দূরে সমুদ্র সন্নিকটস্থ বসরায় চলে আসেন। বসরার লোকেরা ইস্তাম্বুল থেকে আসা নুরানী চেহারার এই লোককে বিশ্বাস করতে শুরু করে। কুরআন ও হাদীসে যা সুস্পষ্টভাবে হালাল বলে উল্লেখ নেই এমন সব কিছুকে বিদআত ও হারাম আখ্যা দিয়ে কথিত শায়খ মোহাম্মদ বসরার লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করে। যেমন জিকির বিদআত, মিলাদ পড়া, কবর জিয়ারত করা, তসবিহ পাঠ করা বিদআত প্রভৃতি। এভাবেই শায়খ মোহাম্মদ ও তার অনুসারীগণ মুসলিম বিশ্বে বিদআত শিক্ষা দিতে থাকেন এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের উস্কানী দিতে থাকেন। এই ব্রিটিশরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক শিয়া সুবেদারকে পারস্যে এনে বসায় 'আড়াই হাজার বছরের পুরাতন রাজবংশের উত্তরাধিকারী' হিসাবে 'আরিয়া মেহের' বা আর্য সূর্য উপাধি দিয়ে। এভাবেই পারস্যের শিয়া সুবেদার হলে পাহলভী সম্রাট। ঠিক এখন যেভাবে বসানো হচ্ছে আহমদ চালাবি ও হামিদ কারজাইদের। মধ্যপ্রাচ্যে এরা আরব-তুর্কী বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলিম জাহানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। আবার ভারতীয় উপমহাদেশে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল আর্য-অনার্য ধুয়া তুলে। আবার আরেক সাম্রাজ্যবাদের লাল পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকার আন্দোলনের কথা জানি। আবার সেই লাল পতাকা দমনে সেই মার্কিনীদের আল কায়েদা তৈরীর কাহিনীও আমরা জানি। কাজেই আজকের জেএমবি নেতাদের কেউ কেউ যে লরেন্স বা হামফ্রের ভূমিকায় কাজ করছে না বা তাদের দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে না এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। বরং অবস্থাদৃষ্টে সে সম্ভাবনাই বেশী বলে মনে হয়।

ঘটনা বিচারে ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেসব বোমা হামলা হয়েছে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে ১৭ আগস্ট ২০০৫ পূর্ববর্তী বোমা হামলা আর অন্যভাগে ১৭ আগস্ট ও তার পরবর্তী বোমা হামলা। ১৭ আগস্ট পূর্ববর্তী যেসব বোমা হামলা হয়েছে তার দায়ভার কেউ স্বীকার করেনি। তিনটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও এসব বোমা হামলার সাথে আজ পর্যন্ত ইসলামপন্থীদের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়নি এবং এসব বোমা হামলার সাথে জড়িতদের ধরতে বিএনপি বা আ.লীগ কোনো সরকারকেই যথেষ্ট তৎপর দেখা যায়নি। কিন্তু ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর এই প্রথম একটি সংগঠনকে বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করতে দেখা গেছে, এই বোমা হামলার সাথে ইসলামপন্থীদের জড়িত থাকার প্রমাণও পাওয়া গেছে এবং এ বোমা হামলায় জড়িতদের ধরতে প্রশাসন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। আর এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বলে যে প্রচারণা চলছে দীর্ঘদিন ধরে তার একটা ভিত্তি তৈরী হলো। কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে,

www.pathagar.com

শক্তিটি বাংলাদেশকে মৌলবাদী, তালেবান, অকার্যকর, ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে চিত্রিত করতে চায় চলমান বোমা হামলার নেপথ্য নায়ক তারাই।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংসদে দেয়া এক ভাষণেও একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ঐ ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমি স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানাতে পারি, ধর্মীয় উগ্রবাদে আক্রান্ত দেশ হিসাবে যারা বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চায়, এটা তাদের কাজ। মুসলিম মেজরিটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে যারা আমাদের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারছে না, এটা তারা করেছে। সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যারা ঈর্ষান্বিত, তারা এর সঙ্গে জড়িত।' দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তারা বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে কোনো 'লরেন্স' বা হামফ্রে' তৈরী করতে বা তাদের ইন্ধন অনুপ্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের সরলমতি, স্বল্প শিক্ষিত কিছু ব্যক্তি না বুঝে বা ভুল বুঝে তাদের সেই ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে।

(ইনকিলাব : ৪-১২-২০০৫)

"বোমা মেরে নিরীহ-নিরপারাধ মানুষ হত্যা করা ইসলামে কুফুরী কাজ। এ কাজটি জাহান্নামের পথ; জান্নাতের নয়। এ কাজে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও ঘৃণিত"।

-মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

গালফ ওয়্যারের পর সারা বিশ্বে নিরাপত্তার ধারণাতে পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে ৯/১১ এর পরে তা আরো সুস্পষ্ট হয়েছে। আজ বিশ্বের কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, মাদ্রিদ কোথায় বোমা হামলা হচ্ছে না? অভিবাসী বিক্ষোভকারীদের জ্বালানো আগুনে ফ্রান্স জ্বলেছে সপ্তাহ ধরে। আমাদের পাশের দেশ ভারতে প্রতি মাসেই ছোট বড় একাধিক বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়াও প্রায়শ ঘটে আরো নানা প্রকারের নাশকতার ঘটনা। গত ২৯ অক্টোবর ২০০৫ দিল্লীতে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং এতে নিহত হয়েছে ৮০ জন, আহত দুই শতাধিক ভারতীয়। এরপর পাকিস্তানেও হয়েছে বড় রকমের বোমা হামলা। কিন্তু বাংলাদেশে বোমা হামলা হলেই নিরাপত্তার অজুহাত তুলবেন মনমোহন সিং আর তার সারথি অরবিন্দু আদিগা রিপোর্ট লিখবেন 'স্টেট অব ডিসগ্রেস'। মনমোহন সিং-এর মন বোঝা যায়, অরবিন্দু আদিগার উদ্দেশ্যও বোঝা যায়, কিন্তু বাংলাদেশের কিছু পত্রিকার এক শ্রেণীর সম্পাদক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য বোঝা দায়। এরা বাংলাদেশে পান থেকে চুন খসলেই এদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র, অকার্যকর রাষ্ট্র, জঙ্গী রাষ্ট্র লিখে কলমের কালি ফুরিয়ে ফেলেন– যেন বাংলাদেশ ব্যর্থ হলে তাদের কত লাভ! অথচ এরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। ৩০ কোটি শহীদের রক্তের দামে কেনা এই দেশটিকে ব্যর্থ বলতে তাদের এতটুকু বাধে না। কাজেই লিখে বা অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশকে যারা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, অকার্যকর, ব্যর্থ কিংবা জঙ্গী রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করতে পারেনি এ বোমা হামলার পেছনে তারা বা তাদের প্রভুদের পরোক্ষ হাত নেই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ কোটি। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। এই বার কোটি মুসলমানের মধ্যে জেএমবি'র সদস্য সংখ্যা ১ কোটি বা ১ লাখও নয়– মাত্র কয়েক হাজার। এই মাত্র কয়েক হাজার লোকের জন্য সাড়ে ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশকে অকার্যকর, ব্যর্থ, জঙ্গী বলা কতটা সঙ্গত সে প্রশ্ন দেশবাসী ঐসব পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের করতেই পারেন। অথচ সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সশস্ত্র স্বাধীনতাকামীর সংখ্যা কয়েক কোটি। তারপরও ভারতকে কেউ ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে না।

গ্রেফতারকৃত জেএমবি সদস্য মামুন, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রহমানের জামাতা আবদুল আউয়ালের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা পিলে চমকে ওঠার মতো ভয়ঙ্কর। এছাড়াও প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে জেএমবি সদস্যরা যেভাবে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না এবং তাদের এ হুমকি যে কোনো উড়ো চিঠি বা অন্তঃসারশূন্য নয় ইতোমধ্যে জেএমবি তা প্রমাণ করেছে চট্টগ্রামে ও গাজীপুরে পঞ্চমবারের মতো হামলা করে। 'মরলে শহীদ- বাঁচলে গাজী' এই নীতিতে জেএমবি'র আত্মঘাতী সদস্যরা প্রাণ দিয়ে হলেও কেন্দ্রীয় নির্দেশ মোতাবেক দেশের যে কোনো স্থানে বোমা হামলা চালাতে প্রস্তুত এবং এর প্রমাণও তারা ইতোমধ্যে দিয়েছে। ঢাকায় র‍্যাবের অপারেশনের আগ মুহূর্তে আবদুর রহমান পালিয়ে গিয়েছেন, রংপুরের নুরপুরে জেএমবি'র প্রধান ঘাঁটিতে বড় ধরনের অপারেশনেও একই অবস্থা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় প্রশাসনে জেএমবি তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে (সচিবালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাবুল আনসারী তার প্রমাণ) এবং দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীতেও তারা যে ইতোমধ্যে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণও এখন পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর সোর্স ও সদস্য পরিচয়পত্র

www.pathagar.com

তৈরী করে জেএমবি সদস্যরা সবার চোখের সামনে দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে বলেও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। আরো জানা গেছে, আক্বীদাগতভাবে জামায়াত জিহাদে বিশ্বাসী এবং তাদের সদস্যদের এ ব্যাপারে পড়াশোনাও করতে হয়। '৮০ ও '৯০-র দশকে জামায়াত যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে তখন তারা প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার সশস্ত্র সংগ্রামকে জিহাদ আখ্যা দিয়ে সদস্যদের অনুপ্রেরণা দিত। বিশেষ করে জামায়াতের মধ্যে আহলে হাদীস সমর্থিত গ্রুপটি একটি ক্ষুদ্র অংশ এই ধারার সমর্থক। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে সফল হওয়ায় জামায়াত ক্রমশ গণতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লে তাদের সেইসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা কর্মহীন হয়ে বেকায়দায় পড়ে যায়। একসময় তারা জামায়াতকে বিভ্রান্ত ও পুঁজিবাদের দোসর মনে করে আলাদা ফোরাম খুঁজতে শুরু করে এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে জেএমবি। ফলে জামায়াতের সেইসব সদস্যরা জামায়াত ত্যাগ করে জেএমবিতে যোগ দেয় আর এভাবেই খুব সহজে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য দিয়ে জেএমবি সারা দেশে তাদের নেটওয়ার্ক তৈরী করে ফেলে। ১৭ আগস্ট বোমা হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশের কাছে ধৃত অনেকেই সাবেক শিবির কর্মী বলে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত রমজানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিএনপি'র বিভাগীয় সম্মেলনে এক নেতা জেএমবি নেতাদের ধরে ক্রসফায়ারে দেয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু ক্রসফায়ার করে বা আবদুর রহমানের মতো জেএমবি'র পালের গোদাদের ধরে এই বোমা হামলা বন্ধ করা যাবে না। কারণ ইতোমধ্যে জেএমবিতে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরী করা হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়- 'যারা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়ায়' তাদেরকে র‍্যাব দিয়ে, ক্রসফায়ার করে, গানম্যান দিয়ে দমন করা যাবে না। এখনতো যান মানদের উপর হামলা চলছে। যারা একটি আদর্শের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে, বিশেষ করে সেই আদর্শ যদি হয় জিহাদী বা শহীদী তামান্নার তাহলে তাদেরকে কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব নয়। ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিস্তিন, এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে– কেউ কোথাও পারেনি। বিশ্বে এমন একটি নজীরও নেই। যে মানুষটি 'সত্য, মুক্তি, স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের, খোদার রাঁহায় প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের' চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রাস্তায় বের হয় তার কাছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী, সর্বাধুনিক গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি অসাড় হয়ে পড়ে। চলমান বিশ্বের দিকে তাকালে এর ভূরি ভূরি নজীর চোখে পড়বে সহজেই। জামায়াতুল মুজাহিদীনের সদস্যরা সেই চেতনায় উজ্জীবিত (আসলে বিভ্রান্ত)। তাদেরকে 'গানম্যান' দিয়ে দমন করা যাবে বলে যারা ভাবছেন তারা আসলে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছেন। চট্টগ্রামে বোমা হামলাকারী বিচারকদের রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের উপরই সরাসরি হামলা চালিয়েছে। কাজেই আমরা ইরাকে যেমন দেখছি, মুজাহিদরা নিজেদেরকে শরীরকে মানববোমায় পরিণত করে দ্রুত মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে ঢুকে বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ক্রমশ সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে চলমান বোমা হামলা আসলে মূল টার্গেটের ড্রেস রিহার্সেল মাত্র– গান শুরুর আগে যন্ত্রীরা যেমন বাদ্যযন্ত্রে কিছুক্ষণ তাল উঠিয়ে নেন। জেএমবি বা অন্য বোমা হামলাকারীরা যেদিন সত্যিকার টার্গেটে হিট করানো হবে সেদিন এইসব পত্রিকার সম্পাদক আবার বলবে 'সাপ নিয়ে খেললে এই পরিণতিই হয়!' চলমান বোমা হামলা সে প্রেক্ষাপট তৈরীর কাজ করছে বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

চর্চা থাকুক আর না থাকুক বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ ইসলামভীরু। আরবী না জানার কারণে ইসলামের মূল কথা তাদের পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয় না। ফলে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানে বা বোঝে মূলত আলেমদের বক্তব্য শুনে। যুগে যুগে মতলববাজ আলেমরা নিজ স্বার্থে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে খুব সহজেই এ দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে সমাজে নানা ধরনের ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে। অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে তাদের কাজটি আরো সহজ হয়ে যায়। ১৭ আগস্ট এবং তৎপরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের বেশীর ভাগই কোনো উচ্চ শিক্ষিত আলেম নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা কোনো আলেমই নয়। এইসব স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের সামনে কিছু মতলববাজ বা বিভ্রান্ত আলেম ইসলামী জিহাদকে বিশেষ স্বার্থে উপস্থাপন করে তাদেরকে বিপথগামী করেছে। যেহেতু জিহাদ সম্পর্কে তাদের সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তাই লম্বা দাড়ি, টুপি ও জোব্বাওয়ালা এসব আলেমদের কণ্ঠের সুললিত সুরে 'যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত' (সূরা- আল ইমরান) তেলাওয়াত ও জিহাদের ফজীলত শুনে তারা সহজেই উজ্জীবিত হয়েছে। এরসাথে দরিদ্রতা, বেকারত্ব, হতাশা, সুন্দর ও নির্মল জীবন-যাপনের কোনো পথ খুঁজে না পাওয়ায় আখিরাতের জীবনকেই তারা বেছে নিয়েছে। তাদের মগজে-মননে, চিন্তায় ও বিশ্বাসের পাথরে খোদাই করে দেয়া হয়েছে যে, এভাবে ইসলাম কায়েমের জন্য জীবন দিলে তারা আখিরাতে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহা শান্তিময় জীবন। কাজেই ফাঁসি দিয়ে, জেলে পঠিয়ে, ক্রসফায়ার করে তাদের এ বিশ্বাসের পাথর টলানো যাবে না। বরং তারা হাসতে হাসতে আলহামলিল্লাহ বলে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরবে। ঝালকাঠির আহত জেএমবি নেতা মামুন তার প্রমাণ, যে কিনা আত্মঘাতী বোমা হামলার পরও মরেনি দেখে নিজের কাছে রক্ষিত দ্বিতীয় বোমা ফাটিয়ে শহীদ হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কাজেই সত্যিকার অর্থে সরকার যদি এই বোমা হামলা রোধ করতে চায় তাহলে তাদের সেই ভুল বিশ্বাসের ভিত ভেঙে দিতে হবে। অবশ্য তার মানে এই না যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান কার্যক্রমকে বন্ধ করে দিয়ে কেবল বিশ্বাসের ভিত ভাঙতেই ব্যস্ত হতে হবে। এটা চলবে যেমন জটিল অসুখে আক্রান্ত রোগীর তীব্র যন্ত্রণার সাময়িক উপশমের উপায় হিসাবে। কিন্তু স্থায়ীভাবে সে অসুখ সারাতে হলে বিশ্বাসের ভিত ভাঙার বা তাদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সত্যের আলোয় টেনে আনার কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন মটিভেশন। এ মটিভেশন হতে হবে দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। একটা সাময়িক, অন্যটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সামনে রেখে। কেননা, বিশ্বের সকল শান্তিকামী ও চিন্তাশীল মানুষ বিশ্বাস করে আজ সারা বিশ্বে যে অস্থিরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদের বেসামাল দৌরাত্ম্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বল্গাহীন আগ্রাসন। এই পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং তাকে আরো শক্তিশালী করতে কখনো সরাসরি, কখনো ছদ্মবেশে আবার কখনো তাদের প্রেরিত নিয়োগীদের মাধ্যমে বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়। এজন্য আজ তারা টার্গেট করেছে তৃতীয় বিশ্ব ও ইসলামী দুনিয়াকে। কাজেই যতদিন এই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য বন্ধ না হবে ততদিন জন্ম নেবে নতুন নতুন জেএমবি (বিভিন্ন নামে)।

কাজেই এ মটিভেশন প্রক্রিয়ায় প্রথমেই তাদেরকে এই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের আগ্রাসন এবং তার স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে এ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এরপর

www.pathagar.com

জিহাদের আসল অর্থ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার সঠিক ব্যাখ্যা এদের সামনে তুলে ধরতে হবে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর অবশ্য মটিভেশনের কথা বলেছেন ইতোমধ্যে। কিন্তু এই মটিভেশন লুৎফুজ্জামান বাবর, প্রধানমন্ত্রী, মান্নান ভূঁইয়া, কিংবা নিজামী, মুজাহিদদের দিয়ে করালে কোনো কাজ হবে না। এই মটিভেশনে কাজে লাগাতে হবে বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব, শায়খুল হাদীস আজিজুল হক, চরমোনাই পীর, মুহিউদ্দীন খান, মুফতী আমিনীসহ দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, মসজিদের ইমাম, পীর মাশায়েখগণের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এসব আলেমদের দিয়ে জিহাদ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে হবে। সারা দেশের সকল বিভাগীয় শহর ও জেলাগুলোতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করে এ বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করে সেখানে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বশীল আলেমদের দাওয়াত করে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মাধ্যমে তাদেরকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে ব্যাপক লোক সমাগম হয়। কাজেই এ সমাবেশে কোনো হাক্কানী আলেমদের দিয়ে এ সম্পর্কে দেশবাসীর মাঝে জনসচেতনতা তৈরী করা যেতে পারে।

শীতকালে এমনিতেই দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে ইসলামী জলসা ও ইসালে সাওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। সেসব অনুষ্ঠানে অনেক হাক্কানী আলেম ওয়াজ করে থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতা সে অনুষ্ঠানে ঈমান ও আমল সম্পর্কে জানতে অংশ নেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মাধ্যমে এসব ওয়ায়েজীনদের তাদের বক্তৃতায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের সঠিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানানো যেতে পারে যাতে করে সাধারণ মানুষের মাঝে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে। এক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণে এনে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বই-পুস্তক সরবরাহ করা যেতে পারে যেন তারা মসজিদে গিয়ে খুতবায় এবং নামাজ শেষে মুসল্লীদের মাঝে চলমান বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বক্তৃতা করে। এছাড়াও মসজিদের বাইরে সামাজিকভাবে মানুষকে একতাবদ্ধ করে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাদের পাশের কারো মধ্যে যদি এ ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে সম্ভব হলে তা দূর করার চেষ্টা করে, নাহলে এমন লোকদের সমাজ, দেশ ও ইসলামের স্বার্থে সামাজিকভাবে বয়কট করে ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোচরে আনে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম সরকারের সদস্যদের কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনো এলাকার কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহজনকভাবে বিনা কারণে এলাকার বাইরে দীর্ঘদিন অবস্থান করে বা কোনো এলাকায় কোনো অপরিচিত ব্যাক্তি যদি সন্দেহজনকভাবে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তাহলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে আলীয়া, কওমী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে জিহাদের সঠিক সংজ্ঞা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেননা, ১৭ আগস্ট ও তৎপরবর্তীকালে বোমা হামলাগুলোতে যারা জড়িত তাদের বেশির ভাগই এই পর্যায়ের বা এই পর্যায় থেকে ঝরে পড়া ছাত্র। কাজেই বিভ্রান্ত বা মতলববাজ লোকেরা যাতে এদের বিপথগামী করতে না পারে সেজন্য

www.pathagar.com

সিলেবাসে এটা করা দরকার। একই সাথে সারা দেশের আলিয়া, কওমী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ও নির্দেশিকা প্রদান করতে হবে।

সরকারের একার পক্ষে এই কাজ সম্ভব না হলে এনজিওদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সেটা ব্র্যাক, প্রশিকা, কিংবা আশার মতো এনজিওদের দিয়ে করালে হবে না। এ ব্যাপারে ইসলামী এনজিওগুলোর সাহায্য নিতে হবে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাছাত্রদের মাঝে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কিম হাওয়েলস বলেছেন, বোমা হামলা বাংলাদেশের একার কোনো বিষয় নয়। এটা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা। কাজেই বোমা হামলা নিয়ে নোংরা রাজনীতি না করে এটাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে দেখা উচিত। জাতীয় নেতা-নেত্রীগণ বোমা হামলা নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ব্লেম গেম শুরু করেছেন তা বন্ধ করা উচিত। কারণ আজ যারা ক্ষমতাসীন দলকে বোমা হামলার জন্য দায়ী করছেন, ভবিষ্যতে তারাও যদি ক্ষমতায় আসেন তখনও যে বোমা হামলা হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সেদিন বোমা হামলা হলে তারা কি করবেন? বোমা হামলা নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও তার দলের অন্য নেতারা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন তাকে কোনোভাবেই দায়িত্বশীল বলা যাবে না। বিরোধী দল বোমা হামলাকে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পুঁজি হিসাবে দেখতে চাইছে। তাদের কথায় মনে হয়, এই সরকারের পতন ঘটালেই বোমা হামলা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো, তাদের সরকারের আমলেই এইসব বোমা হামলা শুরু হয়েছে এবং তারা কোনো বোমা হামলার তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় কমিটি পর্যন্ত গঠন করেনি, কোনো হামলাকারীকে গ্রেফতারেও সক্ষম হয়নি। বোমা হামলার সাথে জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা সম্পৃক্ততা প্রমাণে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে যাদের ধরা হচ্ছে তারা জামায়াত নেতাদের আত্মীয়। এ যুক্তিকে ধর্তব্য মনে করা হলে একথা বলতে হয় যে, জেএমবি'র শীর্ষ নেতা শায়খ আবদুর রহমানের আপন শ্যালক হচ্ছে আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম এমপি। কাজেই সে হিসাবে জেএমবি'র সাথে আ.লীগের চেয়ে বেশী আর কারো জড়িত থাকার কথা নয়। অন্যদিকে তারা আরো বলছে বোমা হামলার সাথে সরকার জড়িত বলেই হামলাকারীদের ধরছে না তারা। একই যুক্তিতে বলা যায়, আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত বোমা হামলার দায়ে একজন প্রকৃত হামলাকারীকেও ধরেনি সরকার। কাজেই সেসব বোমা হামলার সাথেও তাহলে আওয়ামী লীগ সরকার জড়িত। ১৪ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জোট সরকারের শরীক দল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের কথা বলে। আবার জেএমবিও ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের কথা বলে। কাজেই জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট জেএমবির বোমা হামলার সাথে জড়িত। অদ্ভুত যুক্তি! পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (হক), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, পৈরাত বাহিনী, গণবাহিনী প্রভৃতি দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী ও জঙ্গীবাহিনীগুলো ইনু মেননদের মতো, কখনো তাদের চেয়ে আরো বেশী জোরালোভাবে বলে। তবে কি ইনু-মেননরাও এসব জঙ্গী দলের গডফাদার। কাজেই ইনু-মেননকে জোটে রেখে ১৪ দলীয় জোটের সাথে সংলাপে

www.pathagar.com

বসার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

এগুলো যুক্তির কথা। দায়িত্বশীলতার নয়। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত এ ধরনের দায়িত্বহীন ব্লেম গেম বন্ধ করা। বোমা হামলার সাথে যদি জায়াতের সংশ্লিষ্টতা আছে বলে কারো কাছে কোনো জোরালো প্রমাণ থাকে তাহরে তাদেল উচিত সুনির্দিষ্টভাবে সে তথ্য সরকার ও দেশবাসীকে জানানো। এধরণের রাষ্ট্রঘাতী বোমা হামলার সাথে যারাই জড়িত থাক দেশবাসী তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তাছাড়া, টুইন টাওয়ারে হামলা, লন্ডনে পাতাল রেলে বোমা হামলা, ভারতে বা পাকিস্তানে বোমা হামলা হওয়ার পর কোথাও সরকারের পতন ঘটেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে মাত্র। কাজেই বোমা হামলা নিয়ে দলীয় নোংরা রাজনীতি বাদ দিয়ে এটাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে চিহ্নিত করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল দলকে তা মোকাবেলার একটি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী পথ খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য সরকারকেও বিরোধী দলের মতামত যেমন শুনতে হবে তেমনি বিরোধী দলগুলোকেও সরকারকে পরামর্শ দিয়ে ও সরকারের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। হরতাল, বোমা হামলা কোনো সমস্যার সমাধান নয়। গাজীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে বোমা হামলার পর আইন পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন ক্ষুব্ধ হবে, নিরাপত্তার দাবীতে আন্দোলন করবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা। আইনের লোক হিসাবে তাদের সেই কর্মসূচি হবে যুক্তিসঙ্গত, আইনসঙ্গত ও সহযোগিতামূলক এমন প্রত্যাশা দেশবাসীর। যত দীর্ঘমেয়াদীই হোক আইন ও আদালতের আওতার মধ্যে যদি তাদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হতো তবে দেশবাসী তাকে স্বাগত জানাতো। কিন্তু তার পরিবর্তে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি সমগ্র দেশে সর্বাত্মক হরতাল ডেকে নিজেদের রাজনৈতিক নেতার স্তরেই শুধু নামিয়ে আনেননি, পেশার প্রতিও অবমাননা করেছেন। আসলে সুপ্রীম কোর্টের কতিপয় নেতা আসন্ন নির্বাচনে আ.লীগ থেকে তাদের নমিনেশন পেতে আদালত প্রাঙ্গণকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছে। কিন্তু আমু তোফায়েল, রাজ্জাকদের মুখের কথা রোকনউদ্দীন মাহমুদ, আমীরুল ইসলাম, মাহবুব আলমদের মুখে মানায় না- একথা তাদের বুঝতে হবে যদি তারা আইন ও আদালতের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চান।

জাতীয় সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে সকল দলের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পাস করতে হবে। এছাড়াও জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব নেই এমন দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সংসদের বাইরেও জাতীয় সংলাপের আহ্বান করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন। যত দ্রুত সম্ভব এই সংলাপ আয়োজন করতে হবে। সমাজের সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষ যাতে এই সংলাপে আসতে পারে এবং তাদের মনের কথা ও প্রস্তাব মুক্ত মনে বলতে পারে সে পরিবেশ সরকারকে তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ জঙ্গীবাদ দমনে কোনো একটি কার্যকর সুযোগও যেন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় হাতছাড়া না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এই সংলাপ অনুষ্ঠান রেডিও ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই সংলাপে সমাজের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্বশীল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রস্তাবগুলো অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবগুলো সংসদের ঐ অধিবেশনে তুলে আইনে পরিণত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার বোমাবাজদের ধরতে দেরিতে হলেও দেশব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে। এটা আরো আগে হলে ভাল হতো। তবে এই গ্রেফতার অভিযান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালিত করতে হবে। গ্রেফতারের সময় নিরীহ আলেমদের উপর যাতে অযথা হয়রানী না করা হয় এবং নির্দোষ আলেমগণ যেন অযথা হয়রানীর শিকার না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে এদেশের ইসলামপন্থীদের কোনো বড় দাবী এই সরকার পূরণ না করলেও সার্বিকভাবে তারা বর্তমান সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। গ্রেফতারের নামে হয়রানী তাদের সেই সহানুভূতিতে যাতে কোনো চিড় না ধরায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আ.লীগ সরকারের আমলে এই আলেমদের উপর বিনা বিচারে নির্যাতনের ফলে তাদের সরকারের অতি আত্মবিশ্বাসের তখতে তাউস বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়েছিল।

যারা এই রাষ্ট্রঘাতী অপকর্মের সাথে জড়িত আইনের আওতায় তাদের যে শাস্তিই হোক শাস্তির পাশাপাশি জেলের মধ্যেই তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে কি ভয়ঙ্কর খেলায় তারা মেতেছে। তাদের এই কাজের ফলে ইসলামের আসলে কোনো উপকার হচ্ছে না। দেশের আলেম সমাজ সার্বিক অর্থে সন্দেহ ও বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। আলেমগণ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের আজ বাড়ি ও মেস ভাড়া দেয়া হচ্ছে না। মাদ্রাসায় দান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চাকরিদাতারা মাদ্রাসা ছাত্রদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আলেমদের বিদেশে গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। রপ্তানী বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণ, বিনিয়োগ প্রবাহ, জনশক্তি রপ্তানী ও দেশের ভাবমূর্তিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। সার্বিক অর্থে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের মানুষের মাঝে ভীতি ও বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। একইভাবে যারা গ্রেফতার এড়িয়ে এখনো বোমাবাজিতে নিয়োজিত তাদেরকেও এ কথাগুলো জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সাথে আলোচনায় বসা যেতে পারে। সরকার যদি শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনায় বসতে পারে তবে জেএমবি'র সাথে বসতে আপত্তি থাকবে কেন। তাদের সাথেও বসার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে, শোনাতে হবে। গণমাধ্যম, পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিলের মাধ্যমে তাদের কাছে একথা পৌঁছানো সম্ভব। অন্যদিকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের কেস স্ট্যাডি করে দেখা গেছে, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা তাদের আত্মঘাতী হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে দিয়েছে। ফলে এসব সামাজিক সমস্যা সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, মাদ্রাসা শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, সত্যিকার ও চিরস্থায়ীভাবে এ বোমা হামলা বন্ধ করতে চাইলে বোমা হামলার নেপথ্য খলনায়কদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচিত করে দিতে হবে। কারণ ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে : 'Prevention is better than cure'.

(ইনকিলাব : ৫-১২-২০০৫)।

www.pathagar.com

বোমা হামলা : নেপথ্যে কারা

গত ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে প্রায় ৫০০ বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। মাত্র ১ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশে নারকীয় বোমা হামলা সম্পন্ন হয়েছে। এতে ৩ জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হয়েছে। বোমা হামলার সংখ্যা বিবেচনায় এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য। এতে অবশ্য সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই। রয়েছে হামলাকারীদের দয়া বা করুণা। কেননা, বোমাগুলোর মধ্যে কোনো স্প্লিন্টার দেয়া হয়নি। ছিল কাঠের গুঁড়া বা ভূষি। সত্যি যদি এই বোমাগুলোর মধ্যে ধ্বংসাত্মক স্প্লিন্টার রাখা হতো বা অন্যান্য বোমা হামলার মতো এগুলো যদি বোমার পরিবর্তে গ্রেনেড হতো তাহলে ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে কী লেখা হতো তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে! কিন্তু হামলাকারীরা অন্তত সেই মুহূর্তে চায়নি এই নারকীয় ইতিহাস রচিত হোক বাংলাদেশের ইতিহাসে। তারা এই বোমা হামলার মাধ্যমে জোট সরকারের পতন চায়নি কিংবা আ.লীগকে ক্ষমতায় বসাতে চায়নি। চায়নি বলেই তারা কোনো সরকারী স্থাপনায় হামলা করেনি। অন্যদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, হামলার সময়ে আ.লীগ নেত্রীর টুঙ্গীপাড়া থেকে মুন্সীগঞ্জ হয়ে ঢাকায় ফেরার রুট নির্ধারিত থাকায় মুন্সীগঞ্জ জেলাকে বোমা হামলার আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। হামলাকারীরা চেয়েছিল দেশবাসীর সামনে তাদের সংগঠনের অস্তিত্ব জানান দিতে।

১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর বাংলাদেশে চলমান বোমা হামলার শিকার বাংলাদেশী ঐতিহ্যের ব্রিটিশ নাগরিক, বাংলাদেশে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন, এটি বোমা হামলার ড্রেস রিহার্সেল মাত্র। আসল বোমা হামলা সামনে রয়েছে। আনোয়ার চৌধুরীর এই বক্তব্য সত্যে পরিণত করতে হামলাকারীরা খুব বেশী দিন সময় নেয়নি। তার প্রমাণ ৩ অক্টোবর ২০০৫ একই কায়দায় দেশের তিনটি জেলা লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামের আদালত এজলাসে প্রকাশ্যে বিচারপতিদের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো এবং ১৮ আক্টোবর সিলেটে বিচারপতি বিপ্লব গোস্বামীকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো। তুলনামূলকভাবে সীমিত আকারে হলেও এ বোমা হামলায় হতাহতের সংখ্যা ১৭ আগস্টের বোমা হামলার প্রায় সমান। কেননা, এ বোমা হামলায় ব্যবহৃত বোমাগুলোতে মারাত্মক স্প্লিন্টার রাখা হয়েছিল।

আবার ১৭ আগস্ট ২০০৫ রাজধানীতে বোমা হামলার সাথে জড়িত গাজীপুরে ধৃত এক জেএমবি সদস্য ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে দেয়া তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে, হামলার আগে তাদের লিডার তাদেরকে বলেছিল এই বোমা হামলার ফলে কেউ মারা যাবে না। কারণ এ বোমাগুলোতে কোনো স্প্লিন্টার রাখা হয়নি। এরপরও বোমা বিস্ফোরণে যেন সাধারণ মানুষ হতাহত না হয় সেজন্য বোমাগুলোকে জনবহুল স্থানে রাখার ব্যাপারে তাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। ঐ হামলাকারী আরো জানিয়েছে, হামলার আগে তাদের বলা হয়েছিল তাদের সংগঠনের অস্তিত্ব জানান দেয়াই ছিল মূলত এই বোমা হামলার মূল লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৯ সালে উদীচীর সমাবেশে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বোমাবাজির যে নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে এই প্রথম কোনো সংগঠন প্রকাশ্যে বোমা হামলার পর তাদের দায়দায়িত্ব স্বীকার করল। এর আগে কোনো বোমা হামলার পর পরই বা দীর্ঘদিন পরও কেউ দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি। আর এখানেই ১৭ আগস্ট বোমা হামলার মূল লক্ষ্য নিহিত। কিন্তু সে লক্ষ্য উদ্ধার করতে গেলে উদীচীর সমাবেশে

www.pathagar.com

বোমা হামলা থেকে শুরু করতে হবে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বিশেষ করে হরতালের মতো সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বোমার ব্যবহার অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু এসব বোমা ছিল সাধারণ হাতবোমা বা পটকা জাতীয়। কিন্তু বিগত আ.লীগ সরকারের আমলে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সাত দলীয় জোট গঠিত হবার পর ১৯৯৯ সালে উদীচীর সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক বিধ্বংসী বোমা হামলার প্রচলন শুরু হয় এবং সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বোমা হামলার পর একটি চিহ্নিত দল, গোষ্ঠী ও মহলের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই এই বোমা হামলার সাথে বাংলাদেশের ইসলামী জনতাকে দায়ী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহলটি এ মর্মে বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন। কিন্তু ১৭ আগস্ট বোমা হামলার আগ পর্যন্ত কোনো বোমা হামলার সাথে ইসলামী জনতার সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায়নি। আ.লীগ সরকারের আমলে ৭টি বড় ধরনের বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। সে সময়ও প্রত্যেকটি বোমা হামলার পর পরই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সে বোমা হামলার সাথে আলেম সমাজকে দায়ী করে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অথচ আলেম সমাজের পক্ষ থেকে দাবী ছিল এ বোমা হামলাগুলোর বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান। কিন্তু তৎকালীন সরকার সে দাবী অগ্রাহ্য করেছিল। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাবেক বিচারপতি আবদুল বারীকে প্রধান করে আ.লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত সাতটি চাঞ্চল্যকর বোমা হামলা তদন্ত করার লক্ষ্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি একটি রিপোর্ট সরকারকে জমাও দিয়েছিল। সে রিপোর্টে আ.লীগ সরকার আমলের প্রত্যেকটি বোমা হামলার সাথে কারা জড়িত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু বিএনপি সরকার রহস্যজনক কারণে সে তদন্ত রিপোর্ট কখনও প্রকাশ করেনি। এরপর বর্তমান সরকারের আমলে ময়মনসিংহের অজন্তা সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর বিচারপতি সুলতান হোসেনকে প্রধান করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি বারী কমিশনের মতো বোমা হামলার সাথে কারা জড়িত তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলেও সে বোমার উৎস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছিল যা বাংলাদেশের বোমা হামলার রহস্য উদঘাটনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সরকার সে রিপোর্টও প্রকাশ করেনি। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ঘটনা এবং মালিবাগের টিএন্ডটি মসজিদের ঘটনার ওপর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সরকারের বিপক্ষে গেলেও সরকার সে রিপোর্টের অনেকটাই কার্যকর করেছে।

হযরত শাহজালালের মাজারে বোমা বিস্ফোরণের পর আনোয়ার চৌধুরী বাংলাদেশের বোমা হামলা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অবশ্যই একজন ভিকটিম হিসাবে সে অধিকার তার আছে। কিন্তু পাশাপাশি সরকারের তরফ থেকে একটি কথা তাকে বলা যেত, শাহজালালের মাজারে বোমা হামলায় বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার মোস্ট সাসপেকটেড ব্যক্তি ঐ বোমা হামলায় আহত ব্রিটিশ নাগরিককে পরে ফেরত দেয়ার কথা বলে কেন সে দেশের সরকার সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ব্রিটেনে নিয়ে গেল? কেনই বা তাকে আর ফেরত পাঠানো হয়নি? কি ছিল এর মধ্যে রহস্য?

সম্ভবত সরকারের এই গোপন করার প্রবণতা লক্ষ্য করেই ২১ আগস্ট বোমা হামলার পর গঠিত বিচারপতি জয়নুল আবেদিন কমিশন বুঝতে পেরেছিল তার এ রিপোর্টও

www.pathagar.com

আলোর মুখ দেখবে না। ফলে সরকারের কাছে জমা দেয়ার আগেই এ রিপোর্টের কিছু চুম্বক অংশ সাংবাদিকদের কাছে চলে আসে বিভিন্ন মাধ্যমে। এতেও ২১ আগস্ট বোমা হামলার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার সে রিপোর্টও প্রকাশ করেনি। ২১ আগস্ট বোমা হামলার সময় সারা বাংলাদেশে প্রলয়ঙ্করী বন্যার উদ্ধার তৎপরতা চলছিল। সারা বিশ্ব এই প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর সাহায্যের হাত বাড়ালেও যাদের কারণে এই বন্যা সেই ভারত বাংলাদেশের সাহায্যে এক ছটাক চালও বরাদ্দ দেয়নি। কিন্তু ২১ আগস্ট বোমা হামলার পর যখন বিভিন্ন মিডিয়ায় ভারতের নাম প্রকাশিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এবং তার **পক্ষ** থেকে ১০০ কোটি রুপী সাহায্যের ঘোষণা আসে। এরপর থেমে যায় সব কিছু। কাজেই বাংলাদেশে চলমান যে বোমা হামলা হচ্ছে তার দায়ভার সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারবে না। কেননা, সরকারের এই লুকোচুরি প্রবণতার ফলেই হামলাকারীদের বাড় এত বাড়ন্ত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সবসময় বলা হয়, সকল বোমা হামলার জন্য একই গ্রুপ দায়ী বা এটা একই গ্রুপের কাজ। সন্দেহ নেই আ.লীগের কথাটি সত্য। কেননা, সকল বোমা হামলার টার্গেট যেহেতু একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী– অর্থাৎ বাংলাদেশের ইসলামী জনতা সুতরাং হামলাগুলো যে একই গ্রুপের পরিকল্পনায় এবং একই লক্ষ্যে প্রণীত এ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই।

১৭ আগস্টের বোমা হামলা বেশ কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই প্রথম কোনো বোমা হামলার পর হামলাকারীদের পক্ষ থেকে বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করা হলো। কেননা, ১৭ আগস্ট যেসব জায়গায় বোমা হামলা করা হয়েছে তার প্রত্যেক স্থানে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি'র পক্ষ থেকে বাংলা ও আরবীতে বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে এবং তাদের দাবীদাওয়া সংবলিত লিফলেট রাখা হয়েছিল। জেএমবি'র সদস্যরা অবশ্যই জানে বাংলাদেশে আরবী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কতজন। আবার যারা আরবী জানেন, এমন নয় যে তারা বাংলা পড়তে পারেন না। তাহলে প্রশ্ন হলো, জেএমবি কেন প্রত্যেক জায়গায় আরবীতে লিফলেট ছড়ালো? আবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বোমা হামলায় জেএমবি'র সাথে জনযুদ্ধের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। তাহলে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে, বাংলাভাই এবং আবদুর রহমানকে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করে লিফলেট ছাড়া হলেও জনযুদ্ধের নেতা আবদুর রশীদ তপন বা মালিথা তপনকে কেন বাদ দেয়া হলো?

অন্যদিকে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর থেকে এ পর্যন্ত যেসব বোমা হামলায় যারা ধরা পড়েছে তারা বড়জোর ২০টি জেলার অধিবাসী। তাহলে বাকি ৪৩টি জেলায় কারা বোমা ফাটালো? জেএমবি'র মতো একটি অখ্যাত একটি সংগঠনের ৬৪ জেলায় নেটওয়ার্ক আছে এটা কোনো সচেতন মানুষই বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাছাড়া এতবড় বোমা হামলার পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ৬ মাস সময়, কয়েক হাজার লোক এবং কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন–এই ব্যাপক আয়োজন একা সম্পন্ন করার মতো সামর্থ্য জেএমবির আছে একথা কোনো সচেতন মানুষ বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। যাদেরকে ধরা হচ্ছে তারা বোমা নিক্ষেপকারী মাত্র। এদের জবানবন্দিতেই বোঝা গেছে তাদের বেশীর ভাগকেই মাত্র সপ্তাহখানেকের প্রশিক্ষণ দিয়ে জেহাদের নামে অপারেশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য তারা জানতেই পারেনি। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যক্রম থেকে জানা যায়, তারা ধরা পড়ার পর জীবন চলে গেলেও সংগঠনের গোপন কথা ফাঁস করে না। অথচ বাংলাদেশে যারা ধরা পড়ছে তারা খুব সহজেই গড়গড় করে মিডিয়ার কাছে পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাদের সকল খবর ফাঁস করে দিচ্ছে। এসব বোমা নিক্ষেপকারীদের উপরে আরো চার থেকে পাঁচটি স্তর থাকতে পারে। কিন্তু সরকারের সেদিকে কোনো আগ্রহই নেই। বোমা হামলার অভিযোগে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ভারতীয় নাগরিক ধরা পড়েছে তাদের রহস্যজনকভাবে দৃশ্যের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একই প্রবণতা দেখা গেছে বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত আরো কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনার ক্ষেত্রেও।

বগুড়ার কাহালুতে এক লক্ষ রাউন্ড গুলী ও দুই শত কেজি বিস্ফোরক উদ্ধারের পর পুলিশের একজন আলোচিত গোয়েন্দা কর্মকর্তা গুলী ও বিস্ফোরক আনলোড করা হয়েছিল যে বাড়িতে সেই বাড়ির গৃহকর্তা কৃষকলীগ নেতা কাজী আফলাকুর রহমান পিন্টুকে আসামী করে আদালতে চার্জশীট দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ একবারও ভেবে দেখেনি যে, একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের সামান্য নেতার একার পক্ষে এই বিশাল গুলী ও বিস্ফোরকের আমদানী করা এবং তা নিয়ে ব্যবসা কিংবা ষড়যন্ত্র করা আদৌ সম্ভব কিনা? কে রয়েছে এর পেছনের গডফাদার? একই ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায়। অস্ত্রবাহী ট্রাক চালক, ট্রাকের মালিক, ট্রলারের চালক, ট্রলারের মালিক নিয়েই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার যত ব্যস্ততা। স্বাভাবিক কারণে এ মামলারও চার্জশীট হয়েছে সেইসব ক্যারিয়ারদের উপর ভিত্তি করেই। অস্ত্রের আমদানীকারক গডফাদাররা রয়ে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সরকার তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি। সত্যি বললে বলতে হয়, সরকার চিহ্নিত করতে চায়নি। সরকারের এই না চাওয়া এবং বলতে অপারগতার বিষয়টি খুবই রহস্যময়। কেননা, বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর কোনটিরই অন্তরালের মূল খলনায়কদের কালো হাতকে চিহ্নিত করা হয়নি। যারা ধরা পড়েছে তারা মূলত ঐ কালো হাতে ধরা 'হাতানি' মাত্র। পুলিশ প্রশাসন সেই সব হাতানিকে এমনভাবে মিডিয়ার সামনে তুলে ধরেছে যেন এরাই আসল খলনায়ক। ফলে পর্দার অন্তরালে থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাওয়া খলনায়করা খুব সহজেই নতুন হাতানি ব্যবহার করে নতুন নতুন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আরো রহস্যময় হলো, বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনীতিতে সাধারণত এক সরকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত বা ওএসডি হয়, ন্যূনতমপক্ষে দায়িত্বহীন করে রাখা হয়। কিন্তু আ.লীগ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলেও আলোচিত সব বোমা হামলাসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনার তদন্তে সিআইডির একজন বিশেষ কর্মকর্তাকে দেখা যাচ্ছে তদন্ত কারী অফিসার হিসাবে উপর্যুপরি ব্যর্থতা সত্ত্বেও। কাজেই চলমান বোমা হামলাগুলোর পেছনে সরকারের প্রধান ব্যর্থতা এই নেপথ্যের খলনায়কদের চিহ্নিত না করা বা করতে অনীহা থাকা। পরিস্থিতি এমন যে, আমরা বাংলাদেশ সফররত সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল-এর মুখের উপর বলে দিতে পেরেছি যে, আমরা জাতিসংঘের অধীনে ছাড়া অন্যদেশের নেতৃত্বে ইরাকে সৈন্য পাঠাতে পারব না। বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল চাপের মুখেও আমরা আমাদের বন্দর, গ্যাস রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। দাতা দেশের কূটনীতিকদের সমবায়ে গঠিত টিউইসডে গ্রুপের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের পাঁয়তারা বন্ধ করতে সাহস দেখিয়েছি কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত নারকীয় বোমা হামলার খলনায়কদের মুখোশ দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত করার সাহস দেখাতে সক্ষম হইনি।

১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর সমগ্র দেশে যেসব হামলাকারী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন ভারতীয় নাগরিক। এছাড়া খাগড়াছড়িসহ বেশ কয়েকটি স্থানে বোমা হামলায় জড়িতরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া তাদের জবানবন্দিতে ভারতে তাদের

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা স্বীকার করেছে। আর এসব সূত্রের ওপর ভিত্তি করে বিডিআর প্রধার মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ভাষায় ১৭ আগস্ট বোমা হামলার সাথে ভারতের সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছেন। বিডিআর প্রধানের এই দেশপ্রেমিক ও সাহসী বক্তব্যে যখন দেশের সকল সাধারণ জনগণ গর্ব অনুভব করছে; ঠিক তখন একশ্রেণীর গণমাধ্যম, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী তার নিন্দায় ফেটে পড়েছে। অথচ কোলকাতার একটি সেমিনারে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের আর প্রয়োজন নেই বলে দাবী তুলেছে তখন এই শ্রেণীটির মুখে রা শব্দটি পর্যন্ত নেই। এমনকি বাংলাদেশের এই শ্রেণীর যে প্রতিনিধিগণ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারাও 'দাদাদের' এ বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ তো করেইনি বরং আহ্লাদিত হয়ে সুর মিলিয়ে বলেছেন আরো এককাঠি এগিয়ে।

মৌলবাদ আর জঙ্গীবাদ নিয়ে বিশ্বে যে কয়েকটি দেশ সবচেয়ে বেশী সোচ্চার তার মধ্যে ভারত একেবারে সামনের সারিতে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের বোমা হামলাকারীরা ভারতকে কেন সেফ হাউজ মনে করছে? বোমা হামলার পরপরই কেন প্রধান সন্দেহভাজনদের সীমানা পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে দেখা যায়? মাওলানা ফরিদ বা ড. গালিবদের এত বেশী ভারত ভ্রমণের অন্তর্নিহিত কারণইবা কি? কারা তাদের সে দেশে আশ্রয় দিচ্ছে? ভারত সরকার বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে নিরীহ মুসলমানদের ধরে এনে বাংলাদেশে পুশইন করছে। অথচ খোদ কোলকাতা শহরে প্রকাশ্যে এসব সন্দেহভাজন বোমা হামলাকারী ও সন্ত্রাসীরা বসবাস করছে, কেউবা সেখানে ব্যবসা শুরু করেছে, কেউবা বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে, কেউ ফ্লাট ভাড়া নিয়ে মহা আরামে দিনাতিপাত করছে। কেউ কি কখনও শুনেছে ভারত সরকার কোন বাংলাদেশী সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পুশইন করেছে? বরং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়েছে সসম্মানে।

প্রবাদে আছে, ইতিহাস কথা বলে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বোমা হামলার নেপথ্য শক্তিকে চিহ্নিত করতে তাই ইতিহাসের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। প্রথমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক :

'বডি গার্ড অব লাইনস' বইয়ে এন্টনি কেভ ব্রাউন লিখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'এনিগমা' নামে জার্মান বাহিনীর কাছে একটি খুবই শক্তিশালী গুপ্ত বার্তা প্রেরক যন্ত্র ছিল। এ যন্ত্র নিয়ে হিটলারের অনেক গর্ব থাকলেও চার্চিল বাহিনী এক সময় সে যন্ত্রে সফলভাবে আড়ি পাততে সক্ষম হয়– যা হিটলার ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। একদা হিটলার মরুযুদ্ধের নায়ক জেনারেল রোমেলের কাছে ইংল্যান্ডের শহর কভেন্ট্রির উপর বিমান হামলা চালানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠায়। স্বাভাবিকভাবেই যথাসময়ে চার্চিলও এই বার্তা পেয়ে যায়। চার্চিলের কাছে যে সময় ছিল তাতে তিনি ইচ্ছে করলে কভেন্ট্রি শহরকে জার্মান বিমান হামলা থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন উইনস্টন চার্চিল। কেননা, তিনি মনে করেছিলেন এর ফলে হিটলার বুঝে ফেলবে যে তার এনিগমা এখন আর নিরাপদ বার্তা প্রেরক যন্ত্র নয়। ফলে হিটলার এ যন্ত্রের মাধ্যমে তার যুদ্ধবার্তা প্রেরণ বন্ধ করে দেবে এবং নতুন যন্ত্র তৈরী করবে। এতে করে হিটলারের যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা তাদের পক্ষে আর জানা সম্ভব হবে না। চার্চিল সেদিন তার পরিকল্পনার কাছে বলি দিয়েছিলেন কভেন্ট্রি শহরকে। ফলে হিটলারের যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা অব্যাহতভাবে চার্চিলের হাতে আসতে থাকে আর হিটলার তার বিশ্বস্ত জেনারেলদের সন্দেহ করা শুরু করেন। এমনকি অনেকের ফাঁসি

www.pathagar.com

পর্যন্ত কার্যকর করেন।

আবার একই সময়ে বিবিসি 'স্বাধীন জার্মান বেতার কেন্দ্র' নামে একটি বেতার কেন্দ্র চালু করে। সেই বেতার কেন্দ্র থেকে চার্চিলকে 'বাস্টার্ড' বলে গালি দেয়া হতো এবং হিটলারের উদ্দেশে সম্ভ্রমে কথা বলা হতো। আর গালাগাল করা হতো হিটলারের আশপাশের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে। যার ফলে জার্মানদের ভেতরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে হিটলারের আশপাশের বিশ্বস্ত কোনো কর্মকর্তা এই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পক্ষে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব হয়নি যে এটা বিবিসির কাজ। ফলে এ প্রচারণা জার্মানদের যথেষ্ট বিভ্রান্ত করেছিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল জার্মান সেনাবাহিনীতে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সাথে সিকিমের ভারতভুক্তির আগের পরিস্থিতির তুলনা করা যায়। ১৯৭৪ সালে সিকিমকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তির পূর্বেও একইভাবে সেখানে বোমাবাজীসহ নানা অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় এবং এসব বোমা হামলার দায়ভার সিকিম ন্যাশনাল গার্ড রেজিমেন্টের উপর চাপিয়ে সে বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হয়। এরপর সিকিমের দেশপ্রেমিক রাজা চোগিয়ালকে উৎখাত করে প্রহসনের মাধ্যমে তাঁবেদার লেন্দুপ দর্জিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়। এরপরের ইতিহাস সকলের জানা।

এবার ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে তাকাই সাম্প্রতিক বিশ্বের দিকে। নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে চার সহস্রাধিক ইহুদী কাজ করতো। বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, ১১ সেপ্টেম্বর যেদিন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হয় সেদিন কোনো ইহুদীই বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে কাজে যোগ দিতে যায়নি। কেন যায়নি– সেটি একটি বিশাল প্রশ্ন? তার থেকে আরও বড় প্রশ্ন, বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস আমেরিকার জন্য অভিশাপ নাকি আর্শীবাদ হয়েছে?

একইভাবে ৭ জুলাই লন্ডন শহরে পাতাল রেলে যেদিন বোমা হামলা হয় সেদিন ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু শহরেই অবস্থান করছিলেন। ঐদিন লন্ডনের একটি সম্মেলনে তার ভাষণ দেবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু তার সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করে হোটেলেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাজেই প্রশ্ন উঠেছে, কি কারণে এই ইসরাইলী নেতা হঠাৎ করে সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করে হোটেলে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন? তিনি কি কোনভাবে জানতে পেরেছিলেন যে সেদিন লন্ডনে বোমা হামলা চলবে? যদি জেনে থাকেন তাহলে ব্রিটিশ সরকারকে কি তিনি জানিয়েছিলেন? কেন জানাননি? এইতো মাত্র সেদিন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইরাকের একটি জেল ভেঙে তাদের দুই সহকর্মীকে বের করে নিয়ে আসে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ইরাকী মুজাহিদদের বেশ ধরে দুই ব্রিটিশ সৈন্য ইরাকী পুলিশের উপর হামলা চালালে ইরাকী পুলিশ বাহিনী তাদের গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। জানা গেছে, ইরাকী মুজাহিদদের প্রতি ইরাকী পুলিশ ও জনগণের মনে বিদ্বেষ ছড়াতে এই দুই ব্রিটিশ সেনা দীর্ঘদিন ধরে দাড়ি রেখে, মুজাহিদদের পোশাক পরে ইরাকে নানা রকম অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডে চালিয়ে আসছে। ইরাকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের কর্মকান্ড লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু ইরাকী পুলিশের হাতে ধরা সেই দলের দুই সদস্য গ্রেফতার হলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসার আশঙ্কায় ব্রিটিশ বাহিনী ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে হামলা চালায় ইরাকী জেলে এবং জেলের প্রাচীর ভেঙে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ঐ দুই ব্রিটিশ সৈন্যকে।

www.pathagar.com

কাজেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বছরগুলোর বোমা হামলাকে ইতিহাসের ও বর্তমান বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের ছাঁচে ফেলে বিচার করলে এর অন্তর্নিহিত কারণের একটা উত্তর সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

খালেদা জিয়ার ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের বিগত অধিবেশনে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশে সিরিজ বোমা হামলার অন্তর্নিহিত কারণ ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন : "বোমা হামলাকারীরা ধর্মীয় ছদ্মবেশে নিজেদের আড়াল করতে চাইছে। ইসলাম আমাদের আপন ধর্মের মর্যাদা, নাগরিকের হক এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে শিখিয়েছে। এ তিনটি ভিত্তিকে দুর্বল করাই ছিল বোমা হামলাকারীদের মূল লক্ষ্য। আমি স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানাতে পারি, ধর্মীয় উগ্রবাদে আক্রান্ত দেশ হিসাবে যারা বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চায়, এটা তাদের কাজ। মুসলিম মেজরিটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে যারা আমাদের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারছে না, এটা তারা করেছে। সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যারা ঈর্ষান্বিত, তারা এর সঙ্গে জড়িত। আর এজন্যই তারা বেছে নিয়েছে গণচীনে আমার সফরের সময়টাকে। এই ঘটনার পর আমি সফরসূচি স্থগিত করলে হামলাকারীদের একটি বড় উদ্দেশ্য হাসিল হতো।"

খালেদা জিয়ার ভাষণে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মনের কথা উঠে এসেছে। বাংলাদেশের মানুষও জানে, যে শক্তিটি চায় না বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম, সমৃদ্ধি-স্বনির্ভর ও মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বিশ্বে টিকে থাকুক, যারা বাংলাদেশকে তালেবান-মৌলবাদী এবং অকার্যকর-ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে চিহ্নিত করতে চায়– এ বোমা হামলা তাদের কাজ। হামলায় ব্যবহৃত হাতগুলো বা নিক্ষেপকারী যারাই হোক পেছনের নাটের গুরু তারাই। কাজেই খালেদা জিয়াকে আজ চিহ্নিত করতে হবে কারা সেই নাটের গুরু? কারা ধর্মীয় উগ্রবাদে আক্রান্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চায়? কারা মুসলিম মেজরিটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারছে না? কারা সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ঈর্ষান্বিত? প্রধানমন্ত্রী যদি তার নিজের বক্তব্যে বিশ্বাস করে থাকেন তবে তাকে অবশ্যই ধর্মীয় ছদ্মবেশে আড়াল করা হামলাকারীদের মুখোশ খুলে তাদের আসল পরিচয় দেশবাসীকে জানাতে হবে। তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করে দিতে হবে। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পারলে খালেদা জিয়ার অসুবিধা কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা এছাড়া কোনো পথ তো আর সামনে খোলা নেই। ভয় করে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক ষড়যন্ত্রকারীদের যত ছাড় দেয়া হচ্ছে তারা তত বেশী অগ্রসর হচ্ছে বাংলাদেশের ভরকেন্দ্রের দিকে। সংসদ ভবনের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাবুল আনসারীর স্বীকারোক্তিই কি তা প্রমাণ করে না? দু-চার-দশজন বোমা নিক্ষেপকারীকে ধরে খুব বেশী লাভ নেই। কেননা, আসল ষড়যন্ত্রকারীরা চিহ্নিত না হলে তারা আরো নতুন হামলাকারী তৈরী করতে পারবে খুব সহজেই। কাজেই বাংলাদেশের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীকে আজ মুখ খুলতে হবে। এছাড়া ভিন্ন কোনো গত্যন্তর নেই।

(ইনকিলাব : ২৪-১০-২০০৫)।

www.pathagar.com

বোমা বিশ্লেষণ

এক অস্বাভাবিক বোমাতঙ্কে আতঙ্কিত আজ সমগ্র বাংলাদেশ। খইয়ের মতো বোমা ফুটছে গত ৫ বছরে। বোমা ফুটছে জনসভায়, বোমা ফুটছে মসজিদে, মাজারে, গির্জায়; বোমা ফুটছে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, খুলনায়, যশোরে, সিলেটে; বৈশাখী আমের মতো বোমা পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র সরকারের সুরক্ষিত কারাগার থেকে পাবলিক টয়লেট পর্যন্ত; শহরে-বন্দরে, গ্রাম-জনপদে ধরা পড়ছে বোমার বিশাল বিশাল চালান; বিমানবন্দর, পুলিশ সদর দফতর, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদ মাধ্যম অফিস, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র কেঁপে উঠছে এক অদ্ভুত বোমাতঙ্কে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি জনপদ আজ উৎকণ্ঠিত এই অস্বাভাবিক বোমাতঙ্কে। কার্যত সমগ্র বাংলাদেশ যেন পরিণত হয়েছে এক অদ্ভুত বোমাদেশ-এ। কবির ভাষায় : 'এক অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'।

সর্বশেষ বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে গত ২১ আগস্ট রাজধানীর বিবি এভেনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস বিরোধী জনসভায়। বলা হয়েছে, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতেই আততায়ীরা এই হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও তার দলের ১৯ জন নেতাকর্মী নিহত এবং দুই শতাধিক আহত হয়েছেন। সংবাদচিত্রেও দেখা গেছে, শেখ হাসিনাকে ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বুক আগলিয়ে রক্ষার চেষ্টা করছেন। টিভি চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের ছবিতে বোমা হামলার যে চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এক কথায় তা ভয়াবহ। সভ্য ও সুস্থ মস্তিষ্কে তা কল্পনাও করা যায় না। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এবং ৩০ মে ১৯৮১ সালের পর বাংলাদেশে এতোবড় ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং উন্নতির জন্য এ ঘটনা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের ভাষায় বোমা বিশ্লেষণ বলতে বোমার আণবিক বা উপাদানগত বিশ্লেষণ বোঝায়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নয়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের ধারাবাহিক বোমা হামলার রাজনৈতিক বিশ্লেষণই আজকের আলোচ্য বিষয়।

বোমার ইতিহাস

বাংলাদেশে বর্তমানে যে ধারাবাহিক বোমা হামলা চলছে তা শুরু হয়েছে বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৭ সাল থেকে। সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৭ বছরে মোট ২৩ বার বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং এতে মোট ১৩৯ জন নিহত এবং আহতের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে ২০০১ সালে। এ বছর সাতটি বোমা হামলার ঘটনায় মোট ৬১ জন নিহত হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে চলতি বছর। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৫টি বোমা হামলা ঘটনায় মোট ২৭ জন নিহত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগের এমপি মহিবুর রহমান মানিকের ছাতকের বাসায় বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণে তার বাসার ছাদ উড়ে যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে ৩ জন মারা যায়।

এরপর ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরের টাউন হল মাঠে উদীচীর সমাবেশে এক বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত হয়। একই বছরের ৮ অক্টোবর খুলনার নিরালা এলাকায় অবস্থিত কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ে বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত হয়। ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে সিপিবি'র মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়। ঐ বছরের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে ছায়ানটের

www.pathagar.com

বর্ষবরণ উৎসবে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হয়। একই বছরের ৩ জুন গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার বানিয়ারচর গির্জায় সকালিক প্রার্থনা সভায় এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ১০ জন নিহত এবং ১৪/১৫ জন আহত হয়। একই মাসের ১৬ তারিখে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২০ জন নিহত হয়। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুনামগঞ্জের সাল্লায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নির্বাচনী জনসভায় এক বোমা বিস্ফোরণে চারজন নিহত হয়। একই মাসে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে শেখ হাসিনার জনসভার অদূরে ফাজিলচিলতে একটি বাসায় বোমা বিস্ফোরণে দুইজন নিহত হয়। ঐ মাসের ২১ তারিখে বাগেরহাটের খলিলুর রহমান কলেজ মাঠে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য শেখ হেলালের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা শহরের রক্সী সিনেমা হল এবং গুড়পুকুরের মেলার সার্কাস প্যাণ্ডেলে ১০ মিনিটের ব্যবধানে একাধিক বোমা বিস্ফোরিত হলে চারজন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয়। একই বছরের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শহরের চারটি সিনেমা হলে একযোগে বোমা বিস্ফোরিত হলে ২১ জন নিহত হয়।

২০০৪ সালের ১২ জানুয়ারী হযরত শাহ জালাল (রহঃ)-এর মাজারে ওরসের সময় এক বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত হয়। এরপর গত ২১ মে বাংলাদেশে নবাগত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর শাহ জালাল (রহঃ)-এর মাজার পরিদর্শনের সময় দরগাহর গেটে এক বোমা বিস্ফোরণে আনোয়ার চৌধুরীসহ শতাধিক লোক আহত হন। চলতি বছরের ৫ আগস্ট সিলেট শহরের দুটি সিনেমা হলে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এ ঘটনার দুই দিন পরে অর্থাৎ গত ৭ আগস্ট সিলেটের মেয়র কামরানের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হলে আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিমসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। এছাড়াও ২০০১ সালে সিলেট নগরীর মনিকা ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ভেতর একটি বোমা হামলা হয়। ২০০৩ সালে নগরীর খাদিমপাড়ায় একটি ভবনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের সর্বাধিক সংখ্যক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এই সিলেটেই ঘটেছে। বিগত ৬ বছরে মোট ১৫ বার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সিলেটে এবং এতে ২১ জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়েছে। এরপরে সর্বশেষ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে গত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয় এবং এতে ২০ জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হয়।

নেপথ্য খলনায়ক

২১ আগস্ট বোমা হামলার এক পক্ষ পার হয়ে গেলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত এ ঘটনার জন্য কারা দায়ী তা শনাক্ত করতে পারেনি। শুধু ২১ আগস্টের ঘটনায় নয়, বিগত সাত বছরে যেসব চাঞ্চল্যকর বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে তার কোনটির রহস্যই উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। ফলে কারা এই বোমা হামলা, নেপথ্য খলনায়ক তা আজো জাতির সামনে উন্মোচিত হয়নি। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে বিস্ফোরিত বোমা হামলার জন্য কারা দায়ী এ নিয়ে এখনো কেবল জল্পনা-কল্পনাই চলছে মানুষের মনে। সকল সন্দেহ চারটি বিষয়কে ঘিরে চলছে।

এক. সরকার বিরোধী দলকে নির্মূল করতে এ ঘটনা ঘটাতে পারে? ইতোমধ্যে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে এমন কথা বলাও হচ্ছে। ঘরে আগুন দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মামলা

www.pathagar.com

করা যায় যদি ঘরটি নিজের হয়। কিন্তু ঘরের রক্ষকের এমন স্বাধীনতা থাকে না। কেননা, এতে তার ফাঁসিতে ঝোলার সম্ভাবনা থাকে।

দুই. আন্দোলন শক্তিশালী করতে এবং সমমনা দলগুলোর সাথে জোট গড়ে তুলতে বিরোধী দলগুলো নিজেরাই এ ঘটনা ঘটাতে পারে?

বাংলাদেশের রাজনীতি নীচে নামতে নামতে 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' পর্যায়ে নেমে গেছে বহু আগেই। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের ভূমিকা পথিকৃতের অবস্থানে। শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের গোপনীয় সহকারী মতিউর রহমান রেন্টুর আলোচিত বই 'আমার ফাঁসি চাই' তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সাম্প্রতিক বোমা হামলার ঘটনাগুলোর মধ্যে তার প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। উদীচী কিংবা রমনার রটমূল দুটো স্থানেই বোমা হামলা হয়েছে নাট্য ব্যক্তিত্ব হাসান ইমামের মঞ্চ থেকে নেমে যারার পর। এই কারণে কি নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বোমা বিস্ফোরণের সামান্য আগে শামীম ওসমানকে ডেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল? সিলেটের মেয়র বদরুদ্দিন কামরানের গাড়িতে ওঠার আগে হঠাৎ পান দোকানে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সাথে এর কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা তা প্রমাণিত নয়? সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মঞ্চে বোমা হামলার আগে চিরকূট দিয়ে তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আজো রহস্যাবৃত। বিগত ৭ বছরে যে ২৩টি বোমা হামলা হয়েছে তার কোনোটি মঞ্চে বিস্ফোরিত হয়নি। হয়েছে মঞ্চ থেকে দূরে। এ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো নির্দিষ্ট নেতৃস্থানীয় কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসব বোমা হামলা করা হয়নি। হামলাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল নেতা-নেত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা, বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলা, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সে কারণেই বিগত সব বোমা হামলায় নিহতের তালিকায় পরিচিত কারো নাম নেই। একই কারণে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা হামলার পর যখন তাদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলো শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই বোমা হামলা চালানো হয়েছে তখন রাজধানীতে মানুষের মুখে মুখে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে শোনা গেছে। সেগুলো হলো : যদি শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই বোমা হামলা হয়ে থাকে তাহলে তিনি যখন মঞ্চে এলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সিনিয়র নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনলেন, নিজে ২০ মিনিট বক্তব্য দিলেন তখন কেন হত্যাকারীরা বোমা হামলা না করে তিনি যখন মিছিল শুরু করে দিয়ে গাড়িতে উঠে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন বোমা হামলা করবে? কেননা, আগের যে কোনো সময় আততায়ীদের জন্য টার্গেট নির্ধারণ খুব সহজ হতো।

তিন. এ পর্যন্ত তদন্তে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছে বোমা হামলার আগে বা পরে কোনো গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। তাহলে গুলী বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে কেন? চার. বোমায় নিহতদের ডাক্তারী পরীক্ষায় কারো দেহে গুলীর কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। হাসিনার দেহরক্ষী মাহবুবও বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে নিহত হয়েছে বলে ডাক্তারী পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

পাঁচ. জার্মানীর মার্সিডিজ কোম্পানী বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে জানিয়েছে তাদের বুলেট প্রুফ গাড়িতে কোনোভাবেই গুলীর দাগ লাগার কথা নয়। তাহলে শেখ হাসিনার গাড়িতে গুলীর চিহ্নগুলো কি করে এলো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গাড়িটিকে আলামত হিসাবে নিতে চাইলেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাদের কোনো সহযোগিতা করা হয়নি। অন্যদিকে ২১ আগস্ট জনসভার জন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মুক্তাঙ্গন বরাদ্দ নিয়েও কেন শেষ পর্যন্ত তা পরিবর্তন

www.pathagar.com

করে দলীয় অফিসের সামনে করা হলো। আলোচিত বোমা হামলার তদন্তে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, বিএনপি'র ১৯৯১-'৯৬ শাসনামলে যখন বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে ইমার্জিং টাইগার রূপে পরিচিত হচ্ছিল ঠিক তখনই প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় ঘাদানিকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ইস্যু তুলে টানা দুইটি বছর বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে দেশের অর্থনীতিকে অনেক পিছিয়ে দেয়। আ.লীগ মনে করতেই পারে '৯৬-এর মতো তীব্র গণআন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে সরকারকে বিদায় করতে না পারলে তাদের পক্ষে গণরায় নেয়া সম্ভব নয়। সেজন্য তারা বাংলাদেশকে পূর্বের ন্যায় অস্থিতিশীল করতে একটি জোরালো ইস্যু খুঁজে বের করতে চাইছে।

এ প্রসঙ্গে বন্যার মধ্যেও দেশবাসীকে চরম বিপদের মধ্যে রেখে শেখ হাসিনার হঠাৎ ভারত সফর এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎলাভ ও তার সম্মানে ভুরিভোজের আয়োজনের গুঢ়ার্থটি আজো বাংরাদেশের মানুষের মনে প্রশ্নই থেকে গেছে। সেই সাথে আরো একটি প্রশ্ন যুক্ত হয়েছে, কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ আহত হলে যেসব আওয়ামী লীগ নেতা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যাণ্ড কিংবা সিঙ্গাপুর পাঠনোর জোরালো দাবী তুলেছিল তারা এখন কেন বোমা হামলায় আহত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যাণ্ড বা সিঙ্গাপুর না গিয়ে দল বেঁধে ভারতে গেল? আমাদের সংবিধানের খসড়া পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করে দিল্লীতে গিয়ে অনুমোদন করে এনে তারপর সংসদে পেশ করেছিলেন যে প্রখ্যাত আইনজীবী তিনি বোমা হামলার বেসরকারী তদন্ত কমিশন করে রিপোর্ট প্রকাশের কাছাকাছি সময়ে সব ফেলে কেন দিল্লীতে ছুটলেন তাও আরো একটি রহস্য।আরো বড় রহস্য বর্তমান আ.লীগে একপেশে হয়ে পড়া কোনো সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এই বোমা হামলায় আহত হয়নি।

আসলে হত্যার মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এ ধরনের আলোচনা চালানো সুস্থ বিবেকের মানুষদের কাছে অরুচিকর মনে হবে। তবু সত্য উদঘাটনের খাতিরে এবং নিরাপরাধ ব্যক্তি যাতে কারো ষড়যন্ত্রের শিকার না হয় এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিতে জাতির বিবেক হিসাবে সাংবাদিকদের কলম তুলে নেয়া ছাড়া বিকল্প কিছু থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগে বহুবার বহু কষ্টকল্পিত কাহিনী জাতির সামনে হাজির করা হয়েছে। ফলে ব্যাম্রতাড়িত রাখাল বালকের গল্পপড়া মানুষের মনে যদি কিছু প্রশ্ন জেগেই থাকে তার জন্য তাদেরকে খুব দোষ দেয়া যায় না।

ছয়. তৃতীয় শক্তির কথা বলা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তৃতীয় শক্তি বলতে সাধারণত সামরিক শক্তিকে বোঝায়। ইতোমধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর কিছু পত্রিকায় বলা হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিস্ফোরিত গ্রেনেডের অনুরূপ গ্রেনেড ব্যবহার করে থাকে। একটি পত্রিকা আরো লিখেছে ঘটনার পর পরই সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে দেখা গেছে। এসব দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে এই শ্রেণীটি একথা বলার চেষ্টা করছে যে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপট তৈরীর লক্ষ্যে এই বোমা হামলা চালিয়েছে। এভাবে তারা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক ও পেশাদার সেনাবাহিনীকে অপ্রিয় ঘটনার সাথে জড়িয়ে তাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সাত বাংলাদেশে বিভিন্ন বাম ধারার সশস্ত্র চরমপন্থী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এ বোমা

www.pathagar.com

হামলা তাদের কাজও হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে এরকম সম্ভাবনার কথা অনেকের মনেই উকি দিতে পারে। বিগত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে র‍্যাব সদস্যদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় চরমপন্থী নিহত হয়েছে এবং অনেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতারও হয়েছে। বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় চরমপন্থী সংগঠন জনযুদ্ধের পক্ষ থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধির কাছে যে স্বীকারোক্তিমূলক ই-মেইল পাঠানো হয়েছে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। কেননা, গত কয়েকদিন আগে র‍্যারের সাথে বন্দুকযুদ্ধে জনযুদ্ধের সামরিক শাখার প্রধান বিডিআর আলতাফ নিহত হয়। এ ঘটনা তার প্রতিশোধ স্বরূপ হতে পারে।

আট . কথিত 'মৌলবাদীদের' বা ইসলামপন্থীদের সংশ্লিষ্টতার যে কথা বলা হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করা দরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেসব বোমা হামলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির দায়ভার একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কথিত মৌলবাদীদের উপর চাপানো হয়েছে। যদিও এসব বোমা হামলায় এ পর্যন্ত যতটুকু তদন্ত হয়েছে তাতে ইসলামপন্থীদের কোনো সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২১ আগস্ট বোমা হামলার পরপরই বিরোধী দলের নেত্রী এ ঘটনার জন্য মৌলবাদীদের দায়ী করেছেন। বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত সংবাদপত্র তার পরদিনই ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা এবং আফগানিস্তানের যুদ্ধে একই বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল বলে হামলাকারীদের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দিকে ইঙ্গিত করেছে। এর একদিন পরেই দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি উড়ো ই-মেইলে বার্তা পাঠিয়ে হিকমত উল জিহাদ নামের একটি সংগঠন এই বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয় পুনরায়। বিশেষ চেতনাধারী বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো যেন এর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। 'হিকমত উল জিহাদ' নামে বিশ্বে কোনো সংগঠন আছে কিনা বা এ ধরনের নামের কোনো সংগঠন আদৌ হতে পারে কিনা– তার কোনো বাছবিচার ছাড়াই তারা উড়ো ই-মেইলকে সংবাদপত্রের ফার্স্ট লিড, সেকেণ্ড লিড ট্রিটমেন্ট দেয়। কিন্তু জনযুদ্ধের স্বীকারোক্তিমূলক ই-মেইল অথবা তালেবানদের পক্ষ থেকে অস্বীকার করে যে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে সেই খবর এ শ্রেণীর বেশীরভাগ পত্রিকাই ছাপেনি। যারা ছেপেছেন তারাও এমন গুরুত্বহীন ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন যাতে তা সচরাচর পাঠকদের চোখে পড়ে না। অর্থাৎ ইসলামপন্থীরা এসব বোমা হামলার সাথে জড়িত থাক বা না থাক তাদের ঘাড়ে জোর-জবরদস্তিমূলক দোষ চাপানো যেন এসব পত্রিকার একটা মিশন। অথচ গত ২০ আগস্ট এড্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রেরিত এক ই-মেইল-এ তালিবান সেন্ট্রাল মিলিটারী ইনচার্জ আবদুল্লাহ বিন খুবাইর ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের সাথে তালিবানদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা হয়। তালিবানদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয় : '২১ আগস্টের হামলার পেছনে তালেবানের হাত রয়েছে বলে আপনাদের দেশের অনেকেই মনে করেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে তালেবান এই হামলা চালায়নি। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, আমাদের লড়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। অমুসলিম জনগোষ্ঠী ও দেশের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা কখনোই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হামলা চালাইনি। ভারত ও পাকিস্তানে তৎপরতা চালালেও বাংলাদেশে আমাদের কোনো তৎপরতা নেই। তবে আমাদের গোয়েন্দা সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, কিছু কিছু লোক বাংলাদেশে সংগঠন করে নিজেদের ইসলামী জিহাদী হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে। কিছু

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদও তাদের সহায়তা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তারা ইসলামী জিহাদী নয়। কোনো মুসলমানকে হত্যার অনুমতিও আমরা দেনি তাদের এহেন তৎপরতার কারণে মুসলমানদের কাছে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ ধরনের তৎপরতার সাথে জড়িত কোনো লোককে আমাদের হাতে তুলে দিলে তাকে আমরা ১০ হাজার ডলার (৬ লাখ টাকা) পুরস্কার দেব। তাই এসব কাফেরকে খুঁজে বের করুন। কারণ এরা ইসলামের শত্রু।' (ইত্তেফাক : ২৬ আগস্ট, ২০০৪)।

হামলাকারী যারাই হোক, এসব প্রত্যেকটি চাঞ্চল্যকর বোমা হামলার পর একটি বিরাট গোষ্ঠী এর দায়ভার ইসলামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ সকল বোমা হামলার টার্গেট একটি– ইসলামপন্থীরা। এতে প্রমাণিত হয় সকল বোমা হামলা একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের কাজ। সাম্প্রতিক বোমা হামলার পর দেশের ইসলামপন্থীদের ওপর দোষ চাপিয়ে কথিত হিকমত উল জিহাদ নামের সংগঠন থেকে যে ই-মেইলটি পাঠানো হয়েছে তার সূত্র খোঁজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের গোয়েন্দারা রীতিমত এর মধ্যেই কেঁচো খুঁড়তে অজগর বের করে এনেছেন। গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করেছে, এলিফ্যান্ট রোডের হার্ট নেট নামের একটি সাইবার ক্যাফে থেকে পার্থ সাহা নামের এক যুবক এই ই-মেইলটি প্রেরণ করেছে। সদ্য মাদ্রাজের চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে আসা এই যুবক গোয়েন্দাদের কাছে স্বীকার করেছে হিকমত উল জিহাদ নামে প্রথম আলো পত্রিকা অফিসে ই-মেইল প্রেরণ করার পর তার কয়েকজন বন্ধুকে ফোনে জানায় আগামীকাল প্রথম আলো পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর নিউজ ছাপা হবে। এদিকে একজন সাধারণ দোকানের কর্মচারীর ছেলে কি করে চেন্নাইয়ের মতো ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ পেল, তার সাথে প্রতিবেশী কোনো গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ আছে কিনা তা খুঁজে দেখছে বাংলাদেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলো। বাংলাদেশের অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, এই পার্থ সাহা কাহিনীর মোড়ক উন্মোচন করা গেলে বাংলাদেশের ধারাবাহিক বোমা হামলার নেপথ্যের আসল খলনায়কদের খুজে পাওয়া সম্ভব হবে। তবে এ কাহিনীর মোড়ক আদৌ উন্মোচন করা হবে কিনা অতীতের নজির থেকে তা নিয়ে তাদের যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

নয়. ২১ আগস্টের বোমা হামলার পেছনে শেখ মুজিব হত্যা ও জেল হত্যা মামলার আসামীদের হাত থাকতে পারে বলে কোনো কোনো পত্রিকা এর মধ্যেই মন্তব্য করেছে। বিশেষ করে জেল হত্যা মামলার শুনানি শেষ হয়ে রায়ের দিন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষিতে এবং ঢাকার সুরক্ষিত কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে বোমা হামলার পরদিন একটি পরিত্যক্ত গ্রেনেড পাওয়ায় তারা এ ধরনের সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন।

দশ. এসব বোমা হামলার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিংবা স্নায়ুযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের বাইরের রূপ পাল্টালেও ভেতরের রূপ আরো ঘনীভূত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে খ্যাত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি নতুন নয়। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া তারা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে কিছু দ্বিধা থাকলেও পরবর্তীতে সরকার বেশ জোরালোভাবে তাদের জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে তারা গ্যাস রপ্তানী করতে ইচ্ছুক নয়। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে যেসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী এখানে অর্থলগ্নী করেছিল এবং বাংলাদেশের গ্যাস কিনে যারা শিল্পায়ন ঘটাতে চেয়েছিল তারা উভয় গ্রুপ বর্তমান

www.pathagar.com

সরকারের প্রতি রূঢ় হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে অনেক চেষ্টা করেও মার্কিন সরকার চট্টগ্রামে স্যাটেলাইট পোর্ট নির্মাণে সরকারকে রাজি করাতে পারেনি। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র ইসলাম ও মুসলিম শক্তিকে শত জ্ঞান করে তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের টার্গেট ও গিনিপিগে পরিণত করেছে। বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, শান্তিতে যেন থাকতে না পারে সেজন্য ইহুদী-খৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ একজোট হয়েছে এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপান-জার্মান-ইতালী অক্ষশক্তির মতো আজ খ্রিষ্ট-ইহুদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি সারা বিশ্বে ইসলাম নির্মূলে এক হয়েছে। তারা নিজেরাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে, কখনো এসব রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেসব দেশে হস্তক্ষেপ করে।

সাম্প্রতিককালে মার্কিন সরকার ইরাকে বাংলাদেশের সৈন্য প্রেরণের জন্য সব রকম চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সব সময় বলে এসেছে জাতিসংঘ ছাড়া অন্য কারো অধীনে বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরণ করবে না। এরপর জাতিসংঘ এক সময় ইরাকে বাংলাদেশের সৈন্য চেয়ে পাঠায়। এ লক্ষ্যে খোদ মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বাংলাদেশ রামসফেল্ড-এর মুখের উপর বলে দিয়েছে বাংলাদেশ কাউকে গুলী করতে বা কারো গুলী খেতে সৈন্য প্রেরণ করবে না। এতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৌদী আরবের মাধ্যমে ইরাকে সৈন্য প্রেরণের আহ্বান জানায়। কিন্তু সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ কোনো দেশে সৈন্য প্রেরণের আগে সে দেশের জনগণের সম্মতির কথা বিবেচনা করে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র বাংলাদেশের এতো যুক্তি, আপত্তি মার্কিন সরকারের ভালো লাগার কথা নয়। সরকার বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের ইম্যুনিটি সুবিধা দিয়েছে। এ সুবিধার ফলে মার্কিন নাগরিকরা বাংলাদেশে যা কিছু করুক তার বিচার বাংলাদেশের কোনো আদালত করতে পারবে না। বিশ্বব্যাংকও একই সুবিধা পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং মানবাধিকারের চরম বিরোধী এ আইন সাম্রাজ্যবাদীদের বাংলাদেশে নাশকতা সৃষ্টিতে অবশ্যই উৎসাহিত করবে। কোনো ষড়যন্ত্রী যদি কেনো মার্কিন নাগরিককে তার এই ইম্যুনিটি সুবিধার লোভ দেখিয়ে ভাড়া করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজে প্রবৃত্ত করে তবে তার বিচার করতে, তদন্ত করতে বা তার নাম প্রকাশ করতে পারবে কি কোনো বাংলাদেশী সরকার।

অন্যদিকে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিবেশী ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় একটি কুচক্রি মহল দেশে-বিদেশে বাংলাদেশকে একটি তালেবানী ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করার জন্য জোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ভারতের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাইলেও বাংলাদেশের প্রতি বড়ভাইসুলভ আচরণে অভ্যস্ত ভারত তা মেনে নেয়নি। ফলে বর্তমান সরকারের মেয়াদ তিন বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভারত সফর সম্ভব হয়নি। ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যৌথ টহলের দাবী করে আসলেও সরকার তাতে রাজি হয়নি। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাটি আছে বলে ভারত দীর্ঘদিন ধরে যে অভিযোগ করে আসছে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা জোরালোভাবে অস্বীকার করে আসছে। অন্যদিকে ইন্দীরা-মুজিব চুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তি পর্যালোচনা, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, তালপট্টি দ্বীপ পুনরুদ্ধার, অমীমাংসিত সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান সরকারের জোরালো অবস্থানে ভারত খুশী হতে পারেনি। আবার চারদিক দিয়ে ভারত বেষ্টিত

www.pathagar.com

থাকায় বাংলাদেশের জন্য যখন ভারতই একমাত্র নিয়তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল তখন লুক ইস্ট পলিসির মাধ্যমে বাংলাদেশ যেন শ্বাস নেবার জন্য একটা বাতায়ন খুলে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে যারা শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চায় বা যারা চায় বাংলাদেশ নাভিশ্বাস নিয়ে বাঁচুক তারা বর্তমান সরকারকে চাপে ফেলতে এ রকম ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটাতেই পারে। সদ্য সমাপ্ত বিমসটেক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং খালেদা জিয়ার কাছে এসব বিষয় উত্থাপন করলে তিনি তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেন। উল্টো ভারতের ভেতর বাংলাদেশ বিরোধী রেজিস্টার্ড সংগঠন রয়েছে বলে জানালে মনমোহন সিং পিছু হটে বলেন, তার জোটে আসামের প্রতিনিধি রয়েছে, তাই আসামের চাপেই তাকে এ ধরনের কথা বলতে হয়। বিমসটেক সম্মেলনের সাইড লাইনে ঐ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে খুবই নির্মম ও শক্ত কথাবার্তা হয়েছে বলে সম্মেলনে যোগদানকারী একটি সূত্র জানিয়েছে। যদিও কূটনৈতিক সূত্র এ বৈঠককে সফল বলে দাবী করেছে। আবার বোমা হামলার পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক প্রটোকল উপেক্ষা করে শেখ হাসিনাকে ফোন করা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তাদের রহস্যজনক চলাচল নিয়ে অনেকের মনেই রয়েছে কিছু প্রশ্ন।

ইরাক এবং আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী মন্দা অর্থনীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। উপরন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণকালের মধ্যে সর্বাধিক অবস্থানে রয়েছে। অর্থনীতির অন্যান্য যেসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সূচক তাও বাংলাদেশের পক্ষে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যখন শত শত বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশে আসতে চাইছেন ঠিক তখনই এই বোমা হামলা চালানো হচ্ছে। বিশ্বে এক চতুর্থাংশ মানুষের মার্কেট এই দক্ষিণ এশিয়া সব সময়ই বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যারা সবসময়ই পরনির্ভরশীল করে রাখতে চায়– এ বোমা হামলায় তাদের লাভ থাকতেই পারে। বাংলাদেশের ৩৩ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে এর অনেক দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

টার্গেট কারা?

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মনে আজ একটি প্রশ্ন, কেন এই ধারাবাহিক বোমা হামলা? হামলাকারীদের উদ্দেশ্য কি? কারা এর টার্গেট? শুধু কি অখ্যাত, অজ্ঞাত কিছু লাশ ফেলার জন্য, নাকি এর পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত আছে?

সরকারের প্রতিক্রিয়া

বিএনপি এবং আ.লীগ উভয় সরকারই অতীতে সকল বোমা হামলার পর একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পাবার চেষ্টা করেছে। এতে করে সরকারের তদন্ত কাজ যেমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তেমনি প্রকৃত দোষীরা থেকে গেছে সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এই প্রথম এরকম একটি ঘটনায় সরকারের তরফ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হলো। ২১ আগস্ট বোমা হামলার পর আ.লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি এ বোমা হামলার জন্য সরকারকে দায়ী করে বলেন, সরকারের সহায়তায় মৌলবাদীরাই এ বোমা হামলা করেছে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে বিরোধীদলীয় নেত্রীর আক্রমণাত্মক উক্তির জবাব না দিয়ে বরং হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহতদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে ডাক্তারদের প্রতি নির্দেশ দেন। সরকারের প্রায় সকল মন্ত্রী এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানান। ঘটনার সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ত্রাণ বিতরণের কাজে

www.pathagar.com

ঢাকার বাইরে ছিলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরেই বোমা হামলার ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনিও হতাহতদের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রী সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান এবং মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিকীকে দেখতে যান।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা শীর্ষ দুই নেত্রীর মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। গত এক দশক তাদের মধ্যে কোনো সংলাপ বিনিময় হয়নি। মার্কিন দূতাবাস বা সেনাবাহিনীর কোনো অনুষ্ঠানে তারা ঘটনাক্রমে মুখোমুখি হলেও 'হাই-হ্যালোর' বেশি এগোয়নি কখনো। বর্তমানে তাও বন্ধ। বিষয়টি বিদেশীদের দৃষ্টিও এড়ায়নি এবং এ নিয়ে তারা আমাদের কম কথা শোনায়নি। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মাঝে-মধ্যে এমন অশ্লীল কথা-বার্তা বলেন যা সভ্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে সংবাদপত্রগুলোকেও এডিট করে ছাপতে হয়েছে। তারপরও ২০০২ সালের পহেলা বৈশাখ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নববর্ষের শুভেচ্ছা স্বরূপ শেখ হাসিনার বাসভবনে মিষ্টি, ফুল ও ফল পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনও তা রিসিভ করার কেউ ছিল না। অথচ বোমা হামলার পর এতোসব অপমান ও প্রটোকল উপেক্ষা করে খালেদা জিয়া সবাইকে অবাক করে দিয়ে অসুস্থ শেখ হাসিনাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু সে রাতে বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাসভবন থেকে কোনো সম্মতি পাওয়া যায়নি। পরদিন সমস্ত দিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে সুধাসদনে যোগাযোগ করা হলেও কেউ কোনো রেসপন্স করেনি। এমনকি তাদের সম্মতি উপেক্ষা করেই প্রধানমন্ত্রী সুধাসদনে চলে আসতে পারেন জেনে আওয়ামী লীগের কর্মীরা সুধাসদন ঘেরাও করে রাখে। এতো উপেক্ষার পরও প্রধানমন্ত্রী তার দুজন ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে দিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রতি তার উদ্বেগ ও সমবেনার কথা জানিয়ে সুধাসদনে পত্র পাঠান। কিন্তু আলীগের কর্মীরা তাদেরকে সেখানে ঢুকতে দেয়নি। উত্তরে শেখ হাসিনা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে প্রধানমন্ত্রীকে কটুবাক্যে আক্রমণ করেন আর জলিল সাহেব বলেন, রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। কথাটি শেখ মুজিবও বলেছিলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। কিন্তু তারপরও তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন ২৪ মার্চ পর্যন্ত। অথচ জলিল সাহেবরা আজ সেই ঔদার্য দেখাতে পারলেন না।

শনিবারের বোমা হামলার পর সরকার নিজেই আ.লীগ আমলে নিয়োগকৃত সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। বিচারপতি জয়নুল আবেদিন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমানের আমলে নিয়োগ পান এবং তাকে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ করে হাসিনা সরকার। তারপর ও তাদের দাবী অনুসারে সরকার দেশের জন্য খুব স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক তদন্তের জন্য ইন্টারপোলের সহায়তা নিয়েছে। সরকার বোমা হামলাকারীদের শনাক্ত করার জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এ বোমা হামলার তদন্তে বাংলাদেশে এসেছে। মার্কিন সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও বাংলাদেশে এসেছেন। ২১ আগস্টের ঘটনা বিটিভিতে ঠিকমতো কভারেজ না দেয়ায় সরকার বিটিভির ডিজিসহ তিন কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়েছে। অথচ সাবেক সরকারের সময় যখন বোমা হামলা করা হয়েছে তখন বিটিভিতে সেসব বোমা হামলার খবর সম্পূর্ণ ব্লাক আউট করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটনার দুই-একদিন পর 'জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন' বলে বিটিভিতে প্রোগ্রাম করে বোমা হামলার সকল দায়দায়িত্ব জাতীয়তাবাদী ও

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের সচেতন ও শান্তিপ্রিয় জনগণ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। একই সাথে তারা দীর্ঘদিন দুই নেত্রীকে এক টেবিলে জাতীয় আলোচনায় রত দেখার যে স্বপ্ন দেখে আসছিলেন আওয়ামী লীগের একগুঁয়েমীর কারণে তা না হওয়ায় তার সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, যে উপলক্ষেই হোক দুই নেত্রী এক সাথে বসে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলাপ করলে দেশের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী কার স্বার্থে?

২১ আগস্ট বোমা হামলার পর পরই সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তদন্তে নেমে পড়ে। সরকার প্রথমদিনে মামলার তদন্তভার ডিবি পুলিশকে দিলেও পরে তা সিআইডির কাছে হস্তান্তর করে এই ভেবে যে সাম্প্রতিককালে আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত বিরোধী দলের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। এর পরেই বিচারপতি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। আওয়ামী লীগ আমলে যখন বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা হয়েছিল তখন বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য জোরালো দাবী তোলা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার বিরোধী দলগুলোর এ আবেদন গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে আ.লীগ সরকারের আমলের বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর বোমা হামলার তদন্তে সাবেক বিচারপতি আবদুল বারী সরকারকে প্রধান করে একটি তিন সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। কিন্তু সেসময় আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশাল বিশাল আইনজীবীগণ সাবেক বিচারপতিকে দিয়ে বিচারবিভাগীয় কমিটি হয় না জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের চাকরিরত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে নতুন বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছিলেন। অথচ আজ সরকার যখন সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত একজন সিনিয়র বিচারপতিকে দিয়ে বিচারবিভাগীয় কমিটি করেছে তখন তারা সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে। স্ববিরোধিতার এমন নজির এই সব প্রগতিশীলদেরই বোধহয় মানায়। এদিকে যে আওয়ামী লীগ তাদের আমলে সংঘটিত বোমা হামলা তদন্তের জন্য একটা বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠন করেনি বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত প্রত্যেকটি বোমা হামলার পর তারাই আবার আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী জানিয়েছে।

বোমা হামলার তদন্তে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নজিরবিহীন ব্যর্থতা তাদের এ দাবীকে জোরালো করেছে সন্দেহ নেই। ব্যর্থতার সকল দায়ভার তাদের ঘাড়ে চাপানোর আগে ভেবে দেখা দরকার বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে কি স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হয়েছিল কিনা? কিন্তু এ কারণেই শুধু আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী তোলা হচ্ছে, নাকি এর পেছনেও রয়েছে কোন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা, বিশেষ করে বাংলাদেশের বোমা হামলার পেছনে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থাকতে পারে বলে জোরালোভাবে আশঙ্কা করছে দেশবাসী।

কারা সেই আন্তর্জাতিক তদন্ত করবে তাদের পারফরমেন্সই বা কি? মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বা এফবিআইকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই সিআইএ বা এফবিআই কি তাদের দেশে টুইন টাওয়ার হামলা ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। কারা এই টুইন টাওয়ারে হামলা করেছিল দীর্ঘ তিন বছরেও তারা সুনির্দিষ্ট করে শনাক্ত করতে পারেনি। আফগানিস্তান থেকে লাদেন বা তার

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজনেরও টিকিটি আজ পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি। সিআইএ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা, এমআই সিক্স, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সম্মিলিত কার্যক্রমকে ব্যর্থ করে ইরাকে মুজাহিদরা তাদের কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। এরকম আরো অসংখ্য নজির দেয়া যায়। তারপরও কেন আন্তর্জাতিক তদন্তের কথা বলা হচ্ছে?

বিশ্ব জানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের স্বার্থে মিথ্যা ও ভুল রিপোর্ট দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক ইরাক ও আফগানিস্তান তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কাজেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বোমা হামলার সাথে যদি সাম্রাজ্যবাদীদের কোন হাত ও উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে এবং সে উদ্দেশ্যে তারা যদি কোনো ভ্রান্ত রিপোর্ট দেয় তবে তার দায়ভার জাতিকে বহন করতে হবে বহু মূল্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক তদন্ত বাংলাদেশেও হয়েছে এবং তাদের সফলতার চিত্র(?) দেখেছে বাংলাদেশের মানুষ। ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার পর ব্রিটিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ দল দু'দফা বাংলাদেশে এসে তদন্ত করে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলাকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। বরং এ হামলার তদন্তে বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের মোস্ট ওয়ান্টেড একজন প্রবাসী সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না দিয়ে তাকে বাংলাদেশ ত্যাগে সহায়তা করেছে খোদ ব্রিটিশ দূতাবাসের এক কর্মকর্তা। আ.লীগ আমলে সংঘটিত কোটালীপাড়া বোমা হামলার তদন্তে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই বাংলাদেশে এসেছিল। কিন্তু কোটালীপাড়া বোমা হামলা তদন্তের ভবিষ্যৎ জাতির জানতে বাকি নেই।

অবশ্য সরকার নাজুক পরিস্থিতি এড়াতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু চিহ্নিত এই গোষ্ঠীটি তাতে সন্তুষ্ট নয়। তারা মূলত চায় তদন্তের নামে এখানে সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তির গোয়েন্দা সংস্থাকে বাংলাদেশে আসতে দেয়া হোক। আরো খোলাসা করে বললে বলতে হয়, এদের দাবী বাংলাদেশে বোমা হামলার তদন্তভার ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেয়া হোক। যাতে তারা পার্থ সাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় এমন একটা রিপোর্ট দিতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে মৌলবাদী ও তালেবানী শক্তির উত্থান ঘটেছে, এখানে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আছে এবং তারাই এই বোমা হামলার পেছনে দায়ী বলে রিপোর্ট দিতে পারে। বাংলাদেশস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি ইতোমধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খানের সাথে দেখা করে এ বোমা হামলা তদন্তের ব্যাপারে ভারতের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাতে কাজ না হওয়ায় তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংকে দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পর্যন্ত লিখিয়েছেন।

অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে কোনোরূপ পূর্ব সঙ্কেত না দিয়ে সবগুলো বাঁধ খুলে দিয়ে যে ভারত বাংলাদেশকে বন্যায় ডুবিয়ে মারলো, বন্যার্তদের সাহায্যে সারা বিশ্বের মানুষ এগিয়ে এলেও যে ভারত সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী হয়ে এক ছটাক ত্রাণ দিয়ে সহায়তা করেনি, উল্টো বাংলাদেশে খাদ্য রপ্তানী করবেনা বলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে, বাংলাদেশের বোমা হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে তার এতো দায় পড়লো কেন? আ.লীগ আমলের বোমা হামলায় মোস্ট সাসপেক্টেড ব্যাক্তি হাসান ইমামকে নিজেদের দেশে জামাই আদরে লুকিয়ে রেখেও তাদের এ আগ্রহ বিস্ময়কর বৈকি। নাকি ভারত কি কোনোভাবে শঙ্কিত হয়েছে পড়েছে? বাংলা প্রবাদে একেই বোধ হয় বলে, ' ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না।'

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ২১ আগস্ট বোমা হামলার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু তথ্য

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হস্তগত হয়েছে– যার মাধ্যমে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব বলে তারা মনে করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো গোয়েন্দাসংস্থা বা বাংলাদেশ সরকারের কোনো রিপোর্ট মহলবিশেষের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে বা এই রিপোর্ট নিয়ে রাজনীতি করা হতে পারে মনে করে সরকার আন্তর্জাতিক তদন্ত সংস্থার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে যেভাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ও সিআইএ বাংলাদেশে চলাচল শুরু করে দিয়েছে তাতে দেশপ্রেমিক নাগরিকেরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কেননা স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এখন সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ইসলাম। বিশেষ করে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 'ওয়ার এগিনেস্ট টেরোরিজম' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশের মতে যার অপর নাম ক্রুসেড) পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রীস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চূড়ান্ত টার্গেট হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান।

সম্প্রতি এই চক্রের সাথে যুক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। এই ত্রি-শক্তি একত্রে সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূলে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সারা বিশ্বের যেখানে ইসলাম, যেখানে মুসলমান সেখানেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সর্বশক্তি নিয়ে। কাজেই তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম বাংলাদেশের প্রতি তারা উদাসীন অথবা বাংলাদেশের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে বাংলাদেশে গত দেড় দশক ধরে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র বজায় থাকায় এবং এদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা হওয়ায় এদেশের গায়ে তালেবানী তকমা লাগানো খুব সহজসাধ্য হচ্ছে না। কিংবা বাংলাদেশকে নিয়ে হয়তো তাদের অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। আপরদিকে ইরাক ও আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার দিকে নজর দেয়ার সময় খুব সহজ হয়ে উঠছে না। তাই বলে উদাসী, তা কিন্তু মোটেই নয়। সেটা মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড তার সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়া সফরকালে পরিস্কার করে বলেছেন,'(মার্কিন সরকারের) সময় এসেছে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে নজর দেয়ার'।

কাজেই মার্কিন সরকারের বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থার বাংলাদেশ সফরের ফলে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ উদ্বিগ্ন। কেননা, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে কখনোই তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না। এর জন্য যা যা করা দরকার সবই করবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। তদন্তের নামে ষড়যন্ত্রের আসল বীজ তারা এখানে বুনবে না তারই গ্যারান্টি কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, কয়েকদিন আগে দিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে একটি অতি গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উভয়পক্ষ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করলেও তার বিষয়বস্তু জানা যায়নি। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ভারত-মার্কিন ঐ বৈঠকে ২১ আগস্টে বোমা হামলাসহ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বোমা হামলার বিষয়টি ব্যাপকভাকে আলোচিত হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে, চলমান বোমা হামলায় যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইন্ধন রয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তবে সে রিপোর্ট কি আদৌ প্রকাশিত হবে, নাকি কোটালীপাড়ার বোমা হামলার মতো চেপে যাওয়া হবে অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে সরকার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে ব্যর্থ হবে।

কার লাভ কার ক্ষতি

বোমা হামলা নিয়ে নানামুখী হিসাব চলছে দেশে-বিদেশে। অনেকে হিসাব করছেন

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার ফলে আসলে কার লাভ হয়েছে। বিরোধী দল দাবী করছে তাদের নেত্রীকে খুন করে লীগকে নেতাশূন্য করার জন্য সরকারই এ হামলা চালিয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো দলের নেতাকে হত্যা করে অন্য দল লাভবান হয়েছে এমন নজির খুব বেশী নেই। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ফারুক-রশীদরা ক্ষমতায় যেতে পারেনি। খন্দোকার মুশতাকের নেতৃত্বে তার দল আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার পর বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে তার দল বিএনপি বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরও কংগ্রেসই ক্ষমতায় গিয়েছে। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। কাজেই এ বোমা হামলার সাথে বিএনপি'র যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তা সহজেই অনুমেয়। কেননা, এই বোমা হামলায় সরকারের কোনো লাভ হয়নি। বরং সরকারের জন্য তা চরম বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সত্যি বলতে কি ২০০১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের ভাবমূর্তি এতো বড় বিপর্যয়ের মুখে আর কখনো পড়তে হয়নি। এই প্রথম সরকার সত্যিকার অর্থেই ব্যাকসিটে বসতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে এই বোমা হামলার পর আ.লীগ দলের কয়েকজন নেতাকর্মী হারালেও রাজনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হয়েছে বলে তাদের দলের নেতাকর্মীরাই বলতে শুরু করেছে। ৩০ এপ্রিলের আল্টিমেটাম ব্যর্থ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতি চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যার পরিণতিতে তারা ব্যাক গিয়ারে সংসদে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে দলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, আভ্যন্তরীণ কোন্দল তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দলীয় নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ৩০ এপ্রিলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে সমর্থন করেনি। তার একটা প্রভাব তাদের বৈদেশিক সম্পর্কেও পড়েছিল।

কিন্তু এই বোমা হামলার পর আ.লীগ সাময়িকভাবে হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ড্রাইভিং সিটে বসতে সক্ষম হয়েছে। শোকের মাতমে অন্তর্দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে হলেও চাপা পড়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে আন্দোলনের স্পৃহা তৈরী হয়েছে। সরকারকে তাদের দাবী মানতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকবৃন্দ সুধা সদনে গিয়ে শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে তাদের সহানুভূতি জানিয়েছেন। এতে করে তাদের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিং সহ অসংখ্য রাষ্ট্রপ্রধান ফোনে, সরাসরি বা বার্তা পাঠিয়ে শেখ হাসিনার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। এতে করে তাদের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আগামী দিনে আ.লীগ তাদের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে তাদের কাছে তুলে ধরার মতো একটি ইস্যু হাতে পেল। সবচেয়ে বড় কথা, আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ধরে বাম ও সেকুলারপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে যে একটা জোট গঠনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিল এ বোমা হামলা তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ নিজেই এ বোমা হামলা করেছে তা কিন্তু নয়।

২১ আগস্টের বোমা হামলায় আরো লাভবান হয়েছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বাংলাদেশকে যারা স্থিতিশীল দেখতে চায় না, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল দেখতে চায় না, বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসুক, উন্নতি হোক চায় না যারা, বর্তমান সরকারকে যারা পছন্দ করে না,

www.pathagar.com

বাংলাদশেকে চাপে রেখে যারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে যারা সদা তৎপর, সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আস্থাশীল নয় তারা এই হামলায় লাভবান হয়েছে নিঃসন্দেহে।

অপরদিকে এই বোমা হামলার ফলে সার্বিক অর্থেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্তমান সরকার ও বাংলাদেশের। টাটা কোম্পানীর ১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের একটি প্রস্তাব ঝুলে গেছে এই বোমা হামলার ফলে। বন্যা পুনর্বাসন কাজ হয়েছে চরমভাবে ব্যর্থ। হরতাল সাংবিধানিকভাবে বন্ধের একটা প্রক্রিয়া সরকার জোরালোভাবে চিন্তা করছিল। এর ফলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্যর্থ গোয়েন্দা সংস্থা

২১ আগস্ট বোমা হামলার পর দীর্ঘদিন পার হয়ে গেলেও গোয়েন্দা সংস্থা আজ পর্যন্ত এ হামলার সাথে জড়িত একজনকেও গ্রেফতার বা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি এতগুলো বোমা হামলা হলেও কোনো বোমা হামলার পূর্বে এ বিষয়েও সরকারের তরফ থেকে কোনো সতর্কতামূলক বার্তা দেয়া হয়নি জনগণকে। শুধু এই বোমা হামলা নয়, অতীতের বোমা হামলাগুলোর কোনোটির ক্ষেত্রেই তা হয়নি এবং কোনো বোমা হামলাকারীদের শনাক্ত করতে পারেনি সরকার। কোনো ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারকে খুশি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে দায়সারা গোছের রাজনৈতিক রিপোর্ট দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে। হামলাকারী নেপথ্যের গডফাদারদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করেনি। বগুড়ায় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার মামলার চার্জশীটে কয়েকজন ক্যারিয়ারকে আসামী করা হয়েছে। কিন্তু কারা এই গোলাবারুদ এনেছে, কোত্থেকে এসেছে, কি উদ্দেশ্যে এসেছে তার কিছুই বলা হয়নি। চট্টগ্রামের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের চার্জশীটের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। কোর্টের নির্দেশে পুনঃ তদন্ত করার পরও গডফাদারদের নাম বেরিয়ে আসেনি। টেলিফোনে এতগুলো বোমা হামলার হুমকি দেয়া হলো বিভিন্ন স্থানে। অথচ একটিরও হদিস করতে পারল না তারা। টিএন্ডটি বা মোবাইল কোম্পানীর সার্ভারগুলোর সাহায্য নিয়ে এটা করা ছিল আজকের প্রযুক্তির যুগে খুবই সহজ কাজ। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সবসময় তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলে পার পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন উদ্ধারের ক্ষেত্রে তো কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপি বলেছেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তারা জানেন, তাকে কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু এরপর খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকার পরও পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। উল্টো পুলিশ আরো জামাল উদ্দিনের পরিবারের কাছ থেকে তাকে উদ্ধারের নামে মধ্যস্থতা করে মুক্তিপণের টাকা তুলে দিয়েছে সন্ত্রাসীদের কাছে। এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। সুতরাং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে পারবে না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রতি সরকারের জোরালো দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে গোয়েন্দা সংস্থা রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ আধুনিককালে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে চলতে হয় মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে। কাজেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়ন, আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজনে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে নতুন করে। তাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি

www.pathagar.com

সরবরাহ এবং সম্পূর্ণ পেশাদারভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, গোয়েন্দা সংস্থা সমূহকে খাঁটি দেশপ্রেমিক সংস্থারূপে গড়ে তুলতে হবে।

ব্যর্থতার দায়ভার এড়াতে পারে না সরকার

বোমা হামলার সাথে যদি সরকারের সংশ্লিষ্টতা নাও থাকে তবুও এর ব্যর্থতার দায়ভার সরকার এড়াতে পারে না। প্রথমত: সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ ব্যর্থতা বোমা হামলা রোধ করতে না পারার ব্যর্থতা। হামলার সাথে যারাই জড়িত থাক তাদেরকে বিরত করতে না পারার ব্যর্থতা সরকারের। একের পর এক দেশে বোমা হামলা হচ্ছে কিন্তু সরকার একদিকে যেমন বোমা হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে সুষ্ঠু তদন্ত শেষে কোনো বোমা হামলা ঘটনার বিচার করতে পারেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে এ পর্যন্ত পাঁচটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। এগুলোর মধ্যে আওয়ামী সরকারের আমলে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর বোমা হামলাগুলোর তদন্তে গঠিত হয় বারী কমিশন, ময়মনসিংহ শহরের সিনেমা হলগুলোতে বিস্ফোরিত বোমা হামলার তদন্তে গঠিত হয় সুলতান কমিশন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনা ও মালিবাগের টিএন্ডটি মসজিদের ঘটনায় দুটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এ চারটি কমিশনই তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। শেষ দুটি ঘটনার রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কিছুটা ব্যবস্থা নিলেও বিচারপতি বারী কমিশনের রিপোর্ট এবং সুলতান কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর তো দূরের কথা, সরকার তা জনসমক্ষে প্রকাশই করেনি। বিচারপতি বারী কমিশনের রিপোর্টে আ.লীগ আমলে সংঘটিত বোমা হামলাগুলোর ব্যাপারে কারা দায়ী পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। এসব বোমা হামলার ব্যাপারে ভারতের সংশ্লিষ্টতার কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। সুলতান কমিশনের রিপোর্টে ময়মনসিংহের বোমা হামলাকারী কারা তা সুস্পষ্টভাবে বলা না হলেও আগের বোমা হামলাকারীদের সাথে এদের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এ বোমা হামলার উৎস হিসাবে প্রতিবেশী দেশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সরকার এসব রিপোর্টের সুপারিশ জনসমক্ষে প্রকাশ ও কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগে প্রতিপক্ষ এসব রিপোর্টকে হাস্যকর, প্রলাপপূর্ণ প্রভৃতি উক্তি করে রিপোর্টগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অথচ শুধু বারী কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করলেই বাংলাদেশে বোমা কালচার চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত বলে সচেতন মহল মনে করে। শুধু তাই নয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে-বিদেশে যারা বাংলাদেশ বিরোধী তথ্য সন্ত্রাস চালিয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও এসব অপরাধীদের ব্যাপারে সরকার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা বিদেশের মাটিতে তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে সরকার আজ পর্যন্ত তাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে পুরস্কৃত করেছে। দুর্বল মামলা সাজানোর কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামীরা কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে সদর্পে বেরিয়ে এসে পুনরায় একই কর্মে লিপ্ত হয়েছে। শাহরিয়ার কবিরকে পুলিশ কেনইবা গ্রেফতার করল আবার কেনইবা ছেড়ে দিল জাতি তা আজো জানতে পারল না। অথচ শাহরিয়ার কবির তার কাজ এখন আরো জোরেশোরে করে যাচ্ছে। আজ যদি তার কাজ সঠিক হয় তবে সেদিন ভুল কে করেছিল। রয়টার্সের সাংবাদিক এনামুল

www.pathagar.com

হক আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে জানিয়েছে, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীর ইন্ধনে তিনি ময়মনসিংহের বোমা হামলার ব্যাপারে রয়টার্সে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এ রিপোর্ট প্রকাশের জন্য খোদ রয়টার্স ক্ষমা চাইলেও এনামুল হক বা সাবের চৌধুরীর টিকিটিও ছুঁতে পারেনি সরকার। আবার ঢাকার সেগুনবাগিচায় ২১ জন ভারতীয় স্বাধীনতাকামী নিহত হবার মিথ্যা খবর প্রকাশের জন্য বার্তা সংস্থা এপি'র বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। বার্টিল লিন্টনার মুচলেকা দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেও চ্যানেল ফোরে ঠিকই বাংলাদেশ বিরোধী সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সলিম সামাদের বক্তব্য নিয়ে ঠিকই বাংলাদেশ বিরোধী রিপোর্ট 'এ প্রিজনার্স টেল' ছাপা হয়েছে টাইমস-এ। সরকারের এসব দুর্বলতার কারণেই অপরাধীরা পার পেয়ে গেছে এবং পার পেয়ে পুনরায় বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। যশোর, বগুড়া, বাড্ডা, চট্টগ্রামে অস্ত্র চোরাচালানের গডফাদার কারা তা বের করতে না পারায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী অপহৃত চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনকে উদ্ধারের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সে নির্দেশ পালিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে শোনা যায়নি। খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করে যদি কোনো সরকারী কর্মকর্তা পার পেয়ে যায় তাহলে সেই সরকারের ব্যর্থতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সহজেই অনুমেয়। অনেক ভাল কাজ করা সত্ত্বেও এ ধরনের কিছু ছোট-খাট ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে গোটা সরকার আজ সারা দেশে সমালোচিত হচ্ছে।

তবু সব কিছু এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এই সরকারকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বিজয়ী করেছিল–যা বিএনপি প্রত্যাশাও করেনি। সরকারের তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে। সামনে আরো দুই বছর সময় আছে। খুব বেশী সময় না হলেও সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তা যথেষ্ট। বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ সেই নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের দিকে যে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের কারণে এদেশের মানুষ তাকে আপোষহীন ও দেশনেত্রী উপাধীতে ভূষিত করেছে।

(ইনকিলাব : ৯-৯-২০০৪ থেকে ১৯-৯-২০০৪)

"যে ধর্মে ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইশারা করাও নিষেধ সেখানে অস্ত্রবাজি ও নিমর্ম কায়দায় হত্যার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী জিহাদের সাথে বর্তমান সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।"

-মাওলানা রুহুল আমীন
প্রিন্সিপাল, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা

www.pathagar.com

বোমা হামলা শরীয়ত সম্মত নয়

– খতীব, জাতীয় মসজিদ

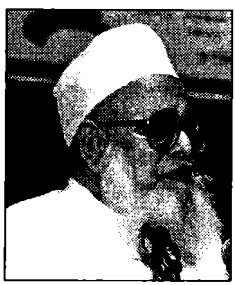

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে বলেন, এই বোমা হামলা, অরাজকতা বা সন্ত্রাস এগুলো শরীয়তসম্মত নয়। ইসলাম এটা সমর্থন করে না এবং কোরআন জঙ্গীবাদ, বোমা হামলা, সন্ত্রাস এগুলো সমর্থন করে না। এ ধরনের গুপ্ত আক্রমণ অপরাধ। হত্যার দিক থেকে এটা আরও জঘন্য অপরাধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার পরিণতি হলো জাহান্নাম।

আল্লাহতায়ালার গজব এবং অভিশাপ তার ওপর পড়বে। আল্লাহতায়ালা এর জন্য বিরাট আজাব প্রস্তুত করেছেন। এখন দলীয় আর ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে মজে থাকার সময় নয়। জঙ্গীবাদকে খাটো করে দেখার সময় নেই। বোমাবাজরা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু। ইসলাম কখনোই চরমপন্থাকে সমর্থন করে না। বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে ইসলামী আইন কায়েম করা যায় না। এটা কোন জিহাদ নয়, জিহাদের সঠিক পদ্ধতিও নয়। জিহাদের নামে অপব্যাখ্যা হচ্ছে। জিহাদের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। এই নিয়মে জিহাদ করলেই কেবল জিহাদ হবে। ইসলামে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস বলে কিছু নেই। জিহাদ হয় কাফেরদের মোকাবিলায়। এদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান। এখানে জঙ্গীরা কার সঙ্গে জিহাদ করছে, মুসলমানদের সঙ্গে কোন জিহাদ হয় না।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি কাজ। তাকে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা কুফরি কাজ। একে কেউ হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর হালাল মনে না করে এটাকে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ মনে করলেও সেটা হবে কুফরি কাজ। এটা কোন মুসলমান করতে পারে না। বিপথগামী লোকেরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড জিহাদ বলে কিছু যুবককে ট্রেনিং দিয়েছে। ইসলামী আইন কায়েমের কথা বলে তাদের বোমাবাজি করার জন্য মগজ ধোলাই করেছে।

ইসলামী আইন কায়েমে এ ধরনের পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-' লা তারজিউ বাদী কুফফারা'-আমার পরে তোমরা কুফরি পক্ষ অবলম্বন করো না। কুফরি পন্থার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, যেমন একে অপরকে

www.pathagar.com

হত্যা করবে- এটা কুফরি কাজ।

তোমরা তা করো না। আল্লাহতায়ালা কোরআনে বলেছেন-' ওয়া মাইয়াকতুর মুমিনান মুতাআম্মিদান ফাজাযাউহু জাহান্নাম, খালিদীন, ফীহা আবদান ওয়া গাদিবাযাহু আলাইহিম' -কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। তার উপর আল্লাহর গজব পড়বে। সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করলো। চিরকাল তাকে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। এ কারণে কোন মুমিনকে সে উকিল, বিচারক, সাংবাদিক, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই হোক না কেন, হত্যা করা কবিরা গুনাহ। তার শাস্তি জাহান্নাম।

জঙ্গীবাদ, বোমাবাজ সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এটা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ। আমি এর নিন্দা করি এবং যারা এসব কাজ করছে আমরা তাদের এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাই এবং তারা যদি কোন পক্ষের প্ররোচনায় বা পক্ষ থেকে এ ধরনের কার্যকরণ করে সেই প্ররোচনাকারীদের উপদেশ দেই যে, তোমরা বিপথগামী হয়ে যাচ্ছ, তোমরা এ পথ পরিহার করবে। সমাজে শান্তি স্থাপনে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন করবে না। বোমা হামলা, জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ যেভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এটা এখন আমাদের দেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ জাতীয় সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। এজন্য দল-মত নির্বিশেষে এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আহবান জানাচ্ছি যে, আপনারা এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দেশের আলেম সমাজ এ সম্পর্কে বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছে, মসজিদে মুসল্লীদের সামনে এলেমরা তাদের নিজেদের বক্তব্য দিয়েছেন। দেশের প্রায় আড়াই-তিন লাখ মসজিদের ইমাম আলেমদের বলা হয়েছে জুমার খুতবায় তারা যেন জঙ্গীবাদ, বোমা হামলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। দেশবাসীর প্রতি আহবান করছি। আপনারা কোন বোমা হামলাকারী, জঙ্গীবাদ সন্ধান পেলেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনকে আনাবেন। সরকারের উদ্দেশে ইতোমধ্যে বলেছি, পুলিশ বাহিনী, র‍্যাব ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন জঙ্গী এবং বোমা হামলাকারীদের ব্যাপারে তারা যেন আরো সতর্ক থাকে। এ ব্যাপারে সরকারকে তাগাদা দেয়ার কথা জানিয়েছি।

দেশে জঙ্গী, বোমাবাজ খুঁজতে মাদ্রাসার ভিতর পুলিশ ঢুকে পড়ছে। এটা বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসায় কোন জঙ্গী থাকলে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। রাত ৩টা-৪টার সময় মাদ্রাসায় গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে না। এটা করা ভালো নয়।

কোন মাদ্রাসায় কোন সন্ত্রাসী বা জঙ্গী থাকলে বা আভিযানে কওমী মাদ্রাসা, সরকারী মাদ্রাসা ও অন্যান্য মাদ্রাসার প্রিন্সিপালদের বা প্রধানদের সাথে বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করবে। যদি এদের পরামর্শ থাকে এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে। এটা হলে মাদ্রাসাগুলোর কোন অভিযোগ থাকবে না। মাদ্রাসার পিছনের দরজা দিয়েও কেউ ঢুকবে না। ফলে মাদ্রাসাগুলো অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবে এবং সরকারেরও সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে।

(ইনকিলাব : ১৪-১২-০৫)

www.pathagar.com

যারা বোমা হামলা করছে তারা পথভ্রষ্ট

-পীর সাহেব ফুরফুরা শরীফ

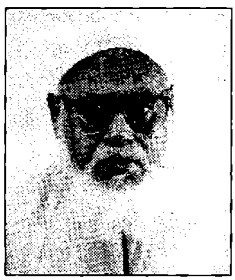

শরীফের গদ্দীনশীন পীর আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী দেশব্যাপী বোমা হামলার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টি করা কোরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কাজ। এরশাদ হচ্ছে ঃ 'ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য' আল-কোরআন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ উল্লেখিত ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ মহান আল্লাহর মহাবাণীর শিক্ষাই মাদরাসাগুলোর মধ্যে সশ্রদ্ধাভরে শিক্ষা দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও কিছু ইসলাম-বিদ্বেষীমহল আল্লাহ-আল্লাহর রাসূলের মেহমান নির্দোষ মাদরাসার ছাত্রদের আত্মঘাতী বোমাবাজ করে তিরস্কার করছে। আমার প্রশ্ন তাহলে প্রকৃত বোমাবাজ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত "বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারনরা কোন মাদরাসার ছাত্র" জাতি আজ জানতে চায়, যারা আজ বিশ্বব্যাপী নির্দোষ মুসলমানের ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাজা খুনে হাত লাল করেছে। অন্যায়ভাবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিয়ে দম্ভে ফেটে পড়ছে। যারা আজ অসহায় জীবিত মা-বোনদের ওপর বুলডোজার উঠিয়ে দিয়ে জ্যান্ত হত্যা করছে? যারা আকাশ পথে, স্থলপথে, নৌপথে তথা চতুর্মুখী আক্রমণ করে নির্দোষ স্বাধীনচেতা, স্বাধীনতাকামী মুসলমানকে নির্বিচারে গণহত্যা করেছে? বিশ্বব্যাপী ত্রাসের রাষ্ট্র বানিয়েছে। যারা দম্ভ করে মুসলমানকে হত্যা করতে পেরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। বলবেন কি যারা আলগণরীব অন্ধকার কারাভ্যন্তরে নগ্ন মুসলমানদের ওপর পাগলা কুকুর আর অসভ্য পতিতা লেলিয়ে দিয়ে খেলা দেখছে। নির্মম নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে যাদের হত্যা করা হয় তাদেরকেই বলা হয় সন্ত্রাসী, আর যারা হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তারাই সভ্য জগতের সভ্য মানুষের ভেক ধরে মানবতাবাদী, মানবসেবী, মানবদরদী পরিচয় দিয়ে মানবতার মুখোশ পরে বিশ্ববাসীকে ন্যায়ের তালিম দিচ্ছে।

ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও দেশীয় ইয়াহুদী এজেন্টরা প্রেস মিডিয়া, ইলেকট্রনিকস মিডিয়াগুলোয় তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে ইসলাম তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমার প্রশ্ন, এদেশের সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবু তাহের ও হাসনাত সাহেব কোন মাদরাসার ফসল তথা কোন মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে বলবেন কি? জানি, জবাব দিতে পারবেন না। তাই বলছি, বিশ্বের কোনো কওমী মাদরাসা সন্ত্রাসী বানায় না। সন্ত্রাসীর শিক্ষা দেয় না। সন্ত্রাসী আপনারা আপনাদের স্বার্থেই বানান। আপনারাই ব্যবহার করেন, সুতরাং মিথ্যা কথা লিখবেন না। মিথ্যা কথা বলবেন না। মিথ্যা ও সাজানো নাটক দিয়ে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না বরং নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে প্রতিটি কথা ও কাজের- এ চিন্তা ও ভয় অন্তরে রেখে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হোন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, নিশ্চয়ই অপশক্তি ধ্বংসশীল।"

সারা বিশ্বে আজ বোমা হামলা হচ্ছে। বাংলাদেশেও আত্মঘাতী বোমা হামলা শুরু হয়েছে, যা বাংলাদেশের মানুষ কল্পনাও করেনি। যারা এ কাজ করছে তারা অধিকাংশ ওলামার মতে পথভ্রষ্ট, এ ব্যাপারে আমিও একমত। কারো নাম আবদুল্লাহ

www.pathagar.com

হলেই সে কি খাঁটি আল্লাহর বান্দা হয়ে যায়? কোনো দলের নামে ইসলাম থাকলেই সে দল কি ইসলামের ধারক-বাহক হয়ে যায়? নাম হিম্মত আলী কিন্তু শুইলে আর উঠতে পারে না, নাম নজর আলী কিন্তু চোখে দেখে না, এমন বহু লোকই আছে।

পবিত্র কোরআনকে বিকৃত করা যাবে না কিন্তু অর্থকে তো বিকৃত করা সম্ভব। যেমন, কাদিয়ানীরা পবিত্র কোরআনের অর্থকে বিকৃত করে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পরে নবী আসতে পারে, এ দাবী করে নিজেরাই কাফের হয়েছে। তদ্রূপ কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে যারা জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে তাদের নামে যত বড় উপাধিই থাকুক, মুখে যত বড় দাড়ি থাকুক, মাথায় টুপি থাকুক বা কথা যতই সুমিষ্ট, আকর্ষণীয় হোক অধিকাংশ উলামার মতে, তারা ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী। আমিও সেই মত পোষণ করি।

স্মরণ রাখা উচিত, যে লোক অপরাধী তার আপন যমজ ভাই দেখতে একই রকম হলেও যমজ ভাইকে সাজা দেয়া যায় না। জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, গ্রামবাসী বা দলের লোককেও নয়। অপরাধ যার সাজা তারই প্রাপ্য, বিচার তারই হবে। অপরাধীর আত্মীয়-স্বাজন অবজ্ঞা করা, গ্রেফতার করা, জেরা করা, উত্ত্যক্ত করা, সাজা দেয়া, সাধারণভাবেই মানবতা ও ইসলামবিরোধী কাজ।

বিশ্বের প্রতিটি মানুষ একথায় বিশ্বাসী যে, বোমা হামলার ঘটনা সুস্পষ্ট সন্ত্রাসী কাজ। ফিতনা-ফাসাদের কাজ। সমাজে যখন ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে তখন কি করা উচিত সে ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে কোরআন-সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনা কি তা অনুসন্ধান করে সেমতে মজবুতভাবে শুধু কোরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে হবে। অনুসরণ-অনুকরণও করতে হবে। দেশবরেণ্য প্রাজ্ঞ ওলামাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। কারো একক বা বিচ্ছিন্ন মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম কারো ব্যক্তিগত বা কোনো দলের বা জামায়াতের একচ্ছত্র সম্পদ নয়। আল্লাহর ওহীভিত্তিক এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম ধর্ম। এরশাদ হচ্ছে : "ইসলামই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান" (আল কোরআন, সূরা বাকারা)। সকল নবী-রাসূল বিশ্ববাসীকে ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের সমস্ত যুগের জ্ঞানী-গুণীরা ইসলামের নিয়ম-নীতির প্রশংসা করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম সেরা আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী 'মাইকেল এইচ হার্ট' বিশ্বের শুরু হতে এ পর্যন্ত মানবজাতির সেরা একশ'জন নেতার তালিকা করে বই লিখেছেন 'দ্য হানড্রেড' নামে। এতে সবার সেরা মহামানব হিসেবে তিনি মহানবী হযরত মোঃ (সাঃ)কে প্রথমেই স্থান দিয়েছেন। এমনকি নিজে খৃষ্টান হয়েও হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরে স্থান দিয়েছেন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে। সকলেই অবগত আছে, ভারতের প্রায় ৫০ লক্ষাধিক হিন্দুর পুরোহিত দশটি ধর্মের ওপর গবেষণা করে অনেক ভাষায় পিএইচডি ডিগ্রী গ্রহণকারী ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজি মহারাজ উদয়সেন পবিত্র কোরআন শরীফ পড়ে বুঝে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন, নাম দিয়েছেন, ডঃ ইসলামুল হক যা বিশ্ববাসী সকলেরই জানা।

সুতরাং দু-একজন পথভ্রষ্ট মানুষের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হওয়া বোকামি হবে। যার আকীদা ও আমলের জন্য তাকেই জবাব দিতে হবে। সুতরাং অনুরোধ এমন কথা কেউ বলবেন না যে, মুসলমান কাফের হয়ে যায়, বরঞ্চ এমন কথা বলুন, যেন কাফের মুসলমান হয়ে যায়। পরিশেষে বলব, মুসলমান একে অন্যের ভাই। এরশাদ হয়েছে,

www.pathagar.com

'আল-মুসলিমুআখল মুসলিম' (আল-হাদীস)। তাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইস্‌লাম, দেশ, জাতি তথা মানবতার শত্রুদের প্রতিহত করে আল্লাহর হুকুম মতে জীবন পরিচালনা করুন। আল্লাহ আমাদের জানার ও আমলের তাওফিক দিন। আমীন। হুম্মা আমীন।

(ইনকিলাব : ১৮-১-০৬)

"সন্ত্রাস, বোমা হামলা, ইসলামের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি, জেহাদের নাম করে আত্মঘাতী হামলা, শহীদের নাম নিয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। একজন মুসলমান কোন সময় অপর একজনকে হামলা করতে পারে না, বোমা হামলা করতে পারেনা।"

–হযরত মাওলানা আখিবুর রহমান নেছারাবাদী
কায়েদ সাহেব হুজুর, ঝালকাঠি

www.pathagar.com

বোমাবাজরা ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য টুপি-দাড়ি ব্যবহার করছে

– আল্লামা আজীজুল হক

দেশে চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক বলেন, বোমাবাজরা ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য টুপি, দাড়ি ব্যবহার করছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। বোমা হামলার ব্যাপারে শুধু আমি নয়, গোটা দেশবাসী মনে করে এটা দেশ, জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক পূর্ব থেকেই এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলে আসলেও বাংলাদেশে এটি নতুন। গত সরকারের আমলে বোমা বিস্ফোরণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। বর্তমান সরকারের আমলেও প্রথম দিকে বিক্ষিপ্ত কয়টি ঘটনা ঘটানো হয়। কিন্তু গত ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলাটি ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিকল্পিত। শুধু দেশীয় কোন অখ্যাত সংগঠনের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটানো সম্ভব ছিল না। এর পেছনে কোন শক্তিশালী বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাত, পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। বিশেষ করে এর সাথে ইসলামের মুখোশকে ব্যবহার করে এদেশের ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষ্যেই এ মিশনটি কাজ করছে। এদেশের ওলামায়ে কেরাম যারা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছেন তারা প্রকাশ্য রাজনীতি করে যাচ্ছেন। প্রতিটি নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছেন। বাকি যারা সরাসরি রাজনীতি করেন না তাদেরও সমর্থন রয়েছে এর প্রতি। আলেমরা যারা সরাসরি রাজনীতি করেন না তারা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী উচ্চমানের মানবতাসম্পন্ন একদল লোক তৈরী করেন। যারা সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হানাহানি, খুন-খারাবি, ঝগড়া-ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে সর্বদা লোকদের অহ্বান জানান। আমি মনে করি, এদেশের ভোটের রাজনীতিতে আলেমদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। বিশেষ করে গত সরকারের আমলে রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলনে ওলামা-মাশায়েখ, পীর-বুজুর্গ, খানকাওয়ালা ও ধর্মপ্রাণ জনতার সক্রিয়তা ইসলামের শত্রুদের ভাবিয়ে তুলেছে। যাতে আগামী নির্বাচনগুলোতেও ইসলামী দল ও আলেম-ওলামা তেমন কোন ভূমিকা রাখতে না পারেন সে লক্ষ্যে জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার মিশন নিয়ে এ বোমা সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। বোমা সন্ত্রাস বন্ধ করতে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা লাগবে। দেশ, জাতি ও ইসলামের সাথে দলীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে। সরকার ও বিরোধী দল বা দলীয় নেতাদের এক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। তাহলে জনগণও সহযোগিতা করবে। আর সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। আর তাই দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মঘাতী বোমাবাজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে সন্ত্রাস অবশ্যই বন্ধ হবে।

অনর্থক নির্দোষ আলেম সমাজ যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে সেদিকে সরকারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ইনকিলাব : ২৫-১২-০৫)

www.pathagar.com

বোমাবাজি সম্পূর্ণ হারাম

- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

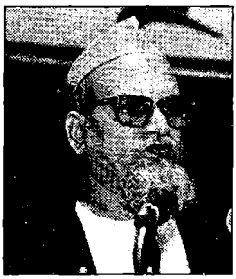

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাসিক মদীনার সম্পাদক চলমান বোমাবাজি সম্পর্কে বলেন, বোমাবাজরা ইসলামের নাম করে বোমাবাজি করছে। কিন্তু ইসলামের নাম করা এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। তারা কি চায়? বোমা মারলে সেটা সম্পন্ন হবে এটা আমাদের বোধগম্য নয়। ইসলামের জন্য কিছু করতে চাইলে সেটা ইসলামী পদ্ধতিতে করতে হবে। এছাড়া নিরপরাধ মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করা, আহত করা এর বৈধতা ইসলামে নেই। বোমাবাজি সম্পূর্ণ হারাম। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় ফিতনা বলে। এ ফিতনার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে কোথাও পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে এদেশের আলেম সমাজের দায়িত্ব হলো, যারা বোমাবাজি করছে তাদেরকে বোঝানো। জনসাধারণের মধ্যে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তা হতে হবে। ঐ সকল বিভ্রান্তদের পথে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি এ বিষয়টি নিয়ে বৃহত্তর একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

সরকার ও বিরোধী দলকে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসা উচিত। সকল ধরনের রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে তাদেরকে এক টেবিলে বসতে হবে। দেশ ও জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে তাদেরকে ঐকমত্যে আসতে হবে।

আমার ধারণা বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র করার জন্য যারা দেশে-বিদেশে কাজ করছে, তাদের দ্বারা বোমাবাজরা ব্যবহৃত হচ্ছে। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা এমন কোন লোক নয় যাদের দ্বারা এতবড় বিরাট একটা ভয়ানক কাজ শুরু করা সম্ভব। নিশ্চয়ই এরা পর্দার অন্তরালে কোন একটা অপশক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। বোমাবাজির যে ক্ষয়ক্ষতি আমরা সাধারণভাবে উপলব্ধি করছি প্রকৃতপক্ষে এর ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশী। এদের কর্মকাণ্ডের পরিধি সুদূরপ্রসারী।

ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন দল-মতের মধ্যে ভয়ানক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই ভুল বোঝাবুঝিকে সংঘাতে রূপান্তরিত করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং এটা জাতীয় জীবনে একটা ভয়ানক দুর্যোগ ও সর্বনাশের ইঙ্গিতবহ। যাদের মধ্যে অন্তত কিছুটা হলেও দেশপ্রেমের অনুভূতি আছে তাদের সকলকেই এই দুর্যোগ রুখে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

(ইনকিলাব : ৭-১২-০৫)

www.pathagar.com

ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে এটা ইসলামের শত্রুতা

– মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে বলেন, সারা দেশে যে বোমা হামলা হচ্ছে তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের স্বাধীনতা এবং দেশের অস্তিত্বকে বিলীন করার জন্য বাইরের একটা চক্রান্তে দেশীয় কিছু দেশদ্রোহী দুশমন, যারা এদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে চায় না তারাই এটা করাচ্ছে। তার সাথে সাথে বাংলাদেশে যে ইসলামী গণজাগরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এই গণজাগরণকে নস্যাৎ করার জন্য যাতে আগামীতে এ দেশে কোন ইসলামী শক্তির আবির্ভাব না ঘটতে পারে, বোমা হামলার পেছনে এটারও একটা কারণ। দেখা গেছে বোমা হামলাকারীরা জায়গায় জায়গায় ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার নাম করে লিফলেট বিতরণ করছে আর বোমা হামলা চালাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, তারা জনগণকে ইসলামী আইনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের বোমাবাজি অগ্রহণযোগ্য এবং শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে বলা যায় হারাম কাজ। ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে এটা ইসলামের শত্রুতা।

বোমা হামলার বিরুদ্ধে এদেশের আলেম সমাজ যা যা করার সব কিছুই করছে। আমরা আজও বিষয়টি নিয়ে মিটিং-এ বসেছি। জনগণকে সচেতন করে তোলা, বোমা হামলার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি। সামনে আমরা মহাসমাবেশ করতে যাচ্ছি। মহাসমাবেশের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো হবে যে, ইসলামের নামে এ ধরনের বোমাবাজি অন্যায়। ইসলাম তা সমর্থন করে না।

বোমা হামলার ব্যাপারে সরকারেরও আন্তরিকতার কমতি নেই কোন অংশে। সরকার ইতোমধ্যেই সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে ও নিচ্ছে। সে লক্ষ্যে বিরোধী দলের সাথে সংলাপের ঘোষণা দিয়ে তাদের সংলাপে বসার আহ্বানও জানিয়েছে। কিন্তু এখানে বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রহস্যজনক। আমার তো মনে হয় যেদিন কোন জায়গায় কোন বোমা হামলার খবর পাওয়া যায় সেদিন শেখ হাসিনা আনন্দে মিষ্টি খান। কারণ তিনি বলছেন যে, খালেদা জিয়া পদত্যাগ না করলে এ বোমা হামলা বন্ধ হবে না। তিনিসহ তার দলের লোকেরাও একই কথা বলছে। বিশেষ করে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ততো স্পষ্ট করে পদত্যাগের কথাই বলছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, সারা দেশে যে বোমা হামলা হচ্ছে তা তাদের ইশারায়ই হচ্ছে। যেহেতু তাদের ইঙ্গিতে হচ্ছে সেহেতু সরকার যে সংলাপের ডাক দিয়েছে তাতে তারা সাড়া দেয়নি।

(ইনকিলাব : ১১-১২-০৫)

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বোমাবাজি জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসী হামলার কোন সুযোগ নেই

– দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেন, আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের পতনের পর পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের গন্তব্য ছিল ইসলামের দিকে। সেই ইসলামের দিকে যেন মানুষেরা না আসতে পারে সেজন্য ইসলামের বিরুদ্ধে চললো নানাবিধ অপপ্রচার। বলা হলো, ইসলাম মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল, ধর্মান্ধ ইত্যাদি। এর কোনটাই ধোপে টিকলো না। কারণ ইসলাম ধর্মান্ধ নয়, প্রগতিশীল। ইসলাম উদার এবং গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক মননশীলতায় বিশ্বাসী। তাই অপপ্রচারকারীরা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে সারা দুনিয়াবাসীর কাছে নিন্দনীয় করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসের অপবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী শুরু করলো ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের মূল উদ্যোক্তা ইহুদী এবং তাদের দোসররা। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা ছড়িয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে বাদ গেল না আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও। সুতরাং আমি মনে করি, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা বিশ্বব্যাপী ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। আমাদের দেশে যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলে বোমা হমলা করছে তারা ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এক কথায় মূর্খ। কারণ, ইসলামের সাথে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম এসেছে আল্লাহর নবী রাসূলদের মাধ্যমে। তারা ইসলাম প্রচার করেছেন আল্লাহর নির্দেশিত পথে এবং তাদের নিজস্ব অনুপম ও চরিত্র মাধুর্য দিয়ে। তারা কেউ ইসলাম প্রচারের জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাননি। এমনকি আমাদের দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও হক্কানি ওলি আউলিয়ার মাধ্যমে। তারা কেউ সন্ত্রাসে বিশ্বাস করতেন না। কাজেই আজকে যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলে বোমা হামলা করছে তারা ঐ ইহুদী ষড়যন্ত্রেরই ক্রীড়নক। তারা আল্লাহর আইনের কথা বলে বিচারক, আইনজীবী হত্যা করছে। প্রশ্ন হলো, বিচারক ও আইনজীবীরা কি আইন প্রণয়ন করেন? তারা আইন প্রয়োগ করেন মাত্র। এবং আমাদের দেশে ইসলামী আইন কিছুতো আছেই। যেমন সিভিল ল' এর মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন এবং উত্তরাধিকার আইন। এ ক্ষেত্রেতো ইসলামের আইনকেই অনুসরণ করা হয়। অনুরূপভাবে দেশে ব্যাংক ও বীমাগুলোতে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। বাকি যেসব ক্ষেত্রে ইসলামের আইন নেই সে-সব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে মোটিভেটে করে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বোমাবাজি, জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসী হামলার কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহর আইন কায়েমের নাম করে আইনজীবী, বিচারক হত্যা করে বেহেশতে যাওয়ার আশা যারা করছে নিঃসন্দেহে তারা জাহান্নামি। কারণ, ইসলামে আদালতের বিচার ছাড়া নরহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা আল্লাহর আইন চালু করার নামে বোমা ও সন্ত্রাসী হামলা করছে তাদের মূল লক্ষ্য ইসলাম ও মুসলমানদের কলঙ্কিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী অপতৎপরতা চলছে এটাকে এক কথায় আমি জাতীয়

www.pathagar.com

দুর্যোগ বলতে চাই। এ সমস্যা শুধু সরকার ও বিরোধী দলের নয়। এ সমস্যা গোটা জাতির, গোটা দেশের অস্তিত্ব, অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতার। এ মহাদুর্যোগ নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা বালখিল্লতার নামান্তর। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমস্যা উত্তরণের জন্য যে সংলাপের আহবান জানিয়েছেন তাতে দলমত নির্বিশেষে সাড়া দিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মান অভিমান ও কালক্ষেপণ না করে দেশ থেকে সন্ত্রাসের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। দেশ থেকে বোমা হামলা তথা জঙ্গীবাদ নির্মূল করার লক্ষ্যে দেশের সম্মানিত ইমাম-খতীব, ইসলামী চিন্তাবিদ তথা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামা-মাশায়েখদের রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। আর তা হচ্ছে প্রতি শুক্রবার মসজিদের খুতবায় তাফসির মাহফিল, সিরাত মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল ও সেমিনার সিম্পোজিয়ামে জনগণকে এক হয়ে বোঝানো প্রয়োজন যে, সন্ত্রাস ও জিহাদ এক কথা নয়। ইসলামের নামে নরহত্যা মহাপাপ। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নামে আত্মহত্যা করা জঘন্য অপরাধ। আত্মহত্যাকারীর জানাজা নিষিদ্ধ। আত্মহত্যাকারী ও নরহত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। এসব ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করার দায়িত্ব ওলামাদের। তাছাড়া আল্লাহর আইন পালন করা কোন কঠিন বিষয় নয়। আল্লাহর আইন- নবী রাসূলগণ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাতে জাতি, ধর্ম, দল, মতনির্বিশেষে মানবতার কি কল্যাণ হয়েছিল তা কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষকে বোঝানোর এখনই সময়।

দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানে যারা জামায়াত-শিবিরকে জড়িত করতে চান তিনি রাজনীতিবিদ হন, সাংবাদিক হন, আলেম অথবা পীর হন অবশ্যই তারা চরম একটি ভুল করছেন। কারণ জামায়াতে ইসলামী এদেশে কোন ভূঁইফোড় অজ্ঞাত অপরিচিত কোন দল নয়। জামায়াতে ইসলামী এই ভূখণ্ডে অর্ধশতাধিক বছর ধরে রাজনীতি করে আসছে। ষাটের দশক থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃস্থানীয় শরীকদার। জামায়াতে ইসলামী বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে অসংখ্য সাহিত্য ভাণ্ডার। এসব সাহিত্যে সন্ত্রাসকে উস্কানি দেয়া হয়েছে এমন একটি লাইনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং জামায়াতে ইসলামীকে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করে কোন পীরও যদি কথা বলেন, আমি মনে করি তার হৃদয়ে খোদাভীতি নেই। কারণ আল্লাহতায়ালা সূরা বনী ইসরাইলে বলেছেন, 'যে বিষয় সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা নেই সে ব্যাপারে বলে বেড়িও না।'

(ইনকিলাব : ২৫-১২-০৫)

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ-ইসলামী শক্তিকে ভাঙ্গার জন্যই এ বোমা হামলা

–মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস এমপি

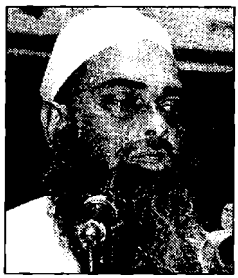

দেশে চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস এমপি বলেন, দেশব্যাপী বোমা হামলা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে। সারা বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন নামে ভাড়াটিয়া সৃষ্টি করে ইসলামী আদর্শ এবং কৃষ্টি-কালচারকে বদনাম করার জন্য এসব করা হচ্ছে। সাধারণ জনগণ যাতে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বোমাবাজদের সেটাই মূল লক্ষ্য। দেশে জঙ্গী বোমা হামলার পেছনে একটি দিক চিহ্নিত করা যায়। বর্তমান জোট সরকার জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির সমন্বয়ে একটি বিশেষ শক্তি অর্জন করেছে। এই শক্তিটাকে টুকরো টুকরো করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। প্ররোচনাকারীদের উদ্দেশ্য, সরকার যাতে বিভ্রান্ত হয়ে বা প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে দেয়। তাহলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। জোট থেকে ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আগামী নির্বাচনে বিএনপি এককভাবে জয়লাভ করতে পারবে না। বোমা হামলার পেছনে এটাও একটা লক্ষ্য। সরকার এখন পরিস্থিতি শক্তভাবে মোকাবিলা করছে। বিগত সরকারের আমলে যেসব বোমা হামলা হয়েছে সে সবের কোন একটির ক্লু তারা উদ্ধার করতে পারেনি। এমনকি যে মুফতী হান্নানের বিরুদ্ধে কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভাস্থলে বোমা পুঁতে রাখার অভিযোগ করা হয়েছিল, সেই মুফতী হান্নানকেও বিগত সরকার প্রতিটি বোমা হমলার সাথে যারা জড়িত সরাসরি তাদের ধরছে এবং যারা পরিকল্পনা করছে তাদেরও চিহ্নিত করেছে। কাজেই আমি মনে করি, বোমা হামলার বিরুদ্ধে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে এখন পর্যন্ত সরকার সফল। বিপথগামীদের জন্য প্রয়োজন মোটিভেশন। এর জন্য ইসলামী শক্তিকে দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। জনগণকে তারা বুঝাবে যে, এই জঙ্গীবাদ, বোমা হামলা, এটি একটি অপশক্তির ষড়যন্ত্র এবং ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যারা ইসলামের নামে এটা করছে তারা বিভ্রান্ত। তারা পথভ্রষ্ট। তাহলে সাধারণ জনগণের মাঝে বোমা হামলাকারীরা কোন অবস্থান সৃষ্টি করতে পারবে না।

ইতোমধ্যে এ কাজ শুরু হয়েছে। সরকার দেশের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করছে এবং কওমী মাদ্রাসা বোর্ডে মিটিং করা হয়েছে। গত ৮ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে। সারা দেশের কওমী মাদ্রাসার আলেম-ওলামাদের নিয়ে একটি মহাসমাবেশ করা হবে এবং মহাসমাবেশের পরে বিভাগ পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে জনসাধারণকে বোঝানোর কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। তাছাড়া এখনও বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ চলছে। আমি মনে করি, এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা ভালো একটা ফলাফল পাব। আত্মঘাতী বোমা হামলাকে জিহাদ বলা হচ্ছে, এটা ফ্যাসাদ হয়। এরা ফ্যাসাদকে জিহাদের নাম দিয়ে জিহাদকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। আমি মনে করি, যারা এটা করছে জিহাদের মত একটা পবিত্র বিষয়কে বদনাম করার জন্য আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা এটা করছে।

www.pathagar.com

আমার জানা মতে, এ কাজের সাথে জড়িত আজ পর্যন্ত এমন একজনও পাইনি যারা আরবী পড়তে পারে। এদের কেউ ১০ম শ্রেণীতে পড়েছে বা স্কুলে পড়েছে বা কোন এক হাফিজ সাহেব, ক্বারী সাহেব এসব লোকেরা গরীব পরিবারের সাধারণ লোকদের লোভ দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে এ পথে নামানো হয়েছে। মানুষ হত্যা করলে বেহেশত পাওয়া যাবে। এসব বলে তাদের ব্রেন ওয়াশ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি এসব বোমা হামলাকারীর সত্যিকার কোরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান থাকতো অবশ্যই এরা খপ্পরে পড়তো না।

আমার জানা মতে, আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন আলেম বোমা হমলা সমর্থন করেনি, এবং তাদের হামলাকারী হিসেবে দেখাও যায়নি। সরকার প্রশাসনিকভাবে যে পদক্ষেপ নিয়েছে আমি মনে করি এ পথে অনেক সফলতা আসছে। এরপর সংলাপের আহ্বান করেছে, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান সমস্যা একটা জতীয় ইস্যু। এ ইস্যুতে আমাদের সবাইকে এক জায়গায় বসে একটা সমাধান বের করা দরকার। এর পাশাপাশি সরকারী পর্যায়ে দেশের আলেম-ওলামাদেরও ডাকা হচ্ছে। ইমাম সাহেবদের ডাকা হচ্ছে, যারা সমাজে জনমত সৃষ্টিতে ভালো ভূমিকা রাখে এসব চতুর্মুখী পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে থেকে আমরাও চেষ্টা করছি। আমি মনে করি, এ পথে ক্রমে জনগণও সচেতন হয়ে যাবে এবং সংবাদপত্রে এখন এটাও আসছে। সাধারণ জনগণ এসব জঙ্গীকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এতে বোঝা যায়, জনগণের মধ্যে সচেতনতা আসছে। এখন আমরা সম্মিলিতভাবে যদি চেষ্টা করি তাহলে আমরা এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, সফলতা পাবো।

এই বোমা হামলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ইসলামী দলগুলো। দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা মাঠে-ময়দানে জনগণের মধ্যে কাজ করছি। আমাদের এ অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য জনগণের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে আমি মনে করি।

(ইনকিলাব: ১৯-১২-০৫)

"ইসলামের বিধানের বাইরে একটি প্রাণী হত্যা করার অধিকারও ইসলাম দেয়নি। ইসলামের নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। সন্ত্রাস করে, বোমাবাজি করে দ্বীন ইসলাম কায়েমও হবে না, শহীদও হওয়া যাবে না, বেহেস্ত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।"

-মাওলানা হাবিবুর রহমান
মুহতামিম, সিলেট কাজী বাজার মাদরাসা

www.pathagar.com

দেশ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এটা একটা বড় ষড়যন্ত্র

– মুফতী শহীদুল ইসলাম এমপি

ইসলামী ঐক্যজোটের নায়েবে আমীর মুফতী শহীদুল ইসলাম এমপি চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে বলেন, দেশ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এটি একটি বড় ষড়যন্ত্র। চারদলীয় ঐক্যজোট ভাঙার জন্য এই বোমা হামলা হতে পারে। আগামী নির্বাচনের আর মাত্র ১০-১১ মাস বাকি আছে। এখন জোট ভাঙতে পারলে একটি মহলের ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত হয়। বিগত সময়ে তারা এরকম কর্মকাণ্ড করেছে। বিগত সময়ের বোমা হামলা, সিরিজ বোমা হামলা- এসবই একই সূত্রে গাঁথা মনে হয়। এর পেছনে বড় একটি শক্তি আছে। তা না হলে এরকম বোমাবাজি দেশে ঘটতে পারে না। এখন পর্যন্ত সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার যা করার করছে কিন্তু কিছু ভুল ইনফরমেশনের কারণে বা ষড়যন্ত্রের কারণে মাদ্রাসার ইমাম, প্রিন্সিপাল, শিক্ষক, ছাত্রদের হয়রানি করা হচ্ছে।

বোমা হামলাকারী হিসেবে এখন পর্যন্ত যারা ধরা পড়ছে এদের অনেকেই স্কুল-কলেজের ছাত্র। অথচ ঢালাওভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের দোষারোপ করা হচ্ছে। দেশে কওমী মাদ্রাসার ইতিহাস শত শত বছরের। অন্যান্য মাদ্রাসাও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এ দীর্ঘ সময়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। অথচ আজ এর সব দায়ভার চাপানো হচ্ছে মাদ্রাসা ছাত্রদের ও কওমী মাদ্রাসার উপর। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বোমা হামলা করতে হবে, এমন কোন পারমিশন নেই। ইসলামে জিহাদ আছে, কিন্তু দেশে বোমা হামলা করে জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে যেভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এটা জিহাদ নয়। জিহাদ হয় শান্তির জন্য; সন্ত্রাস, ধ্বংসের বিরুদ্ধে। যে জিহাদের কথা, ইসলামী শাসনের কথা বলা হচ্ছে এটা একদম ঠিক নয়। এটাই মূলত ষড়যন্ত্র। কিছু বিপথগামী লোক এ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এসব করছে। ইসলামকে বদনাম করার জন্য কিছু লোক এ পথ বেছে নিয়েছে। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। সেখানে সন্ত্রাস অশান্তি ইসলামের পথ হতে পারে না। এরা ইসলামের চিহ্নিত শত্রু। এরা ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য অপকর্ম করছে। আবার বলছি, ইসলামে জিহাদ আছে। তবে আত্মঘাতীর কোন নজির নেই। তবে আমি বলবো, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ায় যেটা হয়েছিল, ট্যাংক ধ্বংস করার জন্য তারা অনেকে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিল। তারা শহীদ হয়েছিল। আত্মঘাতী হামলা কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই হতে পারে।

আমাদের এ পরিস্থিতিতে জনগণের সচেতন হতে হবে। কে কোথায়, কি করছে এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সরকারের একার পক্ষে এটা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। তবে সরকার সাধ্যাতীত চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। এসময় বিরোধী দলের উচিত সরকারের সাথে সংলাপে যোগ দেয়া। সরকারের উচিত জাতিকে রক্ষা করতে সবার সাথে আরও আলাপ-আলোচনা বৃদ্ধি করা। সংযোগ স্থাপন করা।

আলেম সমাজের দায়িত্ব জনগণকে সচেতন করা। ওয়াজ মাহফিল ও অন্যান্য ইসলামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকার অনেক স্থানে ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দিয়েছে। এ সময় জনসচেতনতা বাড়াতে বই-পুস্তক লিফলেট বিলি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

আলেম-ওলামাদের সাথে সরকারকে বসতে হবে। দেশের বড় বড় আলেম-ওলামা, পীর, মাশায়েখ প্রধানদের ডেকে আলোচনায় বসতে পারে। ইমামরা মসজিদের খুতবায় বোমা হামলা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারেন।

ইনকিলাব : ১৫-১২-০৫

"জিহাদ ও জঙ্গিবাদ কখনো এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর জুলুম করে, তারা কখনো ইসলামে বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্য, আজ আমাদেরকেও তাদের সঙ্গে শামিল করে ফেলা হয়েছে।"

–প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলাম কখনো আত্মহত্যা সমর্থন করে না

– আবদুল কাদের মোল্লা

একটি দল, যার নাম জেএমবি। তারা ঘোষণা দিয়ে লিফলেট বিলি করে সারা দেশের বোমা হামলার দায়-দায়িত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে অথচ ১৪ দলীয় ঐক্যজোট ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো সরাসরি তাদের শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জামায়াতে ইসলামীকে চারদলীয় জোট থেকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে বলছে, 'যত-দিন জামায়াতে ইসলামীকে জোট থেকে বহিষ্কার না করা হবে ততদিন বোমাবাজি বন্ধ হবে না।' এই কথার মাধ্যমে চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রধান শরীক দল বিএনপিকে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, 'জামায়াতকে জোট থেকে বহিষ্কার না করলে এই বোমাবাজি চালানো হবে।' এর সরল অর্থ এটাই দাঁড়ায়-হয় জামায়াতকে বহিষ্কার কর, না হয় বোমা খাও।

আমি ফতোয়ার ভাষায় বলতে চাই না। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে, ইসলাম কখনো সন্ত্রাসী তৎপরতা, আইন আদালতের রায় ছাড়া কোন মানুষকে হত্যা করা অথবা আত্মহত্যার মত পথ বেছে নেয়া কখনো সমর্থন করে না। শুধু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদই (রাঃ) নন, আল্লাহ দুনিয়াতে যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের কেউ-ই সন্ত্রাসী তৎপরতা সমর্থন করেননি। নিজেরাও সন্ত্রাসী ছিলেন না। সারাদেশে ইসলামের নাম করে যে বোমা হামলা হচ্ছে তা সকলেরই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করা উচিত। আমাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। দল-মত-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া মোটেও উচিত নয়। এ সকল সন্ত্রাসীদের ভয় করার কোন কারণ নেই। কারণ যারা এ অন্যায় কাজ করছে তাদের চেয়ে যারা এ ধরনের দেশদ্রোহী কাজ করে না তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। যারা এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না তাদের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। সুতরাং গণবিচ্ছিন্ন এই ছোট গ্রুপকে তাদের অপতৎপরতা থেকে বিরত করা অসম্ভব নয়।

আওয়ামী লীগ তথা বিরোধী দল যে দাবী করছে তা একটি অযৌক্তিক দাবী। তাদের দাবী প্রমাণ করে যে, একটা অন্ধ বিদ্বেষ তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বোমা হামলা বন্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, চারদলীয় ঐক্যজোট ভাঙাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। জোট ভাঙতে পারলে তারা স্বপ্নের ঘোরে ক্ষমতার মসনদে বসে আছে বলে দেখতে পায়। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কথা এখানে স্মরণ করার মত। তিনি বক্তৃতায় কখনো কখনো বলতেন- 'খায় দায় চান মিয়া মোটা হয় জব্বর'। বোমা মারে জেএমবি, জোট থেকে তাড়াতে হবে জামায়াতে ইসলামীকে।

এখানে শুধু জামায়াতে ইসলামীই মূল টার্গেট নয়, ইসলামের ওপর যে তাদের অন্ধ বিদ্বেষ কতখানি গভীর তা ১৪ দলের ঘোষণাপত্রেই বোঝা যায়। কারণ ঘোষণাপত্রের একটি ধারায় উল্লেখ আছে যে, তারা ক্ষমতায় গেলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করবে।

(ইনকিলাবঃ ১২-১২-০৫)

www.pathagar.com

বোমা হামলা দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের ফসল

–ড. রুহুল আমীন

দেশে চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. রুহুল আমীন বলেন, দেশে অব্যাহত বোমা হামলা ইসলাম বিদ্বেষী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও বিদেশী শক্তির বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঘটানো দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিগত কয়েক বছর যাবত একটি গোষ্ঠী বর্তমান জোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। উন্নয়ন, অগ্রাযাত্রায় বাধা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো ক্রমেই সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে না পেরে দেশী-বিদেশী কুচক্রী মহলের যোগসাজশে ইসলাম ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ঐ গোষ্ঠীটি অবশেষে বোমা হামলাকেই শেষ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিগত নির্বাচনে পরাজিত শক্তিটি এ বোমা হামলার ইন্ধনদাতা। তারা দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শক্তিটি বেশ কিছুদিন যাবত জঙ্গীবাদ নির্মূলের ধুয়া তুলে এ দেশে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাচ্ছে। তারা জঙ্গীবাদ নির্মূলে বহিঃশক্তির সহায়তা চাচ্ছে। যেহেতু মুসলিম দেশগুলোর আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত কোনো সেনাবাহিনী নেই, যা দ্বারা অন্য কোন দেশকে সহায়তা করতে পারে। তাই অন্য যে কোন সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটানো মানেই হবে জাতিসংঘ, ভারত, বৃটেন, ইসরাইল বা অন্য কোন অমুসলিম দেশের সশস্ত্র সেনাবাহিনী আসার সুযোগ করে দেয়া। যারা জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাস দমনের নামে ধর্মপ্রাণ মানুষদের হত্যা, নির্যাতন করবে এবং ইসলামী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। ফলে ইসলামপন্থীদের সাথে সেক্যুলার ধর্মনিরপেক্ষবাদী, নাস্তিকদের মারামারি হানাহানি হবে এবং দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। দেশটি পার্শ্ববর্তী দেশসহ অমুসলিম দেশগুলোর বাজারে পরিণত হবে। বিদেশী পণ্য রফতানী বন্ধ হবে এবং চিরদিনের জন্য পঙ্গু ও দারিদ্র্য পীড়িত দেশে পরিণত হবে, যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সব সময়ই কামনা করে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না এসব বোমাবাজি দেশী-বিদেশী কুচক্রী মহলের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের ফসল।

এদেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশকে অকার্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যা দিয়ে আসছে। তারা বলে আসছে এখানে কোন সরকার নেই, নেই কোন সুশাসন, নেই বিচার ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বিরোধী দলের নেত্রী বাংলাদেশে জাতিসংঘ বাহিনীকে এদেশে মোতায়েনের আহ্বান জানিয়েছেন। যদি বোমাবাজি অব্যাহত থাকে এবং বিদেশী শক্তি এ দেশে আসে তাহলে তিনি হয়ত বলবেন আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট। তার বড় প্রমাণই হলো এদেশে বিদেশী বাহিনী অনুপ্রবেশের আহ্বান জানানো।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, শান্তির বার্তা নিয়েই তার আগমন। সন্ত্রাস, বোমা হামলা, ফেতনা-ফাসাদ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম এসেছে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে। যেখানে হত্যা, সন্ত্রাস, মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অথচ আমাদের প্রিয় নবী এমনকি সাহাবায়ে কেরাম, খোলাপায়ে রাশেদীন ও তার পরবর্তী যুগে বোমা মেরে, নিরীহ জনগণকে হত্যা, জানমাল ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলাম

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এমন নজির নেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের গলায় ফাঁস দিবে তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করা হবে এবং আর যে ব্যক্তি ছোরা বা বল্লম দিয়ে নিজেকে বিদ্ধ করবে সে জাহান্নামে নিজেকে আহত করবে। সুতরাং এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হয় বোমা হামলা, হত্যা, সন্ত্রাস, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও জানমাল ধ্বংস করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিধান নেই। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বোমাবাজি করছে তারা বিপথগামী। দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলকে সরকারের শ্যাডো গভর্নমেন্ট হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে জাতীয় সংকটে তারা দায়মুক্ত নয়। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে, গঠনমূলক সমালোচনা, আন্তরিক পরামর্শ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করা বিরোধী দলের দায়িত্ব। এছাড়া অন্যান্য দল যারা জনগণের কল্যাণে কাজ করে তাদেরও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা দরকার। অপরদিকে সাধারণ মানুষের উচিত সরকারকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা। যাতে সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

দেশে আড়াই লাখ মসজিদে প্রতিদিন মুসল্লীরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং জুমআর নামাজে একত্রিত হয়। ইমাম সাহেবরা যদি ইসলামের মর্মার্থ বুঝানোর চেষ্টা করান এবং বোমা হামলা, সন্ত্রাস, মানুষ হত্যা ইসলাম সমর্থন করে না এসব বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এতে করে গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে। লোকজন এ কাজ থেকে বিরত থাকবে। নতুন করে এ কাজে কেউ জড়িত হবে না। বোমাবাজদের রুখতে আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

(ইনকিলাব : ২১-১২-০৫)

"এদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামে সন্ত্রাসবাদে কোন স্থান নেই।"

-মুফতী ইজহারুল ইসলাম

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বোমাবাজদের ইসলামী জঙ্গী বলা হচ্ছে

– মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী

দেশে বিরাজমান বোমা হামলা সম্পর্কে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী বলেন, ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য একটি মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বোমাবাজদের ইসলামী জঙ্গী বলে অপপ্রচার করে যাচ্ছে যা নিতান্তই দুঃখজনক। অথচ এদেশের সর্বস্তরের হাক্কানী পীর, ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী সংগঠন কেউই এ ধরনের মানবতা বিরোধী অপকর্মকে ইসলামসম্মত বলেনি এবং সকলেই এ ধরনের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করছে এবং সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমাদের সকলকে একটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে যে, পবিত্র ইসলামের নাম নিয়ে কেউ কিছু করলেই তা ইসলাম হয়ে যায় না। ইসলামের সুমহান ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াসে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী তাগুতি শক্তি সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ব্যানারে অনেক কাজই করে যাচ্ছে। আমাদের দেশও যে তাদের পরিকল্পনার বাইরে নয় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বস্তুত ইসলামে জিহাদ ফরজ হয়েছে সন্ত্রাসবাদ তথা বোমা মেরেই ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য নয় বরং সন্ত্রাস দমন, জালেমের কবল থেকে জনগণকে উদ্ধার, বহিঃশত্রুর থেকে স্বদেশ রক্ষা এবং মজলুম, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, জিহাদকে কিছু স্বার্থবাদী মহল নিজেদের স্বার্থে এর অপব্যাখ্যা করে চলছে। আর যাদের এই নিন্দনীয় বোমাবাজির কাজে সম্পৃক্ত করানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং পরিণতি ভেবে তারা এ কাজে শরীক হয়েছে বলে মনে হয় না। বিবেকের ওপর তাদের আবেগই প্রাধান্য পেয়েছে।

তাছাড়া আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং চলমান অসুস্থ রাজনীতিও এজন্য কম দায়ী নয়। এ দেশের নোংরা রাজনীতি তরুণ ও যুবসমাজকে চরম হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কয়েক কোটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক সামনে কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। শীর্ষ দুর্নীতিবাজরাই দেশের হর্তাকর্তা, যাদের টাকা আছে তাদেরই শুধু বিচার পাওয়ার সুযোগ আছে। অবৈধ অর্থ ও অস্ত্রের দাপটে সমাজের কোথাও ভাল ও যোগ্য মানুষের কোন অবস্থান নেই, দেশের সম্পদের বৃহদাংশই মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত। ক্ষমতার মসনদে যারাই আরোহণ করে তারাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। দেশের সকল শ্রেণীর সকল পেশার লোকজন যে এদের সমর্থন করবে তা নয়। কেউ কেউ এ অবস্থার পরিবর্তন চাইবে এটাই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন প্রত্যাশ্যার সুযোগকেই কোন অপশক্তি যদি হীনস্বার্থে কাজে লাগাতে চায় তাহলে সাম্প্রতিক বোমাবাজির মতো ঘটনা এদেশে বারবার ঘটাটাই স্বাভাবিক। অতএব শুধু বোমাবাজদের দমন করাকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক নয় অর্থাৎ জঙ্গী সন্ত্রাসীরা কোন অপশক্তির এজেন্ট?

তাদের মোটিভই বা কি? কোথায় তাদের উৎস? কারা এদের দ্বারা লাভবান হচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা দরকার। প্রতিটি ঘটনা পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণ করে এর যথাযথ প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হবে। যুব সমাজকে হতাশা থেকে মুক্তি দিতে হবে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বজন-

www.pathagar.com

প্রীতি, বে-ইনসাফ বন্ধ করতে হবে। আর এজন্য দরকার জাতীয় ঐক্য। বোমা সন্ত্রাস বন্ধ করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা লাগবে। দেশ, জাতি ও ইসলামের স্বার্থে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। সরকার ও বিরোধী দল তথা সকল নেতৃবৃন্দকে এক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। তাহলে জনগণও সহযোগিতা করবে। আর সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মঘাতী বোমাবাজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে অবশ্যই সন্ত্রাস বন্ধ হবে। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। তা হলো, সবাই শুধু বলছে জেএমবি যা করছে তা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি নয়। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি কোনটি তাও আজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এবং সেই সাথে যে সকল ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের নামে অপপ্রচার করে খোদ ইসলাম ধর্মকে বিষোদগার করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে হবে। পাশাপাশি যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বোমাবাজদের ইসলামী জঙ্গী বলে প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল ইসলামী দল এবং নেতৃবৃন্দকে ইস্পাতকঠিন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সাক্ষাৎকার : বেলায়েত হোসাইন আল ফিরোজ

(ইনকিলাব : ১২-০৩-২০০৬)

বোমা দিয়ে নয় চরিত্র দিয়ে ইসলাম কায়েম সম্ভব। ইসলাম কখনো বোমা সন্ত্রাস সমর্থন করে না। বোমা মেরে ইসলামের দাওয়াত দেয়াও সম্ভব নয়। বরং এটা নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ চারিত্রিক মাধুর্য ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

–মাওলানা ইসহাক

আমীর, খেলাফত মজলিস

www.pathagar.com

আত্মঘাতী বোমা হামলা ও আত্মহত্যা দুটোই হারাম

– মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী

বারিধারা মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী বিগত বোমা হমলার ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আত্মঘীত বোমা হামলা ও আত্মহত্যা দুটোই হারাম এবং কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর হিফাযত ঈমানী দায়িত্ব। নৈতিকতা তথা মানবতাবহির্ভূত কোন কর্মই শরীয়ত সমর্থন করে না, বরঞ্চ হারাম। জেহালত তথা মূর্খতার কারণে কিছু বিপথগামী যুবকের দ্বারা জিহাদের নাম ভাঙিয়ে শাহাদত প্রাপ্তির আশায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এমন হারাম কাজ করাচ্ছে, যা কোন মতেই শরীয়তসম্মত হতে পারে না। জিহাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলা কখনও এক হতে পারে না। জিহাদ পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত একটি ইবাদত বা সওয়াবের কাজ এবং জিহাদ করে মৃত্যুবরণকারীর জন্য বেহেশত অবধারিত ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা, বোমাবাজি তথা শরীয়ত পরিপন্থীভাবে যে কোন হামলা বা আত্মঘাতী বোমা হামলা হারাম।

এক কথায় জিহাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলা কখনও এক হতে পারে না। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। জিহাদ ও সন্ত্রাস বিপরীতমুখী শব্দ অর্থাৎ জিহাদ ও সন্ত্রাস কখনও এক হতে পারে না, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলাম, দেশ, জাতি ও মানবতার চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুপরিকল্পিতভাবে এদেশীয় কিছু এজেন্টের মাধ্যমে বিপথগামী যুবকদের অর্থের লোভে এমন অপকর্মের সাথে জড়াতে সমর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্ট এদেশীয় দালাল চক্র বিপথগামী যুবকদের দাড়ি, টুপি আর ইসলামী লেবাস পরিয়ে মাঠে নামিয়েছে, যাতে করে এদেশের সাধারণ গণমানুষের শ্রদ্ধার পাত্র সম্মানিত উলামায়ে কেরামদের হেয় করা যায়। অবাক বিস্মিত হওয়ার ব্যাপার হলো আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী যুবকদের কেউই কওমী মাদরাসার ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও এমন ইসলাম বহির্ভূত কর্মকে উলামায়ে কেরামের ঘাড়ে চড়ানোর অপচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। অথচ এ পর্যন্ত যারাই গ্রেফতার হয়েছে কেউই কওমী মাদরাসার ফারেগতো নয়ই আলেমও নয়। তদুপরি মাদরাসা, মসজিদের দায়িত্বে নিয়োজিত নিরীহ নির্দোষ উলামায়ে কেরামদের দায়ী করার জন্য প্রেস মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও ইসলামবিদ্বেষী মহল কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়াই তথ্য সন্ত্রাস ছড়িয়েছে, যাতে প্রকৃত দোষী ব্যক্তি আড়ালে-আবডালে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকার সুযোগ পায়। এই অপশক্তির অপকর্ম থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তেমন ভাল মনে হচ্ছে না। মহাজোট গঠন করে দেশবিরোধী অপশক্তির অপকর্ম ইস্পাত কঠিন সংগ্রামী চেতনার মাধ্যমে প্রতিহত করতে হব। সচেতন সকলের সাথে আমরা অবশ্যই আশাবাদী যে, সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই সকল ষড়যন্ত্র ও জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হবে। তবে সাধারণ মানুষ এও চায় যে, জঙ্গীবাদের সঙ্গে দেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে জড়িত করার অপচেষ্টা বন্ধ করা হোক। মাদরাসা শিক্ষা কিংবা ইসলামের সঙ্গে যে জঙ্গীবাদের কোনই সম্পর্ক নেই তা

www.pathagar.com

ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে যতগুলো জঙ্গী আবিস্কৃত হয়েছে তার সবই বস্তিতে কিংবা ফ্ল্যাট বাড়ীতে। এ পর্যন্ত দেশের কোন মাদরাসায়ই কোন প্রকার জঙ্গী ঘাঁটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই মাদরাসা এবং ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার বন্ধ করা হোক, এটাই এখন গণমানুষের প্রত্যাশা। এ পর্যন্ত ধরা পড়েছে এমন জেএমবি নেতারা যে কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক কেউ নয়, তাও সরকার কর্তৃক সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া উচিত। পত্র-পত্রিকা তথা মিডিয়ার মাধ্যমে যাদের দেখানো হচ্ছে এরা সকলেই আহলে হাদীস বা গায়বে মুকাল্লাদের অনুসারী। এরা কওমী মাদরাসা ও হানাফী আকীদা বিরোধী। তাছাড়া কওমী মাদরাসাগুলো হানাফী আকীদায় বিশ্বাসী বলে আহলে হাদীসে জামায়াতভুক্ত উলামায়ে কেরাম বা অনুসারীরা কওমী মাদরাসার ও প্রতিপক্ষ বা বিরোধী। তদুপরি ধৃত জেএমবি সদস্যরা হয় বিশ্ববিদ্যালয় না হয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। তাই অনর্থক বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা না করে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদেরই শাস্তি দেয়া উচিত।

স্মরণ রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকরা অশুভ নীলনকশার মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত করে সম্ভাবনাময় খনিজ সম্পদ আত্মসাতের পাঁয়তারা করছে। তারা ঈমান-আকিদায় বিশ্বাসী আপোষহীন সম্মানিত উলামায়ে কেরামদের ইমেজ ধ্বংস করে এদেশকে ইসলামিক তহযিব তমদ্দুনমুক্ত করে অপসংস্কৃতির উন্মাদনায় ভরে দিতে চায়। সুতরাং দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, যারাই আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস, রাহাজানি, জুলুম, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যারা ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, হারজেগোভিনা, কশ্মীরে নিরীহ মা-বোনদের ওপর বোমাবাজি করছে, হত্যা করছে নারী ও শিশুদের। মানবাধিকারের মিথ্যা দাবীদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস কায়েম করে দেশ দখল করে ইসলামের উত্থানকে ঠেকাতে চায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক আত্মঘাতী বোমা হামলা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এর প্রতিচ্ছবি মাত্র।

(ইনকিলাব : ১৫-২-০৬)

"সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইসলামের কাজ হতে পারে না।"

পীর সাহেব ছারছীনা

www.pathagar.com

ইসলামের নামে আত্মঘাতী বোমা হামলা আত্মহত্যার শামিল

– আবদুল লতিফ নেজামী

দেশে চলমান আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে ইসলামী ঐক্যজোট ও নেজামে ইসলামী পার্টির মহাসচিব মাওলানা মোঃ আবদুল লতিফ নেজামী বলেন, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলাম কায়েম নয় বরং ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এভাবে ইসলামের নামে আত্মঘাতী বোমা হামলা আত্মহত্যার শামিল। ইসলামে দীক্ষিত লোকজন কখনও এরূপ কার্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। ইসলাম বিরোধী শক্তি সুপরিকল্পিতভাবে বোমা সন্ত্রাস ঘটিয়ে এর দায়দায়িত্ব আলেম সমাজ ও মাদরাসার ওপর চাপানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের অস্তিত্ব নস্যাতের অপকৌশল ও বিদেশে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিনষ্ট এবং দেশে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা, বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিতকরণ, বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক, অকার্যকর ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে অশুভ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যেই যে বোমা হামলার মত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি বিশেষ মহল বোমা হামলার জন্য ইসলামী রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ব্যক্তিত্ব এবং কওমী মাদরাসাকে দায়ী করে আলেম সমাজ ও কওমী মাদরাসার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত এবং এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ হিসেবে নিউ ইয়র্ক টাইমসসহ একশ্রেণীর দেশী-বিদেশী মিডিয়া ও সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলাম বিরোধিতায় ক্রিয়াশীল বৃহৎ শক্তির তল্পীবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামী দল, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের এবং কওমী মাদরাসার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ নেই। কওমী মাদরাসাই ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের শক্তির উৎস বিধায় এ ভিত্তিকে চুরমার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষায় দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পায় বিধায় মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ইসলামের সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে এর ধারক-বাহক উলামায়ে কেরামগণকে সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করার অর্থ হচ্ছে তাদের অপ্রতিহত প্রভাব থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি জনগণকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলা।

(ইনকিলাব : ১৩-২-০৬)

www.pathagar.com

দেশজুড়ে বোমা হামলা আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদী রাজনীতির অংশ

– মহিউদ্দীন আহমদ

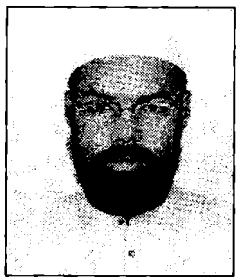

হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমদ চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে বলেন, নিরীহ মানুষের ওপর বোমা হামলা করে ইসলাম কায়েম করা যায় না। বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা ইসলাম তথা কোরআন-হাদীস পরিপন্থী। ইসলাম ধর্ম এ ধরনের জঘন্য অপরাধকে স্বীকৃতি দেয় না। এভাবে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হবেও না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে জগতবাসীর কাছে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আমাদের অবশ্যই তা উপলব্ধি করতে হবে এবং তার যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করে ইসলামের জন্য কাজ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের নামে বোমা হামলা করলে তা ইসলাম এবং মুসলমানদের অতীতের অর্জিত গৌরবকে ম্লান করে দেবে। আমার মনে হয়, এই বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণা এ দেশের বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোর মধ্যে রয়েছে। এবং যারাই এদেশে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাইবে তারা কখনো এ ধরনের বোমা হামলা করলে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। মানুষ ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পাবে। যার ফলে ইসলামেরই ব্যাপক ক্ষতি হবে। যারা সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাইবে তারা অবশ্যই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে কাজ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ হত্যা করছে তারা কারা বা তাদের স্বার্থ কি? আমার বিশ্বাস, এই বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকতে পারে এমন একটি গোষ্ঠী যারা চায় না যে, এদেশ স্বাধীন সার্বভৌম, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। তারা সেজন্যই এদেশকে একের পর এক বোমা হামলা করে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে। আমার ধারণা, এদেশে যেভাবে ইসলামী জাগরণ শুরু হয়েছে তা অনেকেরই সহ্য হচ্ছে না। এজন্য তারা কিছু লোক দিয়ে ইসলামের নাম করে নিরীহ মানুষ হত্যা করছে এবং ইসলামের প্রকৃত মহত্ত্ব থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনকে জনবিচ্ছিন্ন করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র হচ্ছে। জনগণকে ইসলামী দলসমূহ সম্পর্কে চরম বিরূপ ধারণা দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার মূল উৎপাটনও এই বোমা হামলার অন্যতম টার্গেট। এ ধরনের হামলা করে দেশবাসীর কাছে আলেম-ওলামাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আলেম-ওলামাদের জনগণের জান-মালে নিরাপত্তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক কোন ষড়যন্ত্রেরই অংশ। দেশের চলমান এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আমাদের দেশের আলেম-ওলামা, সরকার-বিরোধী দল সকলের এই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে সকলের আজ দেশপ্রেমিক হওয়া উচিত। আজ দেশজুড়ে যে বোমা হামলা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদী রাজনীতির অংশ। ইসলামী জাগরণ ঠেকানোই এর মূল উদ্দেশ্য। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরাও যারা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং দেশের সম্পদ লুট করতে চায় তারা আজ শকুনের মতো এই দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁদের দালালরা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার মাসক ক্ষমতার মসনদে বসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ

www.pathagar.com

জন্য আজ একের পর এক বোমা হামলা করে মানুষের দৃষ্টি তাদের নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও দুর্নীতি আজ দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বোমাতঙ্কের দুঃখকষ্ট আর দুর্গতি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। জাতি যখন আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি তখন আমাদের দেশের সরকার ও বিরোধী দল পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখনো দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা একে অপরকে দোষারোপের পুরোনো খেলায় মেতে রয়েছে অথচ এ মুহূর্তে তাদের হওয়া উচিত গোলটেবিল বৈঠক, জাতীয় সংলাপ এবং জাতীয় এই সংকট উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা। তা না করায় সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে অপশক্তি। এদেশতো প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তারা চাচ্ছে এদেশকে অস্থিতিশীল করে তাদের স্বার্থ হাসিল করা। বোমা হামলা, জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে তারা চাচ্ছে এদেশকে অকার্যকর এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে তাদের এজেন্টদের ক্ষমতায় রাখতে। আমি আন্তরিকভাবে বলতে পারি, কোনো ইসলামী দল এ কাজ করবে না। কারণ, এ ধরনের কাজে ইসলামেরই ক্ষতি হবে বেশী। মানুষের কাছে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। আর এ কারণেই ষড়যন্ত্রকারীরা এ কাজটি বেছে নিয়েছে, যাতে এদেশে ইসলামী জাগরণ না হতে পারে। তবে একটি গোষ্ঠী এখানে থাকতে পারে, যে গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের স্বার্থে সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো এমন কিছু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা পরিচালনা করেছে যাতে তারা ভুল ইসলামী ধ্যান-ধারণা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং তাদের ইসলামের নামে বিকৃত চিন্তার শিক্ষা দিচ্ছে। তারাই হয়তো সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এই বোমা হালা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের পাতা সেই ফাঁদ দিয়েই আজ ইসলাম, দেশ ও জাতীয় অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। এই মুহূর্তে এ দেশের সরকার ও বিরোধী দলকে অবশ্যই তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং বোমা হামলার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। এটাই এখন সময়ের দাবি। আশা রাখি, দলমত নির্বিশেষে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কাজ করবেন এবং জাতির কাছে নিজেদের খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচয় দেবেন। এটাই নেতৃবৃন্দের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা। তাছাড়া বোমা হামলা প্রতিরোধ প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব, এটা মনে করে সকলকে তা প্রতিহত করার জন্য সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের তাই করা উচিত।

(ইনকিলাব : ১২-৫-০৬)

আল্লাহ ও ইসলামের নামে যেকোন নাশকতা ও মানুষ হত্যাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ থেকে সকলকে হুঁশিয়ার ও ফারাক থাকতে হবে। যারা এসব করছে, তারা ইসলামের শত্রু। ইসলাম সাম্যের ধর্ম, পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম, এখানে কোন হানাহানির স্থান নেই।

–মরহুম মাওলানা ফজলুল করীম
পীর ছাহেব চরমোনাই।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ছাড়া বোমাবাজি সম্ভব নয়

-এটিএম হেমায়েত উদ্দীন

দেশব্যাপী আত্মঘাতী বোমাবাজদের বোমা হামলার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ঢাকা মহানগর সভাপতি ও পশ্চিম রাজাবাজার জামে মসজিদের খতীব অধ্যাপক হাফেজ মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দীন বলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ছাড়া দেশব্যাপী একই সময়ে বোমাবাজি সম্ভব নয়। আত্মঘাতী বোমাবাজদের বোমা হামলার কারণে জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা, জনমনে ভীতি ও আতংক আজ দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। মোটকথা বোমা হামলার কারণে দেশময় এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সরকার ও দেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম তাৎক্ষণিকভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। হামলাও বন্ধ হয়েছে, জনমনেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ইসলামের চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্ব থেকে মুসলমান উৎখাতের যে হীন ষড়যন্ত্র আজ বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করছে এটা যে তারই একটি মহড়া নয়, তা হলফ করে বলা যাবে না। কারণ এমন আত্মঘাতী বোমা হামলার সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাইমারি টেস্টও ধরে নেয়া যেতে পারে। কোনো প্রকার অন্যায় অভিযোগ ছাড়া কোনো স্বাধীন দেশে হামলা করার অভ্যাস তাদের রয়েছে। আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন চলছে যার বাস্তব রূপায়ন করছে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে মানবতা অথচ তাতে তাদের কিছুই যায়-আসে না। আজ নিরীহ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর এই হায়েনার দলেরা বুলডোজার চড়িয়ে হত্যা করছে। বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর, দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। মিথ্যা অজুহাতে তেলসমৃদ্ধ দেশ ইরাক দখল করে নিয়েছে। বিশ্বের একমাত্র শরীয়তসম্মত ইসলামী প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। এরাই আজাদ কাশ্মীরে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য হিন্দু ভারতকে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করে চলছে। অবস্থা যেন এমনই যে, মুসলমানদের ওপর হামলা হলে মানবতা লংঘিত হয় না। হায়রে মানবতা, হায়রে সভ্যতা, বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদী মোড়লদের এমন আচরণাদি আজ সচেতন বিবেকবানদের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামবিদ্বেষী মহল, অপরিপক্ক প্রেস মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া ও তথ্য সন্ত্রাসীদের বরাবরের মতো এমন একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও উলামায়ে কেরামদের ওপর চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর পথহারা বিভ্রান্ত জেএমবির নেতা বা সদস্যরাও এমন আত্মঘাতী বোমাবাজিকে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। অথচ জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শব্দ এবং কাজ। জিহাদ কোরআর-সুন্নাহ সমর্থিত একটি ইবাদত আর সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য। তাই বোমাবাজির মতো ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপকে ইসলামী বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টাকেও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।

তবে সুদ, ঘুষ, রাহাজানি, শ্রেণীবৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন মানবতাহীন কার্যক্রম

www.pathagar.com

সমাজে অস্থিরতা বেকারত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়া আজ সম্পূর্ণ ভূলুণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিও কোন মতে মেনে নেয়া যায় না। সরকার বাহাদুরের উচিত এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যেই মানবতার মুক্তি, তাই শোষণ লণ্ঠন বন্ধ করতে হবে। দেশে শান্তি -শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। নিজের ব্যর্থতার দায়ভার কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপসংস্কৃতি থেকে সকলকে মুক্ত থাকতে হবে।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, যে বা যারা এই আত্মঘাতী বোমা হামলা করে দেশব্যাপী ভীতিকর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো, তাদের সাথে দেশের সম্মানিত উলামায়ে কেরামদের কোনই যোগাযোগ ছিল না। এখনও নেই। এই কাঁচা মস্তিস্কের লোকগুলো কিছু আনপট অজ্ঞ বিপথগামী যুবকদের মাধ্যমে এমন আত্মঘাতী ঘটনা ঘটিয়ে তা আবার জিহাদের নামে চালিয়ে দেয়ারও ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলাম ও মানবতার মুশমন। কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত এরাই নাটের গুরু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি। কারণ ইসলামের চিরশত্রু ওই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বব্যাপী ইসলামী শক্তির উত্থানে ভীত সন্ত্রস্ত। যে করেই হোক নবউদ্যমে অগ্রসরমান এই ইসলামী শক্তিকে পদানত করার হীন স্বার্থেই এভাবে ইসলাম তথামুসলিম দেশগুলোতে অযাচিতভাবে হামলা চালিয়েছে। শুধু কি তাই, তারা চায় ইসলামী শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে। যা আদৌ সম্ভব নয়। ইসলামের আগমন মুহূর্তে মুনাফিক ও কাফেররা যা করেছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোড়লরা আজ মানবতাবাদের দোহাই দিয়ে ঠিক একই পদ্ধতিতে এগুচ্ছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে। সত্য সমান মিথ্যা সপন নিশ্চয়ই অপশক্তি ধ্বংসশীল।

এ পরিস্থিতিতে এখন দলমত নির্বিশেষে ইসলাম, দেশ, জাতি ও মানবতা রক্ষার্থে সকলকে জনগণের সাথে এক হয়ে সকল অপশক্তিকে প্রতিহত করা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় স্বাধীনতা সাভৌমত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। সীসাঢালা ঐক্যই এখন সময়ের চাহিদা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুমতি দিন। আমীন।

ইনকিলাব : ১৫-০৩-০৬

যারা বাংলাদেশে জিহাদের নামে বোমা হামলা করে মানুষ মারছে তারা মুসলমান নয়, শয়তানের ভাই। তাই বোমাবাজদের নির্মূল করতে হলে দলমত নির্বিশেষ সবাই একত্র হয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

–শাহ্ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী
পীর সাহেব, ফুরফুরা শরীফ

www.pathagar.com

বোমা হামলা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র

– ক্বারী উবায়দুল্লাহ

দেশে চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে জাতীয় ইমাম সমাজ বাংলাদেশ-এর সম্মানিত সভাপতি জাতীয় সংসদ ও রেডিও-টিবির প্রধান ভাষ্যকার ক্বারী আলহাজ হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলেন, চলমান বোমা হামলা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র। যুগে যুগে ইসলাম বিদ্বেষী মহল এভাবে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, এখনও আছে। কোন ঈমানদার মুসলমান এমনিভাবে আত্মঘাতী বোমা মেরে মানুষ হত্যা করতে পারে না।

আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। আমরা 'জাতীয় ইমাম সমাজ বাংলাদেশ'-এর পক্ষ হতে দেশের প্রায় চার লাখ মসজিদের ইমাম সাহেবরা বোমাবাজদের প্রতিহত করার জন্য মুসল্লীদের উদ্বুদ্ধ করার আহবান জানিয়েছি।

হুজুর আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী, তাকে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ হল কুফরী। আর এমন কাজকে কেউ হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর হালাল মনে না করে যদি এটাকে সংস্কারমূলক কাজ মনে করে, সেটা হবে। কুফরী।" তাই কোন মুসলমানের দ্বারা এমন কাজ করা অসম্ভব। কিছু মস্তিষ্ক বিকৃত যুবক এটারকে জিহাদ বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাতে চেয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এবং হবেও না।

স্মরণ রাখতে হবে কোরআন-সুন্নাহ তথা-ইসলাম কখনও এ কাজ সমর্থন করে না। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। তার উপর আল্লাহর গজব পড়বে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করলো, চিরকাল তাকে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।' সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী কোন মুমিন সে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, উকিল, বিচারক, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই হোক না কেন, তাকে হত্যা করা অবশ্যই কবিরা গুনাহ। তার শাস্তি নিশ্চিত জাহান্নাম। ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা জন্মলগ্ন থেকেই মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল ব্যবহার করে আসছে। সুতরাং এটাও তাদের একটি অংশবিশেষ। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিছু পথভ্রান্ত যুবককে টাকার লোভ-লালসা দেখিয়ে এ পথে আনা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আরো দুঃখজনক যে, কিছু অসৎ সাংবাদিক কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই শোনা মাত্র খবর পরিবেশন করেছে। সুতরাং সরকারকেও উপলব্ধি করতে হবে যে, এটা বিগত সরকারের পতনের মত একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কিনা। কারণ এদেশের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের সাথে এই জঙ্গী বোমাবাজদের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ঘৃণিতভাবে ওলামাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার দুঃসাহস করেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ জঙ্গীবাদ, বোমাবাজ তথা সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এগুলো ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ। সুতরাং ইসলাম এমন আত্মঘাতী বোমা হামলাকে কখনও সমর্থন করে না। প্রশ্রয়ও দেয় না। আত্মঘাতী বোমা হামলা তথা জঙ্গীবাদের অপতৎপরতা যেভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তাতে এটা এখন একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই এ মুহূর্তে এই জাতীয় সমস্যাকে

www.pathagar.com

জাতীয়ভাবেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। কারো একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অতএব সরকার, বিরোধী দল, সামাজিক সংগঠন ও ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে বোমাবাজদের প্রতিহত করা একান্ত প্রয়োজন।

আলেম সমাজ যুগে যুগে ইসলাম, দেশ, জাতি ও মানবতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করে আসছে। ভবিষ্যতেও পিছপা হবে না। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর খুব লক্ষ্য রাখতে হবে তল্লাশির নামে যেন কোন নিরীহ, নির্দোষ আলেমকে কষ্ট দেয়া না হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাতো সরকারকেই করতে হবে। সুতরাং নির্দোষ কাউকে যেন কষ্ট দেয়া না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দিন আমীন।

(ইনকিলাব : ২৮-১২-০৫)

কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। যারা এসব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ইসলামের দৃষ্টিতে তারা ঘৃণার পাত্র।

-মাওলানা এ কে এম নূরুল হক
খুলনা জেলা ইমাম পরিষদের সাংবিধানিক প্রধান

www.pathagar.com

বোমাবাজরা ইসলাম ও মানবতার শত্রু

– মাওলানা আবদুল জব্বার

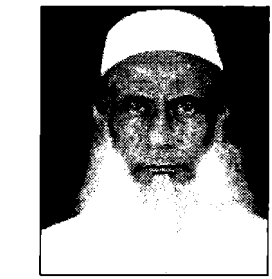

দেশে বিরাজমান আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে 'বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর মহাসচিব আলহাজ হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, ইসলাম, মানবতা, দেশ ও জাতি আজ এক মহাসংকটপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। দেশদ্রোহী, বিভ্রান্ত, অপরিণামদর্শী একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়নক হয়ে জিহাদের নাম দিয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলা, হত্যা ও সন্ত্রাস দ্বারা দেশব্যাপী ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। আত্মঘাতী বোমাবাজরা দেশের বিচারক, বুদ্ধিজীবী ও নিরীহ মানুষ হত্যা করে এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে সমগ্র জাতির জান ও মালের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও রাস্তা-ঘাট সর্বত্র যেন নিরাপত্তাহীনতার এক চরম বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গোটা দেশবাসী যখন আতঙ্কাবস্থায় দিন যাপন করছে, ঠিক সে সময়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের দোসর মসজিদের মিনার হতে উচ্চারিত আজান ধ্বনি ও ইসলামের সমুন্নত তাহযিব-তমদ্দুন ও কৃষ্টি কালচার, ইসলামী লেবাস, দাড়ি-টুপি যাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে ইসলামবিদ্বেষী ঐ মহলটি সকল সন্ত্রাসের দায়-দায়িত্ব ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান, গবেষণা ও অনুশীলনের কাজে নিবেদিত নিরীহ আলেম-উলামা এবং কওমী মাদ্রাসা, মসজিদে ও খানকাসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়ে দেশ থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আমাদের এই মাতৃভূমির প্রতি হিংস্র হায়েনার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী চক্র ও ইসলাম বিদ্বেষী দেশী-বিদেশী তথা আন্তর্জাতিক চক্র একযোগে আঘাত হানতে শুরু করেছে, বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে, ইসলামের ব্যাপক-বাহক আলেম সমাজের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও পবিত্র জিহাদের নামে ব্যাপক বোমা হামলা, হত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমগ্র জনমানসে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে এসব ঘৃণ্য অপরাধের দায়ভার মাদরাসা, দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও ওলামায়ে কেরামের উপর চাপিয়ে দেয়ার হীন চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে। এই বোমাবাজ তথা ইসলাম বিদ্বেষী মহলের উদ্দেশ্য আলেম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনতার মনে কওমী মাদ্রাসা ও আলেমদের প্রতি চরম ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করা এবং কওমী মাদ্রাসা ও তালিমে ইসলামের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলা। তাছাড়া অত্যন্ত বিস্ময় ও গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের নেতৃত্বে পরিচালিত খাঁটি ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে প্রকাশ্য ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে, তার বিপরীতে শান্তির ধর্ম ইসলামের নাম উচ্চারণকারী ও মহান জিহাদের লেবেল ব্যবহারকারী মূর্খ, বিপথগামী বোমাবাজরা ও দেশী-বিদেশী চক্রের জ্ঞানপাপী দালালরা আত্মগোপন করে থাকছে জনতার দৃষ্টি থেকে। তাদের বীরদর্প অবস্থান হত জনগণের সামনে। আত্মঘাতী বোমা হামলাই প্রমাণ করে তারা কুফরী শক্তির ইন্ধনেই এ কাজ করছে। তারা ইঙ্গ-

www.pathagar.com

মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়ানক বই নয়। আমরা তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানাই। আত্মঘাতী বোমাবাজরা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার চরম শত্রু। ইসলাম কখনও আত্মহননকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম হল শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম, যেখানে খুনীদের কোন স্থান নেই। তাই দেশব্যাপী যারা ইসলামের নামে বোমাবাজি করছে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু নয়-শত্রু। অতএব আত্মস্বীকৃত এই বোমাবাজদের প্রতিহত করতে দলমত নির্বিশেষে, জনগণকে সাথে নিয়ে অভিন্ন লক্ষ্যে অভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে সরকারকে সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের উচিত সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা।

আমরা দেশব্যাপী ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসার দায়িত্বশীল তথা- প্রিন্সিপাল, মসজিদের খতীব ও ইমাম সাহেবদের মসজিদওয়ারী মুসল্লীদের বোমাবাজদের ব্যাপারে সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছি। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম" (সূরা নিসা)। সুতরাং কোন আলেম কখনও আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথে জড়িত হতে পারে না। কারণ পবিত্র কোরআনের এ বাণীতো আলেমরাই মসজিদে ও ওয়াজ মাহফিলে প্রচার করে থাকেন। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে এই অবৈধ বোমাবাজির দায়ভার নির্দোষ ওলামায়ে-কেরামদের ওপর না চাপিয়ে দোষীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। আর সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাহলেই আল্লাহপাক এ বিপদ থেকে জাতিকে মুক্তি দিবেন। আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দিন। আমীন ছুম্মা আমীন।

(ইনকিলাব : ২৯-১২-০৫)

ইসলামের সন্ত্রাস ও বোমাবাজি করে মানুষ হত্যার স্বীকৃতি নেই। যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি এবং আত্মঘাতী বোমা হামলা করে এবং যারা করায় তারা ইসলামের শত্রু।

–মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী
মহাসচিব, জমিয়াতুল মোদাররেছীন

www.pathagar.com

জেএমবি দেশ ও ইসলামের শত্রু

– শেখ ফরিদ

গত ১৭ আগস্ট ২০০৬ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ 'সচেতন ইসলামী জনতা'র ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে। এই সমাবেশের মাধ্যমেই তারা প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে বলে অনেকের মত। সমাবেশের আগে পল্টন এলাকার একটি হোটেলে বসে যায়যায়দিনকে একটি সাক্ষাতকার দেন হরকাতুল জিহাদের সাবেক আমীর মাওলানা আবদুস সালাম। এ সময় সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শেখ ফরিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

যাযাদি : আপনারা ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করেন। দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করতে চান। ইসলাম কি জঙ্গি কার্যক্রমকে সমর্থন করে?

সালাম : হ্যাঁ, শুধু আমরা কেন যেকোনো মুসলমানই চায় দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক। সে হিসাবে আমরাও দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের কথা বলি। ব্যক্তি জীবনেও আমরা ইসলামের চর্চা করি। কিন্তু ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বোমাবাজি করা বা সন্ত্রাস করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়া হয়েছে। বেছে বেছে শুধু মুসলিম দেশগুলোতে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো অশুভ শক্তির কালো হাত লুকিয়ে আছে।

যাযাদি : জিহাদ আর জঙ্গিবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? জঙ্গিদের চিহ্নিত করার উপায় কি?

সালাম : জিহাদ ইসলামের একটি ফরজ বিধান। জঙ্গিবাদের সহজ অর্থ হলো সন্ত্রাস। ইসলামের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসকেই মিডিয়াগুলো জঙ্গিবাদ বলে উল্লেখ করে। জিহাদকে ঠেকানোর জন্যই মূলত জঙ্গিবাদকে আবিস্কার করা হয়েছে। জঙ্গিরা ইসলাম ও মানবতার দুশমন। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, নিরাপরাধ মানুষকে খুন করে কখনো ইসলাম কায়েম হবে না। এভাবে ইসলাম কায়েমের কোনো বৈধতা নেই। মনে রাখবেন, একদিন জঙ্গিদের বিরুদ্ধেই মুসলমানদের জিহাদ করতে হবে। .....

যাযাদি: জেএমবি'র সাথে আপনাদের সম্পর্ক খালাতো ভাইয়ের মতো শুনেছি। শায়খ রহমান ও বাংলাভাই সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন জানতে চাই?

সালাম: তারা দু'জনই জঙ্গি- সন্ত্রাসী। তারা গত বছর ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা করে বিশ্বের দরবাল বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে তা সবাই জানে। তারা নিজেরাও ঐ ঘটনার সাথে নিজেরা জড়িত বলে স্বীকার করেছে। তারা ইসলাম ও দেশের শত্রু। আমরা তাদের উপযুক্ত বিচার চাই।

(যায়যায়দিন : ২২-০৮-২০০৬)

www.pathagar.com

ইয়াহুদীবাদীরাই সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ করছে

–হাকীম শাহ মুফতী মো. আঃ রহীম হামেদী

বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জের বারইখালী 'নূরানী দায়েমী দরবার শরীফ-এর সম্মানিত পীর আলহাজ হযরত মাওলানা হাকীম শাহ মুফতী মোঃ আঃ রহীম হামেদী দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা সম্পর্কে বলেন, জিহাদ ও সন্ত্রাস দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ, যার মাঝে ঐক্য অসম্ভব। কারণ, মহান আল্লাহপাক জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, পক্ষান্তরে সন্ত্রাসকে হারাম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে সম্বোধন করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, "ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য।" সুতরাং ইসলাম কখনো ফিৎনা-ফাসাদ বা বিশৃংখলা সৃষ্টির পক্ষে নয়।

মহানবী (সাঃ) সুচরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তাঁর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে কাফের মুনাফিকরা হুজুর পাক (সাঃ)কে আল-আমীন উপাধি দিতে বাধ্য হয়েছেন। যার ৬৩ বছর জীবনের কোথাও সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় বা সহযোগিতার কোন ইতিহাস নেই। আজ যারা ইসলামের নামে বা জিহাদের নামে আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে আসলে এরাই ইসলামের চরম শত্রু। ইসলাম তথা মুসলমানের চিরশত্রু ইয়াহুদীবাদীরাই সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ করাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী! যুগে যুগে কাফের, বেঈমান ও মুনাফিকরা ইসলাম তথা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা চালিয়ে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির জালে জড়ানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে।

সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম ও মুসলমানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, মাদরাসা-মসজিদ বন্ধ ও আপোষহীন নেতৃত্বের অধিকারী নির্লোভী উলামায়ে কেরামের ইমেজ ধ্বংসের মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে। যা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সম্ভাবনাময়ী এদেশের খনিজ সম্পদ নামীয় এদেশের খনিজ সম্পদ দখল করাও হবে সহজতর। তাই ইসলাম, দেশ, জাতি ও মানবতার মহান স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকলকেই হতে হবে ঐক্যবদ্ধ। ইয়াহুদীবাদীদের এজেন্ট এদেশীয় দালাল চক্র অর্থ-সম্পদের লোভে যাতে দেশের সম্পদ বিকিয়ে দিতে না পারে সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় পরিস্থিতি হবে আরো খারাপ, আরো ভয়াবহ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যখনই কোন দেশে ইসলাম বিদ্বেষী মহল প্রভাব বিস্তার করতে চায় তখনই দেশের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব উলামায়ে কেরামদের ওপর ছলে-বলে-কৌশলে তাদের আয়ত্তে নেয়ার চেষ্টা করে। অপারগ হলে বিরোধিতার চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। ১৯৫৭ সালের ভারত দখলের খৃষ্টানীয় ইতিহাস তাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা আজ মাদরাসার ছাত্রদের দায়ী করছে এই বোমাবাজদের কথা বলে আমার প্রশ্ন আতাউর রহমান সানী ও আতাউর রহমান গংরা কোন মাদরাসার ছাত্র, শাইক আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইয়েরা কোন মাদরাসার ছাত্র? এগুলো সুপরিকল্পিতভাবে বানোয়াটভাবে ইসলামের নামে একটি অপপ্রচার মাত্র। উদ্দেশ্য ইসলাম, দেশ, জাতি তথা মানবতা ধ্বংস করা, সর্বোপরি মাদরাসা মসজিদ ধ্বংস করা ও ওলামায়ে কেরামদের ইমেজ নষ্ট করাই।

তাই দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন, মহান আল্লাহপাক ছোবহানাছ তায়ালা এরশাদ করছেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তোমাদেরই হাতের কামাই।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ মানুষের আমলের কারণে আজ দেশব্যাপী শয়তান নামক ইয়াহুদীরা সুযোগ পেয়েছে আমাদের ঈমানহারা করার। সুতরাং সকলে

(১) তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাহলে ক্ষমা করে দিবেন।

(২) ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করার চেষ্টা করি।

(৩) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি সকাল-বিকাল।

(৪) মিথ্যা কথা বলা, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত করি।

(৫) জুমআর নামাজে মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করি এবং সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন হিসেবে গড়ে তুলি। তাহলেই আল্লাহ পাক আমাদের ওপর রহমত নাযিল করবেন। অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর রহমত পেতে হলে পবিত্র কোরআন-হাদীসকে অনুসরণ করে মহানবীর পদাঙ্ক অনুকরণে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে বোমাবাজদের মত খোদায়ী গজব থেকে।

(ইনকিলাব : ৯-২-০৬)

"ইদানীং আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং টুপি-দাঁড়িওয়ালা লোকদের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যচ্ছে। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই দেশের সত্যিকার আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা ও টুপি-দাড়িওয়ালা লোকদের সাথে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজের কোন সম্পর্ক নেই। বরং কিছু লোক তাদের অপকর্ম পরিচালনার জন্য আলেম-ওলামাদের বেশভূষা ধারণ করেছেন। এরা আলেম নয়; জালিম। ইসলাম ও আলেম ওলামাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যই এরা এসব কাজ করে থাকতে পারে।"

–মুফতী আব্দুর রহমান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

www.pathagar.com

বোমাবাজরা ইসলাম ও মানবতার শত্রু

– শাহ মুহাম্মদ আহসানুজ্জামান

বোমা হামলাকারীরা ইসলাম, মুসলমান ও মানবতার শত্রু। ইসলামে বোমাবাজ, হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই। যারাই এ কাজটি করুক না কেন বা যাদের প্ররোচনায় এসব ঘৃণিত কাজ করা হচ্ছে তার অন্তরালে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামকে ধ্বংস ও একটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার জন্য বিশেষ অপশক্তি এসব কাজ করাচ্ছে। একজন সচেতন নাগরিকের পক্ষে এটি বুঝতে কষ্ট হয় না।

বোমাবাজি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কোন নবী রাসূল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসবাদ করেছে এমন প্রমাণ নেই। আখেরী নবী মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটনে হৃদ্যতা ও ভালবাসার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বজনীন ধর্ম। নবী করিম (সাঃ)-এর পরে যাদের দ্বারা এই ধর্ম সম্প্রসারিত হয়েছে ও ব্যাপকতা লাভ করেছে তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, ওলামা মাশায়েখ ও পীর বুযুর্গগণ, সবাই নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য ও প্রেমপ্রীতি দিয়ে মানুষের মন জয় করে ইসলামের অমোঘ বাণী তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে মুসলমান বানিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যেসব মুশরিক গ্রেফতার হয়েছিল, মুক্তি পাবার পরে তাদের অনেকেই আর নিজেদের শিবিরে ফিরে যাননি, বরং মুসলমান হয়ে সাচ্চা মুসলিম সিপাহসালার বনে গিয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষার পেছনে দয়াল নবী তাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র পরিচালনা করেননি। সবচেয়ে যে বড় অস্ত্রটি পরিচালনা করেছিলেন তার নাম প্রীতি ও ভালবাসার উপহার। সুতরাং আজ যারা বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করছে তারাতো মুসলমান নয়ই মানুষের কাতারেও পড়ে না। তারা পশুতুল্য।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক যা ঘটছে তা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদেরই অংশ। আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। বোমাবাজ ও কথিত জঙ্গীদের বিরুদ্ধে বৃহৎ ঐক্য গড়ে তুলতে হবে ও সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। আফসোস লাগে। আজ জাতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তারপরও আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা এক হতে পারছে না। আলেম ওলামারা দ্বিধাবিভক্ত। একে অপরকে দোষারোপ করছে ও সন্ত্রাসবাদের উদ্যোক্তা বলে অপবাদ দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনুল কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আসুন আমরা আল্লাহর বাণী মোতাবেক বৃহত্তর স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারী জঙ্গীদের প্রতিরোধকল্পে বাস্তব ইসলামী জিহাদ শুরু করি। একতাবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। মানবতা, ইসলাম ও স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের অস্তিত্বকে রক্ষা করি।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে- আজ সুফিবাদ বিলুপ্ত, ইসলামী কৃষ্টি কালচার পরাভূত, অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছে মুসলমানদের জীবন। মগজ ধোলাই করছে যুবকদের, যার ফসল বর্তমান সন্ত্রাসবাদ। এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় কোরআনিক জীবন গড়া। আল্লাহর বাতলিয়ে দেয়া সেই শিক্ষা গ্রহণ করা- "হে আল্লাহ, পরিচালিত কর সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, চালাও না সে পথে যে পথে তোমার গজব অবধারিত। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝদান করুক।

(ইনকিলাব : ২২-৯-০৬)

www.pathagar.com

বোমা হামলা জিহাদ হতে পারে না

–হযরত মাওলানা মোস্তফা আজাদ

চলমান বোমা হামলা সম্পর্কে ঢাকার মিরপুরস্থ জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোস্তফা আজাদ বলেন, বোমা হামলা, সন্ত্রাস, অরাজকতা, আত্মঘাতী হামলা ইসলামী শরীয়তসম্মত নয়, সম্পূর্ণরূপে হারাম। পবিত্র কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যারা এরূপ জঘন্য কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। যারা এ ধরনের ন্যক্কারজনক অপকর্ম করে তারা মানবতার শত্রু। ইসলামের শত্রু মুসলমানদের বদনাম করার জন্য কোন অশুভ শক্তির ইঙ্গিতে বোমাবাজি করা হচ্ছে বলে মনে করি।

ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম। মানবতার ধর্ম ইসলাম। এখানে কোন প্রকার অরাজকতার স্থান নেই। অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হারাম। অন্যায়ভাবে হত্যার জন্য পার্থিব শাস্তি হিসেবে রয়েছে কিসাসের বিধান। আর পরকালে রয়েছে এ জন্য কঠোর শাস্তি। পবিত্র কুরআনের সূরা আননাজমের ১৫১ আয়াতে বলা হয়েছে-"তোমরা কোন মানুষকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।"

কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, "সমাজের মাঝে ফেৎনা-ফাসাদ, অরাজকতা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও গুরুতর অপরাধ।" এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, 'মুসলমানদের গালি দেয়া ফাসেকী কাজ, আর হত্যা করা হল কুফরী। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তার শাস্তি হলো সে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহর গজব, অভিশাপ তার ওপর পতিত হবে।

সমাজ থেকে অরাজকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যেই ইসলামের আগমন। বোমা হামলা করে ইসলাম কায়েম করা যাবে না। বেহেশতেও যাওয়া যাবে না। বোমা হামলা জিহাদ হতে পারে না। একে জিহাদ বলে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। জিহাদের কিছু নিয়মতান্ত্রিকতা রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য জিহাদের বিধান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন জিহাদ নেই। যারা জিহাদের নামে বোমাবাজি করে তাদের জন্য ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার, বিরোধী দলসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ বোমা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। বোমাবাজদের দমনে সরকারের আন্তরিক হতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সরকারকে সহযোগিতার মনোভাব রাখতে হবে। জনগণকে হতে হবে সচেতন। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনে সরকারী দল, বিরোধী দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, উলামা-মাশায়েখদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। দেশকে নৈরাজ্য, সন্ত্রাসবাদের হিংস্র থাবা হতে মুক্ত করতে হলে সকলকে দলীয় রাজনৈতিকভাবে সংকীর্ণমনার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।

আলেম সমাজ হচ্ছে নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীদের আগমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবতার সেবার জন্য। তাই নায়েবে নবী হিসেবে প্রত্যেক আলেম নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এরূপ অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার করে তুলবেন। আলেম সমাজ দেশের যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় সাহসী ভূমিকা রাখেন বিধায় সমাজে তাদের একটি পৃথক ভাবমূর্তি রয়েছে। তাদের শ্রদ্ধার নজরে দেখা হয়।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে

বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহু তা'আলার জন্য এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে - "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার অধিকার নাই" (সূরা ইউসুফ-৪০)। "জেনে রাখ। তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা" (সূরা আ'রাফ-৫৪)। "আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি দৈহাবা (দল) সব সময় সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে" (সহীহ মুসলিম - ৪৮০৪/৫ ইঃ ফাঃ)।

জনগণের প্রতি আহ্বান।

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে এবং শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য যাতে থাকবে না কোন অংশীদার। আমাদের মাঝে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজে কর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন - "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর" (সূরা নহল-৩৬)।

তাগুত ঃ- মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে তার ইবাদত বা আনুগত্য করে এবং কোন ব্যাপারে তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তবে সেই অংশীদার ইলাহকে বলা হয় "তাগুত"। ক্ষমতাসীন তাগুত ঃ- আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক, অর্থাৎ যে শাসক আইনের বলে হারামকে হালাল করে। যেমনঃ- যিনা, সুদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয়, কিংবা হালালকে হারাম করে। যেমনঃ- জিহাদ-কিতালে বাধা দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত অথবা কাফের-মুশরেকদের বিধান অনুযায়ী শাসন করে সে হলো "ক্ষমতাসীন তাগুত"।

কোন মুসলিম ভূখণ্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান কার্যকর নেই। উপজেলা সদরের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচারকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মনুষ্য রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রণয়ন করেছে কিছু জ্ঞানপাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কিন্তু সে মানুষ আজ নিজেরাই সংবিধান রচনা করে আল্লাহর বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির-মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব প্রত্যেকটি পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতিপক্ষ এক একটি ব্যবস্থা। এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদী খৃষ্টান প্রমুখ এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ জাগার সময় এসেছে।

তাই জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহর হুকুম ও ঈমানের দাবীকে সামনে রেখে এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি বিলোপ করে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যথায় জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশিত কিতাল পদ্ধতির সামগ্রিক বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। অতএব, যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন। আপনাদের যেকোন বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদ্রাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহর আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইনের বিচার ফয়সালা নিন।

আল্লাহ্ বলেন- "তারা কি জাহেলী বিধানের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়েদাহ-৫০)। "তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করবো?" (সূরা আন'আম-১১৪)। "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা তাগুতকে বিচার দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে।" (সূরা নিসা-৬০)।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান।

যারা হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। হেদায়েত প্রাপ্তির পর গোমরাহী ও অন্ধকারের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য দ্বীন সহকারে সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সঠিক ভাবে হেদায়েত দিয়েছেন। আর যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। অতঃপর তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের আনুগত্য করেছে। অতএব বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান। আপনারা এদেশে আল্লাহর আইন চালু করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতী শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চাই।

www.pathagar.com

Tangail	63
Joypurhat	53
Rajshahi	47
Chapainawabganj	40
Bagerhat	31
Mymensingh	29
Jamalpur	29
Narayanganj	25
Gaibandha	23
Jhenaidah	21
Satkhira	21
Natore	20
Faridpur	19
Dinajpur	19
Dhaka	18
Bagura	17
Comilla	16
Chittagong	16
Lalmonirhat	13
Rajbari	11
Chandpur	14
Naogaon	12
Gazipur	12
Barguna	14
Sherpur	9
Bhola	9
Rangpur	8
Khulna	7
Panchagar	8
Narail	1
Kushtia	1
Pirojpur	1

Jhalkathi	3
Gopalganj	5
Manikganj	1
Khagrachari	1
Kishoreganj	4
Habiganj	3
Sylhet	6
Madaripur	2
Barisal	3
Narsingdi	2
Jessore	6
Shariatpur	2
B Baria	5
Thakurgaon	4
Cox Bazar	4
Nilphamari	4
Netrokona	1
Feni	2
Kurigram	5
Khagrachari	3
Laxmipur	3
Rangamati	2
Rajbari	2
Sirajganj	1
Chuadanga	3
Meherpur	2
Pabna	2
Moulvibazar	5
Total	719

মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত ধৃত জেএমবি সদস্যদের জেলা ভিত্তিক তালিকা
মানচিত্রে প্রতিটি গোল বৃত্তের মান সর্বোচ্চ ৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

LOCALY MADE HAND
GRENADE
ORICA
Indian Explosives Limited
Gomia - 829 112.

Power Gel